যেশুইট পাদ্রীর আকবরনামা

Father Monserrate লিখিত
Commentary on the Court of Akbar

গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ
অনুবাদ ও ভাষ্য

ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা ★ ★ ১৯৬০

প্রকাশক : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড,
২৫৭/বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্,
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০।

মুদ্রক
শ্যামল সেন
ইউনাইটেড প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিটি
ইউ ১৩৯/১, আকড়া রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৮।

পরম আদরের কন্যাসমা পুত্রবধূ **শ্রীমতী ঊর্মিলা ঘোষ-কে** গ্রন্থটি উৎসর্গ করিলাম।

—গ্রন্থকার

সূচী পত্র

পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট

Ain-I-Akbari : Abul Fazl. Tr. by Henry Blochman - Vol. I. Tr. by Jarret - Vols II & III.
Akbarnama : Abul Fazl. Tr. by Beveridge.
Akbar the Great : Vincent Smith.
Ancient Geography of India : Cunningham.
Ancient India as described by Ptolemy : McCrindle
Emperor Akbar : Von Noer. Tr. by Annette Beveridge.
History of Aurangzib (Four Vols) : Sir Jadunath Sarkar.
History of Gujarat : Dr. Asoke Majumdar.
History of Indian and Indonesian Art : Coomaraswamy.
Indian Architecture (Two Vols) : Percy Brown.
Jesuit Letters and Indian History 1542-1773 : John Correia-Afonso, S. J.
Megasthenese and Arrian : McCrindle.
The Mughals and the Jogis of Jakhbar : B. N. Goswami & J. S. Grewal
The Mughul Empire : A. L. Srivastava.
Muntakhab-ul-Tawarikh. 2nd Vol. : Abdul Qader al-Badauni. Tr. by Lowe & Ranking.
Mystics, Ascetics and Saints of India : Oman.
Rise of the Portugese Power in India : R. S. Whiteway.
Spirit of Islam : Ameer Ali.
Travels in the Mogul Empire : Francois Bernier, Tr. by A. Constable.

গ্রন্থ-প্রবেশ

সম্রাট আকবরের অনুরোধে গোয়াস্থিত পর্তুগীজ শাসকরা এবং যেশুইট ধর্মযাজকমণ্ডলী তিনবার তিনটি পাদ্রী মিশন সম্রাটের দরবারে ফতেপুরসিক্রিতে প্রেরণ করেন। প্রথম মিশনের সদস্য ছিলেন ফাদার রুডল্‌ফ্‌ অ্যাকোয়াভিভা, ফাদার হেন্‌রিকুয়েজ্‌ এবং ফাদার অ্যান্টোনিয়া মোন্‌সারেট্‌। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই মিশন ফতেপুরসিক্রিতে পৌঁছায়। দ্বিতীয় মিশনও সম্রাট আকবরের অনুবোধেই ১৫৯০ সালে প্রেরিত হয় এবং ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে ফিরিয়ে আনা হয়; এই মিশন বস্তুতঃ কোনো কাজই করতে পারে নি। আকবব যখন ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে ছিলেন, তখন জেরোম জেভিয়ার এবং ইম্যান্যুয়েল পিন্‌হিরো নামক দুই পাদ্রীকে নিয়ে তৃতীয়মিশন গঠিত হয় এবং সম্রাটের নিকট পাঠানো হয়। এই তিন মিশনের মধ্যে প্রথম মিশনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম মিশনের অন্যতম সদস্য ফাদার মোন্‌সারেট্‌ মিশনের কার্যাবলী ও সমসাময়িক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি মিশনের ভ্রমণ-কাহিনী এবং সম্রাট-দরবাবে তাঁ'দের ক্রিয়াকর্ম ও ধর্মীয় আলোচনার সারমর্ম রোজ-নাম্‌চার মতো লিখেছিলেন। মোন্‌সারেট্‌ লিখেছিলেন লাতিন ভাষায়। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে অন্যতম যেশুইট্‌ পাদ্রী ফাদার এইচ্‌ হস্টেন তা' ভাষ্য সমেত এশিয়াটিক সোসাইটি অব্‌ বেঙ্গলের উদ্যোগে 'মেময়ার' আকাবে প্রকাশ করেন (*)। নাগপুর হিস্‌লপ কলেজের অধ্যাপক যেশুইট্‌ পাদ্রী জন্‌ এস্‌ হয়ল্যাণ্ড্‌ তা' ইংরাজিতে অনুবাদ করেন এবং পাতিয়ালা মহিন্দ্র কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক

* M. A. S. B., III (1914)

এস্. এন্. ব্যানার্জী (*) তা'র ভাষ্য ও টীকা প্রণয়ন করেন। হয়ল্যাণ্ড্ ও ব্যানার্জীর ইংরেজি অনুবাদ ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় 'ক্যাথলিক হেরাল্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয় এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে অক্স্ফোর্ড্ ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃপক্ষ তা' কটকের ওড়িষা মিশন প্রেসে মুদ্রিত ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। বর্তমান বাংলা অনুবাদ হয়ল্যাণ্ড্ ও ব্যানার্জীর ইংরেজি অনুবাদের পাঠ দৃষ্টেই করা হয়েছে। অধ্যাপক ব্যানার্জীর টীকা ও ভাষ্যের সংশোধন ক'রে এবং নতুন ভাষ্য সংযোজন করে বক্তব্য বিষয় অধিকতর প্রাঞ্জল করার প্রয়াস ক'রেছি। ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় অধ্যাপক হয়ল্যাণ্ড্ ও অধ্যাপক ব্যানার্জী যা' লিখেছিলেন, তা'রও অনুবাদ অতঃপর দেওয়া হোল :

"প্রথম যেশুইট্ মিশন সম্পর্কিত ফাদার মোন্সারেটের "কমেন্টারী" এবং সেই লাতিন রচনা (Text) - যা' ফাদার হস্টেন সযত্নে সম্পাদন ক'রে এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গলের 'মেময়ার্স্' আকারে প্রকাশ করেন, বর্তমান (ইংরেজি) অনুবাদ ও টীকা টিপ্পনী সম্পূর্ণতঃ সেই সম্পাদিত পাঠের উপর নির্ভর করেই করা হয়েছে। ফাদার হস্টেন মূল লাতিন পাঠের পাশে যে সব টিপ্পনী (marginal notes) লিখেছিলেন, তা' অত্যন্ত মূল্যবান বলেই প্রমাণিত হয়েছে এবং আমরা তা' প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করেছি।

'টিপ্পনীকার অধ্যাপক ব্যানার্জী এই সুযোগে মিঃ এইচ্ বিভারীজ্ এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে যে সব 'নোট্স' প্রকাশ করেছিলেন তা'র জন্য তাঁ'কে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।'

'ফাদার মোন্সারেট লোকজনের নামের বানানে কোনও নীতি রক্ষা করেন নি ; একই পৃষ্ঠায় একই লোকের নামের বানান দু-রকম দিয়েছেন।"

কলকাতা সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার ট্রুমেস্ অধ্যাপক হয়ল্যাণ্ড্ সম্পর্কে কিছু তথ্য আমাকে জানিয়েছিলেন। নাগপুরে এবং পাতিয়ালায় একাধিক চিঠি লিখেও হয়ল্যাণ্ড্ এবং ব্যানার্জীর বিস্তৃত পরিচয় সংগ্রহ করতে পারিনি। —অনুবাদক

মুখবন্ধ

অধ্যাপক ব্যানার্জী ও ফাদার হয়ল্যাণ্ড ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় যা' লিখেছিলেন, তা'র অনুবাদ দেওয়া গেল :—

আকবর ও অশোক :

"আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬—১৬০৫ খৃষ্টাব্দ (*),—প্রায় অর্ধশতাব্দী-কাল বিস্তৃত ছিল। অশোক এবং আকবর, এই দুইজন হচ্ছেন ভারত-ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নরপতি। উভয়ের তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। আকবরের ছিল রাজ্যজয়ের ও আত্মগরিমা প্রতিষ্ঠার দুর্নিবার লোভ এবং বিশ্বস্ততার অভাব। পক্ষান্তরে, অশোকের ছিল প্রজাপুঞ্জের প্রতি পিতৃ-সুলভ স্নেহ এবং প্রকৃত আত্মসংযম ও আধ্যাত্মিক অভীপ্সা। ধর্মীয় বিষয়ে উভয়ের আগ্রহ পরস্পরের চারিত্রিক পার্থক্যকে লক্ষণীয় ক'রে তুলেছে। মোল্লাদের অনুদার গোঁড়ামীর প্রতি বিরাগ নিয়ে আকবর বিভিন্ন ধর্মরীতির বিশ্লেষণ করেছিলেন পরম সত্যকে জানবার জন্য এবং এর ফলে হিন্দু জৈন ও জরথুষ্ট্রের উদ্ভাবিত ধর্মবোধ থেকে আহরণ ক'রে এক 'খিচুড়ি ধর্মবিশ্বাস' খাড়া করেছিলেন। পক্ষান্তরে, অশোক নির্দ্বিধায় পূর্ণবিশ্বাসে গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলী শিরোধার্য ক'রে রাজনীতির সঙ্গে একান্তভাবে মিশিয়ে নিয়েছিলেন। তৈমুরের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর মতোই আকবর বহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তা'র কোনটায় ভয়াবহতায় ও নিষ্ঠুরতায় কম ছিল না। অশোকের দিগ্বিজয় ছিল বুদ্ধ-প্রবর্তিত 'ধর্ম' বিস্তারে। মোল্লা-মৌলবীর গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদের প্রতীক ছিলেন আকবর; বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে তাঁ'র এই প্রতিবাদের আয়ুধ সংগৃহীত হয়েছিল। কলিঙ্গ-যুদ্ধের পর মৌর্যসম্রাটের অন্তরে জেগেছিল তিতিক্ষা, কৌটিল্যীয় নীতিশাস্ত্রের ম্যাকিয়া-

* হুমায়ুনের মৃত্যু হয় ২৪ জানুয়ারী, ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে; ১৫৫৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তেরো বছর বয়সে আকবরের রাজত্বকাল শুরু হয়।

ভেলি-সুলভ রীতিনীতির বিরুদ্ধে তা' গভীর হয়ে উঠেছিল। এই দুই চরিত্রের পার্থক্যের আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।"

"প্লেটো-কল্পিত দার্শনিক রাজারূপে আকবরকে প্রতিভাত করার যে প্রবণতা এতদিন একশ্রেণীর ঐতিহাসিকের লেখায় দেখা গিয়েছে, আধুনিক গবেষণার ফলে তা'র অপনোদন হয়েছে। উচ্চাশা ও কুটিলতায় মিশ্রিত ছিল আকবরের চরিত্র; ক্রমশঃই এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। 'পুকুরের ছোট ছোট প্রতিবেশী সংহারে নিরত এক বিরাটকায় মাছের মতোই' ছিলেন আকবর। কথায় এবং কাজের মারপ্যাঁচে সিদ্ধ ছিলেন তিনি। এক এক সময় কথায় ও কাজে পারম্পর্য থাকতো না এবং তাঁ'র সত্যিকার অভিপ্রায়ও বোঝা যেত না।"

আকবরের ধর্মবোধ :

"আকবরের অনুরোধে তিনবার তিনটি পাদ্রী মিশন তাঁ'র দরবারে প্রেরিত হয়েছিল। শেষ দুই মিশনের কাহিনী এই পুস্তকের বিষয়বস্তু নয়। যেশুইট্ মিশনারীদের নিকট আকবর প্রথমে খুব আশার উদ্রেক করেছিলেন, তারপর করেছিলেন প্রহেলিকার সঞ্চার এবং সবশেষে করেছিলেন ব্যর্থতা-বোধের সৃষ্টি। বড়ো আশা করেই মিশনারীরা আকবরের দরবারে গিয়েছিলেন; অনেক উত্তেজনাপূর্ণ ধর্মালোচনায়ও এঁরা ব্যাপৃত হয়েছিলেন; কিন্তু সম্রাট ধর্মান্তরিত হ'ন নি। গোয়াস্থিত যাজকমণ্ডলীর নিকট প্রেরিত একটি রিপোর্টের অংশবিশেষ এই সূত্রে প্রণিধানযোগ্য : 'সম্রাটকে প্রকৃত মুসলমান বলা চলে না। তিনি সকল ধর্ম সম্পর্কেই সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁ'র বদ্ধমূল ধারণা এই যে, কোন ধর্মেই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ নেই। প্রত্যেক ধর্মমতেই তিনি বিবেক ও বিচারের বিরুদ্ধ কিছু না কিছু উপাদান লক্ষ্য করেছেন। তৎসত্ত্বেও এক এক সময় তিনি স্বীকার করেন যে, বাইবেল থেকে তিনি যতো অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, অন্য কোনও ধর্মগ্রন্থ থেকে ততটা পাননি। যখন কোনও লোক বিশেষ একটি ধর্মমতকে অন্যান্য ধর্মমত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতে থাকে, তখন সেই মতকেই সে গ্রহণ করবে এরকম বলা যায়। সম্রাটের

দরবারে কেহ কেহ বলেন যে, সম্রাট কাফের (Infidel) হয়ে গিয়েছেন এবং সূর্যোপাসনা করেন, অন্যরা বলেন যে, সম্রাট খৃষ্টান হয়ে গিয়েছেন। আবার, অনেকে মনে করেন যে, সম্রাট এক অভিনব ধর্মমত প্রচার করতে যাচ্ছেন। অবশ্য, যাঁ'রা একটু বেশি বুদ্ধিমান তাঁ'রা বলেন যে, সম্রাট কাফের, খৃষ্টান বা মুসলমান কোনওটাই ন'ন; অথবা আসলে হয়ত তিনি সত্যিকার মুসলমান, নাম কেনার উদ্দেশ্যেই সর্বধর্মে আগ্রহ দেখানো তাঁ'র ভড়ং মাত্র।'

"প্রকৃত তথ্য এই যে সম্রাট তুলনামূলক ধর্মালোচনায় পরমোৎসাহী ছিলেন। তাঁ'র দরবারে শুধু খৃষ্টান মিশনারীরাই আমন্ত্রিত হ'ন নি; পার্শী ও জৈন ধর্মনেতাদেরও আমন্ত্রণ করা হোত। প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন কৌতূহলী ও অন্ধবিশ্বাসী। গভীর আগ্রহেই তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের তত্ত্ব জানতে চাইতেন। কিন্তু সর্বদাই লক্ষ্য রাখতেন যেন তাঁ'র আগ্রহাতিশয্য তাঁ'র সিংহাসনে আসীন থাকার প্রতিবন্ধকতা ঘটাতে না পারে। সন্দেহ নেই যে, তিনি পরম সত্যকে জানতে চেয়েছিলেন, ; কিন্তু এই অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁ'র রাজবংশের ও স্বীয় রাজনৈতিক প্রত্যয় ও ব্যবহারের দ্বারা সীমিত। প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহ না ঘটিয়ে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে পারতেন না। হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ প্রয়াসে দীর্ঘকাল ধ'রে তিনি যে সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিলেন, তাঁ'র মূল গ্রন্থীকে অটুট রেখে তাঁ'র পক্ষে অপর ধর্ম গ্রহণ সম্ভবপর ছিল না। মক্কায় হজ করতে যাওয়ার ছল ক'রে তিনি গোয়ায় গিয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন একথা তিনি জানিয়েছিলেন। এই উক্তির মূলে সত্যতা ছিল বলে মনে হয়না।"

"দ্বিতীয়তঃ—আকবরের মতো ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন মানুষের পক্ষে, বিশেষতঃ যিনি প্রত্যেক ধর্মেই এমন কিছু দেখতে পেতেন যা' তাঁ'র যুক্তি ও বুদ্ধির অন্তরায় বলেই মনে হোত, বিশেষ কোনও প্রচলিত ধর্মমতে আস্থা স্থাপন অপেক্ষা সর্ব ধর্ম থেকেই উপাদান সংগ্রহ ক'রে নিজের গ্রহণযোগ্য এক নূতন ধর্মমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করায় তাঁ'র পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁ'র মতো অমিত ক্ষমতাশালী লোকের পক্ষে নূতন ধর্মমত

প্রচার করায় বিস্ময়ের কিছু নেই।"

"তৃতীয়তঃ—তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে যেশুইট পাদ্রীরা অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি, এমন কি, অন্যান্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রতিও সহনশীল মনোভাব পোষণ করতেন না। আকবরের সমকালীন দুই প্রভাবশালী উলেমা — মখদুম্-উল-মুল্ক্ এবং আব্দুল নবী, পরধর্মের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষপরায়ন ছিলেন ; সম্রাট যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে ধর্মসভা করতেন, এই দুই উলেমা প্রকাশ্যেই তা' গর্হিত কর্ম বলে অভিমত দিয়েছিলেন। তা'ছাড়া, অনতিকাল পূর্বে গোয়াস্থিত যেশুইট পাদ্রীরা কুখ্যাত ইনকুইজিশন—অবিশ্বাসীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা—অনুষ্ঠিত করেছিলেন, এ সংবাদও আকবরের অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। খৃষ্টধর্মের সঙ্গে ইনকুইজিশনের মতো ধর্মান্ধ অনুষ্ঠানের সমন্বয় আকবর কল্পনা করতে পারতেন না, এই উক্তির প্রতিবাদ করা যায় না।"

"চতুর্থতঃ—খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ব বা ট্রিনিটি, — পিতা পুত্র এবং স্বর্গীয় আত্মা, —এই তিন রূপে ঈশ্বরের প্রকাশ, —আকবর এই ধারণা মেনে নিতে পারেন নি।"

"পঞ্চমতঃ—অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে ধর্মগ্রন্থের উৎকর্ষ প্রমাণের সম্ভাবনা তিনি দেখতে পাননি (*)।"

'সম্রাটের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের শেষ অন্তরায় ছিল তাঁ'র বহুপত্নীত্ব। আকবরের পক্ষে বহুপত্নী গ্রহণের নীতি বর্জন করা সম্ভবপর ছিল না (†)।

"উপরোক্ত সব কটি বিষয়ই আকবরের পক্ষে অন্য ধর্ম গ্রহণের অন্তরায় হয়েছিল। সম্ভবতঃ প্রথম চারটি কারণই বিশেষ অন্তরায় হয়ে

---

* ধর্মপুস্তক হাতে নিয়ে মোল্লা ও পাদ্রীরা জলন্ত আগুনে প্রবেশ ক'রে অদগ্ধ অবস্থায় বেড়িয়ে আসতে পারলে নিজ আচরিত ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। মধ্যযুগের ইয়োরোপে এই ধারনার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

† একবার গুজব রটে যে সম্রাট আকবর খৃষ্টধর্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে হারেমের নারীদিগকে বিভিন্ন ওমরাহের নিকট বিলিয়ে দিচ্ছেন।

দাঁড়িয়েছিল। আকবর কোনদিনই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ বিষয়ে গভীর চিন্তা করেছিলেন কি না সন্দেহ। যেশুইট পাদ্রীরা খৃষ্টধর্মের প্রতি আকবরের পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। আজ আমরা বুঝতে পেরেছি যে ওটা ছিল সম্রাটের বুদ্ধিজাত অনুসন্ধিৎসা মাত্র, খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগ-জাত পক্ষপাতিত্ব নয়। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর তারিখে আজমির থেকে লিখিত একটি পত্রে স্যার টমাস্ রো (*) মন্তব্য করেছিলেন, "নূতনত্বের ও অভিনব মতামতের প্রতি আকবর শাহর একটি সহজাত আকর্ষণ আছে।" ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আকবর যে 'দীন-ই-ইলাহী' মতবাদ প্রচার করেন তা'তে খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁ'র বহুল-প্রচারিত অনুরাগের সামান্য নিদর্শনই পাওয়া যায়। জরথুষ্ট্রের মতবাদ ও জৈনধর্ম সম্রাটকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল, খৃষ্টধর্ম নয়। সম্রাটের দরবারে পার্শী 'মোবেদ' ও জৈন ধর্মগুরুদের যাতায়াত ছিল। অগ্নির প্রতি আকবরের শ্রদ্ধা থেকে বোঝা যায় যে তিনি জরথুষ্ট্রের মতবাদের প্রতি অনুরাগ পোষণ করতেন (†)।

---

* ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্স্ জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যার টমাস্ রো-কে প্রথম রাষ্ট্রদূত রূপে প্রেরণ করেন।

† আকবরের মা ছিলেন পারস্য দেশীয় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। আকবরের পিতৃকুল তৈমুর বংশও ছিল সঙ্গীত ও চিত্রকলায় অনুরাগী। জন্মসূত্রেই আকবর কান্তি চেতনা ও সৌন্দর্যবোধ পেয়েছিলেন। মায়ের দিক থেকে সুফী মনোভাবও পেয়েছিলেন আকবর, যা' তাকে পরমত সহিষ্ণু করেছিল। ঈশ্বরকে তিনি প্রেম, সৌন্দর্য ও মানবিক গুণের উৎসরূপেই কল্পনা করতেন; কঠোর বিচারকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি বিশ্বাস করতেন না। মাতা মেরী এবং যীশুর আত্মবিসর্জনের কাহিনী আকবরের হৃদয়ে শুদ্ধ প্রেমবোধ ও করুণারই উদ্রেক করেছিল। যীশুর উপদেশের মর্ম অধিকতর জানার আগ্রহই তাঁকে পাদ্রীদের আমন্ত্রণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, খৃষ্টধর্ম গ্রহণের অভিপ্রায় নয়।

আকবর ও জৈনধর্মগুরুগণ :

"যে সকল জৈন ধর্মগুরু আকবরকে ধর্মোপদেশ দিতেন, তাঁদের মধ্যে ছয় জনের নাম জানা গিয়েছে। এঁরা হলেন,—হরিবিজয় সুরী, শান্তি চন্দ্র, বিজয় সেন সুরী, ভানুচন্দ্র উপাধ্যায়, সিদ্ধি চন্দ্র এবং জিনচন্দ্র। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকে রাজত্বকালের শেষ পর্যন্ত আকবরের দরবারে দু-একজন জৈন ধর্মগুরু সব সময়েই থাকতেন। এঁদের মধ্যে হরিবিজয় সুরী পাণ্ডিত্যে ও ধর্মাচারে ফাদার অ্যাকোয়াভিভার চেয়ে ন্যূন ছিলেন না। তাঁকে আমন্ত্রণ ক'রে আনা হয়, যেমন হয়েছিল যেশুইট পাদ্রীদের, এবং সম্রাটের বিশ্বস্ত সচিব আবুল ফজলকে তাঁর সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য নিযুক্ত করা হয়। ফতেপুরসিক্রি পরিত্যাগ করার সময় পর্যন্ত (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ) হরিবিজয় সুরী সম্রাটকে জৈনধর্ম বিষয়ে নিয়মিত জ্ঞান দান করতেন। শান্তিচন্দ্র ছিলেন ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ অবধি। শান্তিচন্দ্র আকবর সম্পর্কে বাগাড়াম্বরপূর্ণ একটি প্রশস্তি লিখেছিলেন; পুঁথিটির নাম 'কৃপারস-কোষ'। ভানুচন্দ্র ছিলেন ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। জিনচন্দ্র সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। প্রবাদ এই যে ভানুচন্দ্র 'আকবরকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।' ধর্মান্তরিত হওয়া আকবরের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবে, যেশুইট পাদ্রীদের অপেক্ষা জৈনধর্মগুরুদের কৃতিত্ব বেশি, তা' অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে জৈন ধর্মগুরুরা এবিষয়ে কিছুই লিখে রেখে যান নি। তবে কাথিয়াবারের পলিতনায় শত্রুঞ্জয় পাহাড়ে অবস্থিত আদীশ্বর বা আদিনাথ মন্দিরে উৎকীর্ণ একটি দীর্ঘ শিলালিপিতে হরিবিজয় সুরী এবং বিজয়সেন সুরী মুঘল দরবারে যে সব বিশেষ কর্ম সম্পাদন করেন, তা' সংস্কৃতে খোদিত হয়ে আছে। শিলালিপির পাঠ সংক্ষেপে এরূপ :—

> "(১) শাহী আকবর কর্তৃক মেওয়াত্-এ আমন্ত্রিত হয়ে ১৬৩৯ সম্বৎ-এ (১৫৮২ খৃষ্টাব্দ) হরিবিজয় বাদশাহ্‌কে দিয়া অনুজ্ঞা প্রচার করান যে ছয়মাস কাল রাজ্যমধ্যে কোনও পশু বধ করা হবে না। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে না।

জিজিয়া এবং হিন্দু তীর্থযাত্রীদের তীর্থ-পরিক্রমা শুল্ক রহিত থাকবে। বন্দী মানুষ এবং খাঁচায় আবদ্ধ পশু ও পাখীদের মুক্তি দেওয়া হবে। শত্রুঞ্জয় পাহাড় জৈনদের দান করা হবে। একটি জৈন পুস্তক ভাণ্ডার—লাইব্রেরী—স্থাপন করা হবে এবং সম্রাট শ্রেণিক (নৃপতি বিম্বিসার) যেমন গৃহস্থ বৌদ্ধ হয়েছিলেন, বাদ্‌শাহ্‌ও তাঁর মতই গৃহী জৈন হবেন।

(২) আকবর কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বিজয় সেন প্রভূত সম্মানে ভূষিত হন। একটি ঘোষণায় বাদ্‌শাহ্‌ গোহত্যা, ষাঁড় এবং স্ত্রী-মহিষ বধ নিষিদ্ধ করেন। মৃতের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নীতিও পরিত্যক্ত হয় এবং যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে বন্দী না করার আদেশও দেওয়া হয়। হামিদাবানু বেগমের পুত্র বাদ্‌শাহ্‌ আকবর কর্তৃক সম্মানিত হয়ে বিজয় সেন গুজরাট অলঙ্কৃত করেন।"

আকবর এবং শিখগুরুগণ :

"আমরা জৈন পণ্ডিতদের সম্পর্কে কিছুটা বিবরণ দিয়েছি। একথা মনে রাখতে হবে যে, বাদ্‌শাহী হারেমের হিন্দু অন্তঃপুরিকা এবং হিন্দু ভৃত্যরাই আকবরকে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুসমাজের নানাবিধ রীতি-নীতি এবং উপাখ্যান, কিম্বদন্তী প্রভৃতি অবগত করিয়েছিল। বীরবল ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ হিন্দু অমাত্যগণ অবশ্য এবিষয়ে আকবরকে অনেকটা ওয়াকিবহাল করেছিলেন, কিন্তু শৈশবকাল থেকেই অন্তঃপুরের দাসদাসী ও মহিলারা যে আকবরের উপর হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রভাব বিস্তারে অধিকতর সহায়তা করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সম্রাট আকবরের উপর শিখধর্মগুরুদের প্রভাব সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা সাধারণতঃ নীরব। যতদূর জানা গিয়েছে তাতে বলা যায় যে, আকবর শিখধর্ম সম্পর্কে উচ্চ ধারণাই পোষণ ক'রতেন। শিখগুরুদের প্রযত্নেই শিখদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার অনেকটা সংযত ছিল। গোইণ্ডোয়ালে তিনি গুরু অমর দাসের (১৫৫২—৭৪) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং একত্রে আহার

করেন ; গুরুর নিকট থেকে সম্রাট একটি শিখ পোষাকও উপহারস্বরূপ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রাধান্য ও অত্যাচারে শিখসম্প্রদায় উত্যক্ত হচ্ছিল ; শিখ ধর্মগুরুগণ এই ব্যাপারে সম্রাটের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। ব্রাহ্মণ নেতৃবৃন্দ শিখদের প্রতি সম্রাটের পক্ষপাতিত্ব এবং সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে সম্রাটের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। হিন্দুধর্মের নানাবিধ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে জনগণকে বিরত থাকার জন্য শিখ সম্প্রদায়ের আন্দোলন ব্রাহ্মণরা সুনজরে দেখেনি ; তা'রা সম্রাটের ব্যবহারে শঙ্কিত হয়ে উঠ্ছিল। আকবর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিয়মানুযায়ী ব্রাহ্মণ নেতৃবৃন্দ ও শিখগুরুদের এক বৈঠকে আহ্বান ক'রে স্ব স্ব পক্ষের বক্তব্য পেশ করতে অনুরোধ করেন। শিখগুরুর প্রতিনিধি জেঠা (যিনি পরবর্তীকালে গুরু রামদাস নামে খ্যাতি লাভ করেন) বৈঠকে উপস্থিত হ'য়ে যে বক্তব্য রাখেন আকবর তা'তে বিশেষ প্রীত হ'ন। জেঠা বলেন, "ব্রাহ্মণরা নিজেদের ঈশ্বরের সমতুল্য ব'লে প্রচার করেন। আমাদের গুরু তেমন কোনও দাবী করেন না, তিনি নিজেকে ঈশ্বরের দাস বলেই মনে করেন।" আকবর হিন্দুদের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জেঠার মারফৎ গুরু রামদাসকে হরিদ্বারে তীর্থযাত্রা করতে অনুরোধ জানান এবং একথাও জানিয়ে দেন যে, গুরু যখন হরিদ্বারে প্রবেশ করবেন তখন তাঁকে কোনও তীর্থশুল্ক দিতে হবেনা। সম্ভবতঃ এই আদেশের ফলেই ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদেব পক্ষে তীর্থশুল্ক রহিত হয়ে যায়। এরপর চিতোবের যুদ্ধে (১৫৬৭—৬৮) যা'তে আকবরের জয় হয়, তা'র জন্য শিখগুরুকে প্রার্থনা করতেও অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

"গুরু অমর দাসের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা পূর্বোক্ত রামদাস শিখ-গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন। আকবর তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। ১৫৭৪ থেকে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দ—এই কয় বছর রামদাস শিখসম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন। বাদশাহ্ তাঁকে একটি জায়গীর দান করেন। এই জমিতে একটি পুষ্করিণী খনন করা হয় ; পুকুরটির নামকরণ হয়—'অমৃত সরোবর', সংক্ষেপে 'অমৃতসর'। অমৃতসর অদ্যাবধি শিখদের নিকট পবিত্র তীর্থ।"

"একসময়ে অনেকদিন ধ'রে আকবর সসৈন্য ও সপরিবার লাহোরে

অবস্থান করছিলেন। ফলে, স্থানীয় বাজারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। বাদ্‌শাহ্‌ যখন লাহোর থেকে চলে যান, তখন জিনিষপত্রের দর আকস্মিক-ভাবে প'ড়ে যায় এবং ব্যবসায়ীরা সমূহ লোকসানের সম্মুখীন হয়। গুরু রামদাস তখন সম্রাটকে অনুরোধ করেন, যেন প্রজাপুঞ্জের আর্থিক ক্ষতি লাঘবের উদ্দেশ্যে খাজনা কিছুটা হ্রাস করা হয়। সম্রাট এক বছরের জন্য খাজনা মুকুব করেন। এই ঘটনা ১৫৮১ খৃষ্টাব্দের।"

"রামদাসের পর যিনি শিখদের ধর্মগুরু হন, তাঁর নাম গুরু অর্জ্জুন (১৫৮১—১৬০৬)। তিনি শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' সঙ্কলন করেন। সম্রাটের নিকট অভিযোগ আসে যে, গ্রন্থটিতে নবী ও মুসলমান ধর্মনায়কদের এবং হিন্দু অবতার ও দেবদেবী সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি আছে। অভিযোগ সম্পর্কে আকবর অনুসন্ধান করতে চাইলে শিখগুরু তাঁর দুইজন প্রতিনিধি—ভাই বুধা ও ভাই গুরুদাসকে 'গ্রন্থসাহেব' সমেত বাদ্‌শাহের নিকট প্রেরণ কবেন। গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ পাঠ ক'রে শোনানো হ'লে বাদ্‌শাহ্‌ এই অভিমত প্রকাশ করেন : 'ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও আনুগত্যই এই গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। কাউকে প্রশংসা বা নিন্দা করা হয়েছে—এরূপ আমি দেখছি না। এই গ্রন্থটি শ্রদ্ধারই উপযুক্ত।' গ্রন্থপাঠ সমাপ্ত হ'লে বাদ্‌শাহ্‌ সসম্মানে গ্রন্থটি মাথা দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন।

১৫৯৫—৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একবার পাঞ্জাবে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। গুরু অর্জ্জুনেব অনুরোধে বাদ্‌শাহ সমগ্র পাঞ্জাবে একবছরের জন্য খাজনা মুকুব কবেন।"

আকবর এবং যোগী সম্প্রদায় :

বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ঝিলম নদীর তীরে নাথ সম্প্রদায়েব কানকাটা যোগীদের একটি মঠ আছে ; এর নাম 'বালনাথ টিলা'। সমগ্র ভারতে নাথপন্থীদের এটিই সর্বপ্রাচীন মঠ, গোরক্ষপুর মঠ অপেক্ষাও প্রাচীনতর। পাদ্রী মোন্‌সারেট লিখেছেন, কাবুল অভিযানের সময় পথিমধ্যে সম্রাট আকবর বালনাথ টিলায় যান এবং মাথার পাগড়ি খুলে

মঠ-প্রাঙ্গনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। পাঠানকোটের নিকটবর্ত্তী 'যখবর' নামক যোগীমঠের মোহান্তের অনুকূলে কাংড়ার জলোমুখী থেকে জম্মুর পারোল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি আকবর দান করেন। এই দানপত্রে মঠের মোহান্তকে 'মবদ্-ই-মুশ্তাহিক' ব'লে অভিহিত করা হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও মুঘল দরবারে যোগীদের প্রতিপত্তি ছিল।

আকবর এবং পার্শী সম্প্রদায়ঃ

পশ্চিম উপকূলে নওসারির নিকটে পার্শী-ধর্মনেতা দস্তুর মেহ রজি রাণার পিতামহের তৎকালীন মুসলমান নবাবদের নিকট প্রাপ্ত একশ' বিঘা নিষ্কর জমি ছিল। দস্তুর মেহ্ রজি রাণা আকবরের দরবারে ও ধর্মসভায় বিশিষ্ট সম্মানিত যোগদানকারী ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও গভীর ধর্মীয় মনোভাবের স্বীকৃতির ইনামস্বরূপ আকবর তাঁকে আরও দু'শো বিঘা নিষ্কর জমি দান করেছিলেন।

প্রথম যেশুইট মিশনঃ

১৫৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখে প্রথম যেশুইট মিশন গোয়া থেকে আকবরের রাজধানী ফতেপুরসিক্রি অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। ১৩ই ডিসেম্বর দামন অতিক্রম ক'রে সুরাট হ'য়ে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মিশনের দুই সদস্য—ফাদার অ্যাকোয়াভিভা ও ফাদার হেনরীকুয়েজ ফতেপুরসিক্রিতে উপনীত হ'ন। পথিমধ্যে নারওয়ারে মিশনের তৃতীয় সদস্য ফাদার মোনসারেট অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন রাজধানীতে তিনি পৌঁছেছিলেন ৪ঠা মার্চ তারিখে। আবুল ফজল ও হাকিম আলী জিলানী অতিথিদের পরিচর্যার ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে সম্রাট তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের শিক্ষার ভার মোন্‌সারেটের উপর ন্যস্ত করেন। ক্রমে ক্রমে সম্রাটের উদ্যোগে মুসলমান উলেমাদের সঙ্গে মিশনের পাদ্রীদের আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থাও হয়। মোন্‌সারেটের ডায়েরী এবং অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে মোল্লা মৌলবীদের সঙ্গে যেশুইট পাদ্রীদের আলাপ-আলোচনা প্রায়ই তিক্ত বাগবিতণ্ডায় পরিণত

হ'ত। আকবর অবশ্য কোন সময়েই বিচলিত হতেন না, কিংবা পাদ্রীদের প্রতি বিরক্তও হতেন না। পাদ্রীদের প্রতি সম্রাটের সহৃদয়তা বরাবর অক্ষুন্ন ছিল। একটি নূতন ধর্মমত সৃষ্টি ক'রে এক নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান হ'য়ে বসা, জৈন, পার্শী, খৃষ্টান এবং হিন্দু যোগী প্রভৃতির প্রতি উদারতা পোষণ, —এই সব আশঙ্কায় সাম্রাজ্যের মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দ আকবরের প্রকৃত অভিপ্রায় সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠ্ছিলেন। সম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিতে জৌনপুরের প্রধান কাজী এক ফতোয়া জারী ক'রে ঐ প্রজাবিদ্রোহকে ধর্মবিদ্রোহরূপে প্রতিভাত করতে চেষ্টা করে। সম্রাটের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মীর্জা মহম্মদ হাকিম ছিলেন কাবুলের শাসনকর্তা; তাঁকে কেন্দ্র ক'রে সাম্রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্তেও বিদ্রোহ ঘোষণা করা হ'য়েছিল। এই সব কারণে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রতি বাদশাহের উৎসাহে কিছুদিনের জন্য ভাঁটা পড়েছিল।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দেই বিদ্রোহ প্রশমিত হয়েছিল; ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলনও অনেকটা চাপা প'ড়ে গিয়েছিল। সম্রাজ্যের অবস্থা অনেকটা শান্ত হ'য়ে এলে আকবর তাঁর 'দীন-ই-ইলাহী' মতবাদ প্রকাশ করলেন। বাদশাহ্কে আর প্রকৃত মুসলমান বলে পরিচিত করার উপায় রইল না। ঐতিহাসিক বদায়ুনী আকবরের এই সময়ের মনোভাব সম্পর্কে লিখেছেন, "ইস্লামের কোনও চিহ্নই আর সম্রাটের ভিতর রইল না।"

বিভিন্ন পণ্ডিত ও ধর্মীয় নেতাদের তুলনামূলক ধর্মালোচনার উদ্দেশ্যে ফতেপুরসিক্রির প্রাসাদের অভ্যন্তরে 'ইবাদৎখানা'—ধর্মসভাগৃহ নির্মিত হ'ল। বর্তমানে এই গৃহের চিহ্নমাত্রও নেই।

আকবর ও পর্তুগীজ :

মহামান্য পোপের আশীর্বাদ ও আদেশের বলে অর্ধমার্জিত স্পেন ও আধা বর্বর পর্তুগাল সমগ্র পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ ভূ-ভাগে লুণ্ঠন ও শোষণের অধিকার পেয়েছিল। ইয়োরোপ থেকে দূর প্রাচ্যে আসার পথ ছিল তখন দুটি: ভূমধ্যসাগর পার হয়ে তুরস্ক বা লেবানন থেকে স্থলপথে পারস্য সাগরের কোনও বন্দর হয়ে আবার সমুদ্র পথে গুজরাট

বা পশ্চিম উপকূলের কোনও বন্দর। অন্য পথ ছিল মিশর হয়ে লোহিত সাগরের কোনও বন্দর থেকে সমুদ্র পথে ভারতের পশ্চিম উপকূল। এই দুটি পথই আরবীয় সামন্ত নরপতি, জলদস্যু ও নাবিকদের কুক্ষিগত ছিল। আরবীয় ও ইয়োরোপের ইহুদী বণিকরাই ইয়োরোপ ও প্রাচ্যদেশের বাণিজ্যে অধিষ্ঠিত ছিল। স্পেন ও পর্তুগাল থেকে ইহুদীদের বিতাড়ন করার ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা' পূরণ করার জন্য এই দুই দেশের রাজশক্তি সর্বপ্রকারে নিবিষ্ট ছিল। পর্তুগালের প্রিন্স হেনরী এবং তারপর রাজা দ্বিতীয় জন (১৪৮১-৯৫) প্রাচ্যদেশে যাওয়ার নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কারের জন্য অত্যন্ত উদ্যোগী হন; এরই ফলে আলবুকার্ক, ভাস্কো-দা-গামা প্রভৃতি অসম সাহসী নাবিকদের দ্বারা উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয়। নবাবিষ্কৃত এই পথও নিরাপদ ছিল না; আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলি ও নিকটবর্ত্তী সমুদ্রেও আরবী বণিক, নাবিক ও জলদস্যুদের প্রতিপত্তি ছিল। অমানুষিক হিংস্রতা, বর্বরতা ,ও শঠতার কাহিনী পর্তুগীজ ও আরবীয় বণিক-দস্যুদের প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের ইতিহাস হয়ে আছে। পর্তুগীজরা এদেশে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার করতে আসেনি, খৃষ্টিয় সভ্যতার মহিমা বিস্তারও নয়; এর কোনটাই পর্তুগীজদের লক্ষ্য ছিল না, তাদের জাতীয় মানসিক প্রস্তুতিও তদনুরূপ ছিল না। পর্তুগালের নরপতি থেকে গোয়ায় আগন্তুক ভাড়াটিয়া ও বর্ণ সঙ্কর পদাতিক,—প্রত্যেকেরই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—লুণ্ঠন ও ক্ষুদ্র সীমিত স্বার্থ সিদ্ধি। আরবীয় তথা মুসলমান বণিক ও নাবিক মাত্রেই ছিল তাদের প্রথম সারির শত্রু। পর্তুগীজরা নিয়ে এসেছিল আগ্নেয়াস্ত্র ও তার প্রযুক্তিবিদ্যা। আগ্নেয়াস্ত্র এবং অমানুষিক বর্বরতার বিরুদ্ধে মুসলমান বণিক নাবিকরা দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করতে পারে নি। দিউ, দামন, গোয়া ও চাউল প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে দুর্গ নির্মান ক'রে এবং কোচিন, কারিকল ও অন্যান্য স্থানের হিন্দু নরপতিদের সহায়তায় পর্তুগীজরা পশ্চিম ভারতে বাণিজ্যে ও সামরিক দিক দিয়ে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। পাঠান যুগের শেষ পর্যায়ে ও মুঘল অধিপাত্যের প্রথম পর্বেই পর্তুগীজদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের অনুকূল

জাতীয় চরিত্র থাকলে মুঘলদের পরিবর্তে পর্তুগীজরাই ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্তা হতে পারত। সম্রাট আকবর নিশ্চয়ই পর্তুগীজদের এই সম্ভাবনা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন।

পূর্বভারতে পাঠান আধিপত্য তখনও অস্তমিত হয় নি; মগ পর্তুগীজদের উৎপাতে এবং আসাম ও অন্যান্য প্রান্তীয় রাজাদের বৈরিতায় বাংলাদেশের মুঘল সুবেদারগণ উত্যক্ত হচ্ছিল। বাংলাদেশে ও আরাকানে পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থায়ী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। সুতরাং, আকবরের পক্ষে সপ্তগ্রামের পর্তুগীজ ভিকার জেনারেলকে ফতেপুরসিক্রিতে সাদরে আহ্বান ক'রে খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ এবং তীব্র ধর্ম জিজ্ঞাসা ব্যক্ত করা নিশ্চয়ই শুদ্ধমাত্র ধর্ম তৃষ্ণা ব'লে মনে করা যায় না। পর্তুগীজদের সঙ্গে আপোষ করার দুটি প্রধান কারণ ছিল : এক— পূর্বভারতে রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, দুই—আরব সাগরে হজযাত্রী ও বাণিজ্যিক পোত চলাচলে নিরাপত্তা সৃষ্টি করা। আকবরের বহু-বিঘোষিত ধর্মজিজ্ঞাসা অবিমিশ্র ছিল বলা যায় না। ধর্মতৃষ্ণা তাঁ'র অবশ্যই ছিল, কিন্তু তা' কোনও নির্দিষ্ট মতবাদে পরিণত বা অভিভূত হয় নি, অথবা ইস্‌লাম সম্পর্কে তীব্র বিরাগ বা অনাশক্তি সঞ্জাত করেনি। ধর্মকে তিনি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রেখেছিলেন।

পর্তুগীজরা ভারতে এসেছিল বাণিজ্যের প্রসার কল্পে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে মুসলমান নাবিক ও বণিকদের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা করতে হয়। অল্পকালের মধ্যেই তাঁ'রা বুঝেছিল যে সাম্রাজ্যের বিস্তার ও নিরাপত্তার দিক দিয়ে পশ্চিম ভারতের মুসলমান বণিক ও মুসলমান রাজ্যগুলি মুঘলদেরও অন্তরায়। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে আন্তেনিও কাব্রাল নামক জনৈক পর্তুগীজ বণিক আকবরের দরবারে যায়; পর্তুগীজদের সঙ্গে আকবরের এইই প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজরা বাংলাদেশে যেশুইট পাদ্রীদের নিয়ে যায়; এই পাদ্রীরা ধর্মরক্ষা ও ধর্ম প্রচার যতটা করেছিল, গোয়েন্দাগিরি তা'র তুলনায় নিতান্ত কম করে নি। আগ্রা এবং লাহোর থেকে পাদ্রীরা নিয়মিত গোয়াতে রিপোর্ট পাঠাতেন। মির্জা জুল্‌কারনইন্ নামক জনৈক রোমান ক্যাথলিক সন্তের

ফৌজদার ছিলেন, পরে তিনি লাহোরের গভর্ণর হয়েছিলেন। যেশুইট্ পাদ্রীরা এর কাছ থেকেও প্রচুর রাজনৈতিক খবরাখবর পেতেন। সপ্তগ্রামের ভিকার জেনারেলকে আকবর ডাকিয়ে এনেছিলেন সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে শান্তি বজায় রাখার অভিপ্রায়ে। তা'কে ধর্মভাবাপন্ন দেখে খৃষ্টধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রে আকবর পর্তুগীজদের বন্ধুভাবাপন্ন করতে চেয়েছিলেন, সন্দেহ নেই।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্বভারতে ইয়োরোপাগত তৎকালীন তিন প্রধান নৌশক্তি বাণিজ্য-প্রসার ও উপনিবেশ পত্তনে নিয়োজিত ছিল, আকবরের সময় তা'র সূত্রপাত হয়। ফরাসী, দিনেমার ও ওলন্দাজরা আকবরের মৃত্যুর কিছু পরে আসে; পর্তুগীজরাই আকবরের সময় পূর্বভারতে বন্দরেব পত্তন করে এবং অন্যতম সামরিক শক্তিরূপে ক্ষমতা বিস্তার করে। একদিকে পাঠান রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে, তার উপর পর্তুগীজদের উৎপাত; আকবর পর্তুগীজদের সঙ্গে সকল রকম সম্ভাব্য মৈত্রীর চেষ্টা করবেন এটাই, স্বাভাবিক। তাঁ'র অধ্যাত্মচেতনা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তা'র জন্য ঘটা ক'রে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার মূলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল এ সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না।

বছরাধিক কাল পাদ্রী মিশন আকবরের দরবারের ছিলেন। বাদ্শাহ্‌র খৃষ্টধর্ম গ্রহণের আশায় আরও অপেক্ষা করা অসমীচীন বিবেচনা ক'রে মিশনারীরা গোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। বাদ্শাহ্ কিন্তু অনুমতি দিলেন না। তিনি পাদ্রীদের আরও কিছুকাল থেকে যেতে বললেন। আকবরের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের অনিশ্চয়তা ছাড়া অন্য একটি গুরুতর কারণও ছিল। মুঘল এবং পর্তুগীজদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের খুবই অবনতি ঘট্ছিল, উভয়পক্ষের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা ঘনীভূত হচ্ছিল। ১৫৭৩ সালে আকবর কর্তৃক গুজরাট অধিকারের পর থেকেই উভয়পক্ষের মধ্যে মন কষাকষি ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছিল। পর্তুগীজরা দামন এবং দিউ অধিকার ক'রে কেল্লা ও পোতাশ্রয় তৈরী করেছিল, এটা মুঘল কর্তৃপক্ষের নিকট অন্যায় ব'লে বিবেচিত হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের বন্দর ছিল সুরাট। ভারত

থেকে মক্কায় তীর্থ করতে যাওয়ার এটাই একমাত্র বন্দর ছিল। সম্রাট আকবর একটি নৌবাহিনী গঠন করেন, এর পোতশ্রয়ও ছিল সুরাট। দিউ বন্দর যদি সুরক্ষিত হয় এবং তা' যদি বন্ধুভাবাপন্ন রাজশক্তির অধীন না হয়, তবে সুরাট বন্দর তথা মুঘল নৌবাহিনী এবং হজযাত্রী জলপোতগুলি বিপন্ন হয়ে পড়ে। আকবর সেজন্যই পর্তুগীজদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনে উৎসুক ছিলেন। স্থলপথে বেলুচিস্তান ও পারস্য হয়ে মক্কা যাত্রার একটা পথ ছিল, বিদেশের সঙ্গে স্থলপথে বাণিজ্যের আদান-প্রদান এই পথ দিয়েই কিছুটা হ'ত; কিন্তু তা' ছিল বিপদ-সঙ্কুল। পারস্যের কিজিলবাসী উপজাতি দস্যুরা এবং বেলুচিস্তানের প্রায় অরাজক অঞ্চলগুলির হানাদার অধিবাসীরা তীর্থযাত্রী ও বণিকদের প্রায়ই সর্বস্ব লুঠ ক'রে নিত। ওদিকে, জলপথে মক্কা যেতে হলে যাত্রীদের প্রত্যেককে পর্তুগীজদের দেওয়া পাশপোর্ট্ সঙ্গে রাখতে হ'ত; এইসব পাশপোর্টে মাতা মেরী ও যীশুর প্রতিমূর্তির ছাপ মারা থাকতো। এতে পৌত্তলিকতার সমর্থন করা হচ্ছে মনে হলেও মুসলমান তীর্থযাত্রীরা দায়ে প'ড়ে তা' সহ্য করতো। এই ব্যাপারে মুসলমান ও পর্তুগীজদের মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। টমাস্ কোরিয়াট (Thomas Coryat) লিখেছেন, 'আকবর শাহ্ অত্যন্ত ভাগ্যবান নরপতি ছিলেন। তিনি খুব মাতৃভক্ত ছিলেন; মায়ের কোন আদেশ ও অনুরোধ পালন করতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু একবার তাঁর আদেশ অমান্য করেছিলেন। এই মহিলা একবার যখন সমুদ্রপথে হজ্ করতে যাচ্ছিলেন তখন পর্তুগীজরা তাঁর জাহাজে চড়াও হয় এবং জাহাজটিকে জোর ক'রে অর্মুজ বন্দরে নিয়ে যায়। জাহাজে মুসলমানদের পবিত্র কোরান গ্রন্থ একটি ছিল। পর্তুগীজরা এই গ্রন্থটি একটি কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে শহরময় ঘুরিয়ে বেড়ায়। মহিলাটি আকবরকে বলেন যে তিনি যেন তাদের পবিত্র বাইবেল গ্রন্থও একটা গাধার গলায় বেঁধে সারা শহর পরিক্রমণ করান। সম্রাট এই অনুরোধ মেনে নেন নি। তিনি বলেছিলেন, "পর্তুগীজরা যদি কোরাণের অবমাননা করে, তবে সম্রাট হয়ে আমি তাদের মতোই অন্যায় কাজ করতে যাব কেন? যেকোনও ধর্মকে অশ্রদ্ধা দেখানোর

মানে হচ্ছে ঈশ্বরের অবমাননা করা। একটি গ্রন্থের অবমাননায় ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হতে পারেননা" (*)।

আকবরের রাজসভায় একটি দল ছিল যাঁ'রা খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রকাশ্য বিরোধিতা করতেন। হারেমের প্রায় সকলেই এদের সমর্থন করতেন। ১৫৮২ সালে হামিদাবানু বেগম (আকবরের মা) এবং গুলবদন বেগম (আকবরের পিসি) হজ্ থেকে ফিরে আসার পর খৃষ্টধর্ম প্রচারের বিরোধীতা চরমে ওঠে।

রাজনৈতিক কারণে এবং একদল প্রভাবশালী সভাসদ ও হারেমের প্রবল বিরোধিতার জন্যই ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পাদ্রী মিশনের অন্যতম সদস্য ফাদার অ্যাকোয়াভিভাকে গোয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগের বছর এপ্রিল মাসে বাদ্শাহ্ ইয়োরোপে প্রেরণের উদ্দেশ্যে যে রাজদূত মিশনকে রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন, ফাদার মোন্সারেটকেও তা'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেই রাজদূত মিশনও সুরাট অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ১৫৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের পর আকবরের দরবারে প্রথম পাদ্রী মিশনের আর কেউই অবশিষ্ট রইল না। পাদ্রী মিশনের তৃতীয় সদস্য ছিলেন ফ্রান্সিস্ হেনরিকুয়েজ। জাতিতে পারসিক, মুসলমান পিতামাতার সন্তান হেন্‌রিকুয়েজ ছিলেন খৃষ্টধর্মাবলম্বী। মোন্সারেটের ডায়েরীতে এর বিশেষ কোনও উল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ কিছুকাল ফতেপুরসিক্রিতে থাকার পর ইনি গোয়ায় ফিরে যান। (†)

---

* ফষ্টার প্রণীত **Early Travels in India** (পৃঃ ২৭৮) থেকে অধ্যাপক ব্যানার্জী ও ফাদার হয়ল্যাণ্ড্ এই কাহিনী সঙ্কলিত করেছেন। পারস্য সাগরে বন্দর আব্বাস্ ও বুশিরের মধ্যবর্ত্তী এবং বাহ্‌রিন্-এর বিপরীত উপকূলে অবস্থিত অর্মুজ বন্দর থেকেই বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক মার্কো পলো সমগ্র এশিয়ার অভ্যন্তর অতিক্রম ক'রে স্থলপথে শাংহাই গিয়েছিলেন।

† মালাবারী ভাষার উপর ব্যাকরণ প্রণেতা হেন্‌রিকুয়েজ অন্য ব্যক্তি। ইনি নন।

ইয়োরোপে রাজদূত প্রেরণ :

মোন্‌সারেট লিখেছেন যে সম্রাট আকবর সৈয়দ মুজাফ্‌ফর নামক জনৈক ওমরাহ্‌র নেতৃত্বে একটি রাজদূত মিশন গঠন ক'রে ইয়োরোপে প্রেরণের উদ্দেশ্যে সুরাট অভিমুখে রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন। মিশনের প্রতিনিধিরা সম্রাটের যে পরিচায়ক পত্রটি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল তা' কোন দেশের রাজশক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত নয়, 'দানিয়ান্‌-ই-ফিরঙ্গ্‌' —ইয়োরোপের বুধমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে লেখা। অনেকের মতে চিঠিটি লেখা হয়েছিল 'রিওয়া-ই-ফিরঙ্গ্‌' —স্পেন সম্রাটের উদ্দেশ্যে। তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায়—সহায়তা কামনাই ছিল চিঠি এবং রাজদূত প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য। আবার একটি পাদ্রী মিশন পাঠানোর অনুরোধও এই চিঠিতে ছিল। ফাদার হয়ল্যাণ্ড্‌ ও অধ্যাপক ব্যানার্জী এই চিঠিটির অনুবাদ দিয়েছেন। অলঙ্কারবহুল ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ এই রাজকীয় পত্র মোটেই সুখপাঠ্য নয়। অনুবাদটি 'ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারী'তে (১৮৮৭, এপ্রিল, পৃঃ ১৩৫ থেকে শুরু) ছাপা হয়েছিল। পৃথিবীতে শান্তি এবং সুশৃঙ্খলা রক্ষার্থে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে গোষ্ঠী গঠনের আবশ্যকীয়তা এবং আকবরের দিগ্বিজয় ও বলদর্পিতার বর্ণনায় ভারাক্রান্ত এই চিঠির অনুবাদ অনাবশ্যক বিবেচনায় এখানে মুদ্রিত হ'ল না।

নির্বাচিত বিশ্বস্ত রাজদূত সৈয়দ মুজাফ্‌ফর কিন্তু বাদ্‌শাহ্‌কে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি ইয়োরোপ যাত্রার নাম ক'রে পালিয়ে দাক্ষিণাত্যে মারাঠিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মগোপন করলেন। পাদ্রী মোন্‌সারেট্‌ ও অন্যতম রাজপ্রতিনিধি আবদুল্লা খাঁ গোয়ায় গিয়ে ইয়োরোপ-গামী জাহাজের সন্ধানে তৎপর হলেন। তখনকার দিনে নিয়মিত জাহাজ চলাচল করতো না, পর্যাপ্ত পরিমাণ পণ্য সংগ্রহ হলে জাহাজ ছাড়তো। বেশ কয়েক মাস অপেক্ষা ক'রে আবদুল্লা খাঁ ফতেপুরসিক্রি ফি'রে গেলেন। সম্রাটের চিঠিও ইয়োরোপে গেল না।

আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরও একবার ইয়োরোপে রাজদূত প্রেরণের ব্যর্থ প্রয়াস করেছিলেন।

ফাদার মোন্‌সোরেট :

গোয়া থেকে প্রেরিত প্রথম পাদ্রী মিশন এই ভাবে ব্যর্থতায় পরিণত হ'ল। ব্যর্থ এজন্য যে, পাদ্রী মিশন প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আকবরকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা,—সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। কিন্তু পাদ্রী মোন্‌সারেট্ পরবর্তী কালের জন্য মূল্যবান সম্পদ—ইতিহাসের উপাদান—রেখে গিয়েছেন। মুঘল রাজত্বের ইতিহাস মোন্‌সারেটের রচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

মোন্‌সারেটের ব্যক্তিগত জীবন বিশেষ জানা যায় নি। এটুকু জানা যায় যে তিনি স্পেনের কোনও অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম হচ্ছে আন্তোনিয়ো মোন্‌সারেট্রস। অল্প বয়সেই যেশুইট্ ধর্মযাজক সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং যাজকতায় দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৫৬৯ সালে লিস্‌বন শহরে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয়; সেই সময় মোন্‌সারেট সেবাকর্মে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁকে গোয়ায় প্রেরণ করা হয় এবং তিনি গোয়াস্থিত যেশুইট্ যাজকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে আকবরের আমন্ত্রণে প্রেরিত পাদ্রী মিশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। সম্রাট আকবরের বয়স তখন আটত্রিশ বছর। প্রায় দুই বছর কাল মোন্‌সারেট্ আকবরের সান্নিধ্যে ছিলেন। ১৫৮১ সালে সম্রাট আকবর বিদ্রোহী বৈমাত্র ভ্রাতা ও কাবুলের রাজ্যপাল মির্জা হাকিম্‌কে দমন করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করেন; কাবুলে যাওয়া ও ফিরে আসার সময় মোন্‌সারেট্ আকবরের অন্যতম পার্শ্বচর ছিলেন। ফতেপুরসিক্রি থেকে রাজকীয় অভিযানবাহিনী আগ্রা, মথুরা ও দিল্লী হয়ে সোজা উত্তর দিকে এগিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে লুধিয়ানা জিলার মাচ্ছিওয়ারায় শতদ্রু নদী পার হয়ে উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হয়। জম্মুর সীমান্ত দিয়ে বাদ্‌শাহী বাহিনী ক্রমে ক্রমে আটক এবং পেশোয়ার হয়ে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম ক'রে কাবুল পৌঁছয় এবং সেখান থেকে ফিরে আসে। যাওয়া ও আসার পথে যে সব শহর, দেশ, নদী প্রভৃতি পড়েছিল, বিভিন্ন প্রান্তীয় নরনারী ও তা'দের ব্যবহার ও আচার মোন্‌সারেট্ দেখেছিলেন, সে সবের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। আকবরের

দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের বয়স তখন দশ বছর; মোন্‌সারেট্‌ তার গৃহশিক্ষক রূপে নিযুক্ত হ'ন। বাদ্‌শাহ্‌র চরিত্র-বৈশিষ্ট, সাংসারিক ও রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, আকবরের রহস্যপ্রিয়তা এবং কঠোর নিয়মানু-বর্তিতা, —মোন্‌সারেটের বর্ণনায় উজ্জল হয়ে উঠেছে।

গোয়ায় ফিরে এসে মোন্‌সারেট্‌ কয়েক বছর পর ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে যাজকমণ্ডলীর নির্দেশে আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। মুঘল দরবারে থাকার সময় তিনি যে রোজ্‌-নাম্‌চা লিখেছিলেন, —'কমেন্টারী' নামে যা বিখ্যাত হয়ে আছে, সেই পাণ্ডুলিপি তাঁর সঙ্গেই ছিল। বেলুচিস্তান ও পারস্যের উপকূল তিনি নিরাপদেই অতিক্রম করেন; কিন্তু আরব উপকূলে জলদস্যুরা তিনি যে জাহাজে যাচ্ছিলেন, তা' লুণ্ঠন করে এবং তাঁকে লোহিত সাগরের তীরবর্তী আরব ভূখণ্ডের সা-না নামক স্থানে বন্দী ক'রে রাখে। তাঁর বন্দীত্বের সংবাদ পেয়ে যেশুইট্‌ যাজকমণ্ডলী অর্থের বিনিময়ে তাঁকে ১৫৯৬ সালে মুক্ত ক'রে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। বন্দীদশায় মোন্‌সারেটের পাণ্ডুলিপি দস্যুরা ছিনিয়ে নিয়েছিল, মুক্তি দেওয়ার সময় সে'টি ফেরৎ দেওয়া হয়। ভগ্নস্বাস্থ্য মোনসারেট্‌ এর পরে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সাল্‌সেট্‌ দ্বীপে থাকাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়।

মোন্‌সারেটের কমেণ্টারী :

মোন্‌সারেট্‌ যে 'কমেন্টারী' বা রোজ্‌নাম্‌চা লিখেছিলেন, যেশুইট যাজকমণ্ডলীর নিয়মানুযায়ী তা' রোম বা লিস্‌বনের উচ্চতম পাদ্রী সংসদের নিকট প্রেরিত হওয়ার কথা। কোন অজ্ঞাত কারণে তা' হয় নি। হয়ল্যাণ্ড্‌ এবং ব্যানার্জী লিখেছেন, "পাণ্ডুলিপিটি গত শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতায় আনীত হয়েছিল, এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, মেট্‌কাফ্‌ হল ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আশ্রয় পায়। রেভারেণ্ড্‌ ডব্লু. কে. ফার্সিঙ্গার সেখানে পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেন।" (*) মোন্‌সারেট

* রেভারেণ্ড জন কোররিয়া-আফোসো তাঁর Jesuit Letters and

লিখেছিলেন লাতিন ভাষায়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গলের 'মেময়াস্'' রূপে এটি প্রথম মুদ্রিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ পাণ্ডুলিপির প্রথম কয়েকটি পাতা পাওয়া যায় নি। ফাদার পেরেইরার মুঘল দরবারে উপস্থিতি সময় থেকেই আকস্মিক ভাবে কমেন্টারীর প্রাপ্ত অংশ শুরু হয়েছে।

আকবর সম্পর্কে আবুল ফজলের অতিপ্রশংসা এবং 'মুন্তখাব্-উত্-তবারীখ্' প্রনেতা আবদুল কাদের অল্ বদায়ুনীর (†) নিছক নিন্দা-ভাষনই এতকাল ইতিহাসের উপাদান ছিল। মোন্সারেটের লেখনীতে এই দুইএরই খণ্ডন করা হয়েছে। একজন মহান্ নরপতি এবং সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ও বিচক্ষণ মানুষের পরিচয় পাই মোন্সারেটের বর্ণনায়। অধ্যাত্মলোকের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের আগ্রহশীল এবং প্রবল ব্যক্তিত্ব মণ্ডিত আকবরকে দীর্ঘ শতাব্দী সমূহের ব্যবধানেও উজ্জল মহিমায় দেখা সম্ভবপর হয়েছে পাদ্রীর রচনায়। আকবরের লব্ধ জ্ঞান বা অধ্যাত্মলোকের জন্য আকুতি সত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন, সেই মহান্ মানুষের আকাঙ্খার কথাই পাদ্রী লিপিবদ্ধ করেছেন। বাদ্শাহর চরিত্রের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করেছেন মোন্সারেট্ঃ আকবরের মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী নরপতি-সুলভ হৃদয়হীন কঠোরতা, অমার্জিত কৌতুকপ্রিয়তা, অকারণ

Indian History বইতে লিখেছেন যে গোয়া থেকে যেশুইট্দের অনেক দলিলপত্র বেসরকারী লোকদের সংগ্রহে চলে যায়। কর্ণেল উইল্ফ্রেড্ নামক জনৈক ইংরেজ রাজকর্মচারী মোন্সারেটের 'কমেন্টারী' সংগ্রহ করেছিলেন। সম্ভবতঃ এই ভদ্রলোকই সেই পাণ্ডুলিপি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে দান করেছিলেন। হস্টেন কর্তৃক পাণ্ডুলিপিটি এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে মুদ্রিত হওয়ার পর, সেটি কোথায় গেল তা' জানা যায় নি।

† Lowe কর্তৃক অনুদিত ও Cowell কর্তৃক সংশোধিত ইংরেজী সংস্করণ।

দাক্ষিণ্য, অর্থব্যয়ে কার্পণ্য, তীব্র বিশ্লেষক অন্তর্দৃষ্টি, দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারীদের সম্বন্ধেও বিশ্বাসের অভাব, কুসংস্কার,—সবই পাদ্রীব বর্ণনায় বাস্তব হয়ে উঠেছে। সামান্য এক একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে মোন্‌সারেট্ আকবরের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিদ্রোহী ভ্রাতা হাকিমের পক্ষ থেকে দুজন দূত এসেছিল বাদ্‌শাহ্‌র নিকট আপোষের প্রস্তাব নিয়ে; সে সংবাদ আকবর আগেই জানতেন বা অনুমান করতে পেরেছিলেন। যুদ্ধ না ক'রে শান্তি বজায় রাখা নিশ্চয়ই কাম্য ছিল, কিন্তু আপোষের প্রস্তাব গ্রহণ করা বিষযে কোনও আগ্রহ নেই এটা দেখাবার উদ্দেশ্যে আকবর দূতদের তাঁর নিকট আসতে বললেন এমন সময যখন তিনি পরম উৎসাহে ষাঁড়ের লডাই দেখ্‌ছেন! আপোষেব প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে দূতদের বিদায় করার সময় তাদেব সোনা ও পোষাক বক্‌শিষ দিলেন! মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত একটি বন্দী বলেছিল যে সে ভাল গান গাইতে পারে, তা'কে যেন মুক্তি দেওয়া হয। বাদ্‌শাহ্‌ব আদেশে যখন সে কর্কশ স্বরে গান শুরু করলো, বাদ্‌শাহ্ তা'র গান থামিয়ে সহাস্যে তাকে মুক্তি দিলেন। এই রকম ছোটো খাটো ঘটনা থেকেই মানুষের স্বাভাবিক পবিচয় পাওয়া যায়। মোন্‌সারেটেব রচনায় এই ধরণের বহু ঘটনার উল্লেখ রযেছে।

মোন্‌সারেটের ভারত দর্শন :

গোযা থেকে পাদ্রী মিশন উত্তর দিকে সুরাট অবধি গিয়ে উত্তব-পূর্ব অভিমুখী হয়। সাতপুরা পর্বতমালা পার হয়ে পার্বত্য বন্ধুর ও বিপদসঙ্কুল পথ ধ'রে উজ্জয়িনী; তারপর সুপ্রাচীন পথ ধ'রে গোয়ালিয়র হয়ে ফতেপুরসিক্রি। পথিমধ্যে অনেক প্রাচীন সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক জনপদ অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রাচীন ভাবত তথা হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে মোন্‌সারেট্ বা পাদ্রী মিশনেব কোনও ঔৎসুক্যই প্রকাশ পায়নি। পথের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত এবং অস্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশের কথাই উক্ত হয়েছে। তেমনই আবার যখন বাদ্‌শাহী ফৌজের সঙ্গে দিল্লী, থানেশ্বর এবং পাঞ্জাব-কাশ্মীর সীমান্ত হয়ে পেশোয়ার গিরিপথ

ধ'রে কাবুল পর্যন্ত যাওয়া হ'ল, অথচ ইতিহাস-বিশ্রুত এইসব স্থান বা এইসব অঞ্চলের নরনারী সম্বন্ধে মোন্‌সারেটের কোনও কৌতুহল বা জিজ্ঞাসাই ছিল না। স্থান এবং ঘটনার বর্ণনা তিনি করেছেন, তা' প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্যও বটে, কিন্তু কোথায়ও তা' আবেগ-সমৃদ্ধ নয়। বিরাট ভারতবর্ষের যতটুকু স্থানই তিনি দেখেছেন তা' স্পেন ও পর্তুগাল অপেক্ষা অনেক বড়, অনেক বৈচিত্রপূর্ণ ; বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট। মোন্‌সারেটের রচনায় ভ্রমণবৃত্তান্তের সুস্বাদ নেই, তাঁর 'কমেন্টারী' তথ্যনিষ্ঠ রিপোর্ট্ মাত্র। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন, শুধু এই কথাই বলা যায়।

মোন্‌সারেটের রচনা-শৈলী :

মোন্‌সারেট লিখেছিলেন লাতিন ভাষায়। হয়ল্যাণ্ড্ ও ব্যানার্জী লিখেছেন যে মোন্‌সারেটের রচনা প্রায়ই দুর্বোধ্য ও দুরূহ। একএক সময় তা' আবার খুব প্রাঞ্জল, বিশেষতঃ যখন তিনি কোনও স্থান বা ঘটনার বর্ণনা করেছেন, তখন তা' নিরুচ্ছাস এবং সরল ভঙ্গিতেই ফুটে উঠেছে। মুঘলফৌজ বা তিব্বতীদের বর্ণনা তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাবেই দিয়েছেন। রচনার অনেক জায়গায়ই অশুদ্ধ গ্রীক শব্দ ব্যবহার করেছেন; তিনি গ্রীক ভাষা জানতেন না। স্থান বা মানুষের নামের বানানও সর্বদা এক হয়নি। তাঁর অনেক উক্তি ও মন্তব্যই নীরস বিদ্রুপে পর্যবসিত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর গোঁড়া ইয়োরোপীয় এবং কট্টর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি প্রাচ্যদেশীয় আচার ও সামাজিক বিশ্বাসকে বিচার করেছেন। ইস্‌লাম তথা অখৃষ্টান যাবতীয় ধর্মমতকেই তিনি হেয় জ্ঞান করতেন। প্রায়শঃই কুৎসিৎ ও অশালীন মন্তব্য প্রয়োগ ক'রে তিনি অন্যান্য ধর্ম-মতকে নস্যাৎ করেছেন। ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সামান্যতম্ উদারতাও তাঁর রচনায় প্রকাশ পায়নি।

আকবরের পিতৃকুল তৈমুর বংশ সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ইতিহাসও মোন্‌সারেট্ তাঁর কমেন্টারীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। আকবরের ব্যক্তিত্ব চরিত্র বা তৎকালীন ভারত-ইতিহাস জানার পক্ষে এই অলীক কিম্বদন্তী

সহায়ক নয় বলেই বর্তমান অনুবাদ থেকে তা' বর্জন করা হয়েছে। পাদ্রী লিখেছেন যে তৈমুরের বংশ-পরিচয় ও তৎসম্পর্কিত কিম্বদন্তী তিনি আকবরের মুখে শুনেছিলেন।

মোন্সারেট্ তাঁর রচনায় কোথাও অংমিকা প্রকাশ করেন নি। 'আমি দেখেছি', 'আমি বল্লাম'—এই ধরণের উক্তির পরিবর্তে 'পাদ্রী দেখলেন', 'পাদ্রী বললেন'—এইরূপ উক্তিই লিপিবদ্ধ করেছেন। যেশুইট্দের গোঁড়া সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ব্যতিরেকে সর্বপ্রকার ধর্মমতকেই—এমনকি অন্যান্য খৃষ্টিয় ধর্মমতকেও তিনি মনের দিক দিয়ে সহ্য করতে পারেন নি। পরধর্মের প্রতি বিরাগ ও অশ্রদ্ধা তাঁর লেখনীতে সোচ্চার। ইস্লাম ও পয়গম্বর সম্পর্কে তাঁর বহুতর উক্তি ও মন্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকর। রচনার এই সব অংশ অনুবাদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অসামান্য উদার মনোভাব ও পরমত সহিষ্ণুতা ছিল বলেই সম্রাট আকবর মোন্সারেটের কটূক্তির প্রতিবাদ করেন নি। এও হতে পারে যে মোল্লা মৌলভীদের বিরক্তি উদ্রেকের অভিপ্রায়েই তিনি পাদ্রীদের সংযত করেন নি।

আকবরের ধর্মজিজ্ঞাসা :

এ সত্য অনস্বীকার্য যে আকবর বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনায় গভীর আগ্রহী ছিলেন। তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা প্রকৃতই আন্তরিক ছিল। হিন্দু, জৈন, পার্শী, শিখ প্রভৃতি মতাবলম্বী পণ্ডিত ও শাস্ত্রবিদ্ এবং মুসলমান মৌলানা ও খৃষ্টান মিশনারীদের নিয়ে নিয়মিত ধর্মালোচনা করতেন। নাথপন্থী যোগীদের ডেরায় গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেছেন। তিনি পরম সত্যের অনুসন্ধান করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সত্যানুসন্ধান তাঁর পিতা-পিতামহের উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ রাজ্যবিস্তারী মনোভাব অবদমিত করতে পারে নি, রাজ্যশাসনে মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী কঠোরতা ও ক্রূরতার নিদর্শনেরও অভাব নেই। আকবর 'দীন-ই-ইলাহী, বা তাঁর বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ধর্মমতের উদ্ভব করেন ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ অবধি তিনি রাজত্ব করেন। এই তেইশ বছরে আকবর বড়ো রকমের যুদ্ধ করেন অন্ততঃ আটবার : কাশ্মীর (১৫৮৬), সিন্ধুদেশ (১৫৯০)

ওড়িসা (১৫৯২), বেলুচিস্থান (১৫৯৪), কান্দাহার (১৫৯৫), বিদর্ভ (১৫৯৬), আমেদনগর (১৬০০), আসিরগড় (১৬০১)। অপর পক্ষে সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পর আর কোনও যুদ্ধে লিপ্ত হ'ন নি। আকবরের গুজরাট জয় অশোকের কলিঙ্গ সমর অপেক্ষা কম রক্তক্ষয়ী হয়নি। ধর্মান্তর দূরের কথা, অশোকের মত 'আর দিগ্বিজয় নয়' নীতি গ্রহণ করাও আকবরের পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা। অবশ্য, কান্তিচেতনা এবং অধ্যাত্মচেতনার জন্য আকবরেব আগ্রহ এবং আকুতি সম্বন্ধে ঐকান্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেই তাঁর আগ্রহ এবং আকুতি সফল হবে এরকম বিশ্বাস তাঁর ছিল বলেও মনে হয় না। আচার অনুষ্ঠান থেকে ঈশ্বরবিশ্বাসকে তিনি পৃথক করার চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের গূঢ় অনুভূতির এবং তা' থেকে রসোপলব্ধির ইঙ্গিত অন্তরের নিভৃত স্তরে তিনি পেয়েছিলেন। আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অনীহা বা বিরূপতা অন্তরের গূঢ় অধ্যাত্ম-অভিলাসের অন্তরায় নাও হতে পারে। সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ, নিঃসঙ্গে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সূর্যাবলোকন, একক উপাসনা, আকবরকে চিরকালের জন্য অনন্য ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পারসিক, জৈন, খৃষ্টিয় ও নাথ-যোগী সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর সহৃদয়তার কথা ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে আছে। বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও বৌদ্ধ মানবিক বোধের পরিচয় লাভ করলে আকবব-চবিত্রের বৈশিষ্ট আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত সন্দেহ নেই।

ভারত-ইতিহাসে যেশুইট পাদ্রীদের অবদান :

পাদ্রী মোন্‌সারেটের 'কমেন্টারী' মুদ্রিত হয়নি, যদিও গোয়াস্থিত যেশুইট্‌ যাজকমণ্ডলী ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দেই ভারতে আধুনিক মুদ্রণ কার্যের সূত্রপাত করেছিলেন। ঐ সালেই সেন্ট্‌ জেভিয়ার্স কৃত **Doctrino Christao** পুস্তিকাটি গোয়ায় ছাপা হয়। মুদ্রণ প্রক্রিয়ার আধুনিক প্রয়োগের পর ভারতে এটিই প্রথম মুদ্রিত বই। ঐ বছরই গোয়ার ছাপাখানায় **Concluesos** নামে একটি দর্শনের বইও ছাপা হয়। জাতিতে স্পেনিয়ার্ড এবং গোয়াস্থিত অন্যতম যেশুইট্‌ পাদ্রী জন্‌ বুস্তামান্তেস্‌ ভারতের প্রথম

আধুনিক মুদ্রাকর। (*)

মোন্‌সারেটের 'কমেন্টারী' কিন্তু ছাপা হয়নি। অক্ষর খোদাই করার সময় মুদ্রাকরের যাতে কোনও ভুলভ্রান্তি না হয়, সেজন্য লেখককে ছাপাখানায় উপস্থিত থাকতে হোত। আরব দেশ থেকে ফিরে এসে মোন্‌সারেট্ আর সুস্থ ও কর্মক্ষম হয়ে উঠতে পারেননি। মিশনের ব্যর্থতার দরুণও হয়তো 'কমেন্টারী' ছাপানোর গরজ যাজকমণ্ডলী অনুভব করেননি। গোয়ার যাজকমণ্ডলীর পুঁথিখানায়ই পাণ্ডুলিপি পড়েছিল। কল্‌কাতায় রেভারেণ্ড্ ফার্মিঞ্জার সেন্ট্ পল্‌স্ ক্যাথেড্রালের পুঁথিঘরে পাণ্ডুলিপিটি দেখ্‌তে পান এবং এশিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল-এর উদ্যোগে ফাদার হস্টেন সেটি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। তিনি অসীম ধৈর্য নিয়ে ও অসামান্য পরিশ্রম ক'রে এশিয়াটিক সোসাইটির 'মেময়ার্স' রূপে কমেন্টারীটি মুদ্রিত করেন। হয়ল্যাণ্ড্-ব্যানার্জী রত ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। (*)

---

* অবশ্য এখন অনুমান করা হচ্ছে যে প্রাচীন ভারতেও পুঁথি মুদ্রণের প্রচলন ছিল। অরেল্ ষ্টীন চীনের তুংহুয়াং গুহায় ব্রাহ্মী হরপে ৭৭০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত পুঁথির একটি 'ব্লক' আবিষ্কার করেছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েও পুঁথিপত্র মুদ্রিত হোত। কাঠের প্লেটের উপর অক্ষর উল্‌টো ক'রে খোদাই ক'রে একটি পূরো পৃষ্ঠার 'ম্যাটার' তৈরী হোত। তা'র উপর কালির পোচ্ দিয়ে কাগজে ছাপ দিলেই মুদ্রিত পৃষ্ঠা পাওয়া যেত। বই ছাপানোর এই পদ্ধতিই গোয়ায় অনুসৃত হয়েছিল।

† মোন্‌সারেটের আগে অন্য একজন যেজুইট পাদ্রী গোয়া থেকে উত্তর ভারতে গিয়েছিলেন। এর নাম হেনরিখ্ রথ্। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইনি গোয়া থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মধ্যভারতে কয়েক বছর অতিবাহিত করেন, এবং সেই সময় সংস্কৃত ভাষা শেখেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি লাহোর ও সুরাট হয়ে সমুদ্রপথে পারস্য ও তুরস্ক হয়ে রোমে পৌঁছেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি তামার দুইটি প্লেটে বাইবেলের কিয়দংশ খোদিত ক'রে রোমের পাদ্রী-মণ্ডলীকে উপহার দেন। ইয়োরোপে সংস্কৃত ভাষা ইনিই প্রথম প্রচার করেন।

মোন্‌সারেটের নিবেদন

[গোয়াস্থিত যেশুইট্‌ যাজক মণ্ডলীর সর্বাধিনায়ক ক্লডিয়াস্‌ অ্যাকোয়াভিভার উদ্দেশ্যে মোন্‌সারেট্‌ তাঁর 'কমেন্টারী' নিবেদন করেছিলেন। নিম্নে তা'র অনুবাদ দেওয়া হল।]

"প্রাচীনকালে কেউ ভ্রমণ ব্যপদেশে বিদেশে গমণ করলে প্রত্যেক দিনের ঘটনা ও কাহিনী সতর্কতার সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করতো। আলেকজাণ্ডার যখন এশিয়ায় যুদ্ধযাত্রা করেন তখন এরিষ্টোথেনিস্‌কে ডায়েরী লেখার মত বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। জুলিয়াস্‌ সীজার নিজেই তাঁর দিনপঞ্জী লিখতেন। পারস্যের অধিপতিরাও ডায়েরী রাখতেন; রাজকীয় আদেশে মুন্সীরা সেই কাজ করতো।

স্থলপথের পর্যটক ও সমুদ্রপথে যাঁরা দেশান্তরে যেতেন তাঁদের অনেকেই উপরোক্ত নিয়ম মেনে চলতেন। এর ফলে, ভূগোল, আবিষ্কারের তথ্য এবং ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়ে মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে সম্প্রসারিত করতে পেরেছে।

পূর্বোক্ত কারণে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে যেশুইট্‌দেরও সর্বপ্রকার ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ লিখে রাখা অন্যতম কর্তব্য ব'লে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই নিয়ম শুরু হয়েছিল স্বর্গত

ফাদার ইগ্‌নাটিউস্‌-এর সময় (*) থেকে।

আমরা মঙ্গোল সম্রাট জালালুদ্দীন আকবরের রাজধানী অভিমুখে যে সময় যাত্রা করি তখন ভারতস্থিত যেশুইট্‌ যাজক-মণ্ডলীর সর্বোচ্চ পদাধিকারী রোডারিক ভিন্‌সেন্টিউস্‌ আমাকে পাদ্রী মিশনের ভ্রমণ-কাহিনী ও সম্রাটের দরবার সম্পর্কিত ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে সবকিছু লিখে রাখার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আমি এই দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। প্রতিদিন আমি যে সব অভিজ্ঞতা পেয়েছি, তাঁ'র বিবরণ দিয়েছি; নদী, জনপদ ও গ্রামাঞ্চলের বর্ণনা, অধিবাসীদের আচার, ব্যবহার, ধর্মস্থান এবং রীতিনীতি যেমনটি দেখেছি, তা' যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করেছি। আড়াই বছর নিয়মিত প্রতিদিন সন্ধ্যায় সারাদিনের ঘটনা ও বাক্যালাপের সারাংশ লিখেছি। সম্রাটের দরবারে পৌঁছবার পর সম্রাট খৃষ্টের প্রতি যেরূপ ভক্তিভাব দেখিয়েছিলেন (যদিও তা' ছলনামাত্রই ছিল, যা' আমরা পরে বুঝতে পেরেছিলাম), তা'তে আমরা বিশেষ উৎসাহিত হয়েছিলাম। রুডল্‌ফের প্রতি সম্রাট

---

* Fr. Ignatius Loyola (জন্ম ১৪৯১, মৃত্যু ১৫৫৬) যেশুইট যাজক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইতালীর Guipuz Coa নামক অঞ্চলে জন্ম হয়। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চতর ধর্মশিক্ষার জন্য প্যারী শহরে আসেন। ১৫৩৪ সালে ফ্রান্সিস্‌ জেভিয়ার এবং অন্য কয়েক-জনের সমবায়ে 'সোসাইটি অব্‌ যীশাস্‌' বা যেশুইট্‌ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। যেশুইট্‌ সম্প্রদায় Society of Jesus এর সদস্যরা নিজেদের নামের শেষে S.J. শব্দ দুটি এজন্য লিখে থাকেন। মহামান্য পোপ তৃতীয় পল্‌-এর অনুমোদন পেয়ে এই সম্প্রদায় ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কার্যারম্ভ করে। লয়ওলা অত্যন্ত ধার্মিক ও ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন; ঈশ্বর-বিশ্বাসকে তিনি যুক্তি তর্ক ও সর্ব প্রকার প্রশ্নের উর্দ্ধে স্থাপিত করেছিলেন।

বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করেছিলেন, (যদিও তা' স্বার্থবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নকল সৌজন্য মাত্র), সে কথাও আমি লিপিবদ্ধ করেছি। রুডল্‌ফের ধর্মালোচনায় আগ্রহ, অন্যদের সঙ্গে আলাপ ও তর্কে কৃতিত্ব, সেসব বিষয়ও আমি লিখেছি। মুসলমানদের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক বাদানুবাদ এবং মির্জা হাকিমের বিরুদ্ধে আফগান (কাবুল) অভিযানের কাহিনী, বিশেষতঃ সম্রাটের সামরিক নৈপুণ্য, এসকল বিষয়ও আমি লিখেছি। সম্রাট আকবর কাবুল যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাজধানীর নাগরিকরা তাঁকে নিয়ে যে বিজয়োল্লাস করেছিলেন, পরিশেষে আমি তাও বিবৃত করেছি।

আট বছর আগে আমি এই দায়িত্ব পালনে প্রথম হাত দিই। কিন্তু ডায়েরী শেষ করার আগেই আমাদের যেশুইট্ ভ্রাতৃমণ্ডলীর প্রধান ভ্রাতা পীটর মার্টিনের নির্দেশক্রমে আমি আফ্রিকা (আবিসিনিয়া) যাত্রা করি (*) আরবের ডোফার নামক স্থানে মুসলমানদের হাতে আমি বন্দী হই। স্থানীয়

---

* গোয়ার যাজকমণ্ডলীর নির্দেশে ফতেপুরসিক্রি থেকে ফেরার পর মোন্‌সারেটকে আবিসিনিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হতে হয়। সমুদ্র পথে যাওয়ার সময় আরবের উপকূলে হাড্রামোটের নিকটে ডোফার (বর্তমান নাম 'মীরবাত্') নামক একটি ছোট বন্দরের উপকূলে স্থানীয় দস্যুদের হাতে পাদ্রীরা বন্দী হ'ল। এঁদের সা-না নামক একটি শহরে আবদ্ধ রাখা হয়। এই সংবাদ গোয়াতে পৌঁছয় কয়েক মাস পরে। অর্থের বিনিময়ে পাদ্রীদের মুক্ত ক'রে আনা হয়। কিন্তু মোন্‌সারেট-এর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়; কোনও দিনই আর তিনি কর্মক্ষম হতে পারেন নি। সাল্‌সেট দ্বীপে তাঁর মৃত্যু হয়।

অধিপতি ওমর আমার সামান্য জিনিষপত্র আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। বন্দী থাকাকালে ওমরের অনুমতি পেয়ে আমার লেখা সংশোধন ও সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হই। সকালে ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ ক'রে আনন্দ পেতাম। ফাদার পীটর পেসিউস্‌ও আমার সঙ্গে বন্দী ছিলেন। তিনি ও আমি একত্র থাকায় আমাদের বন্দীদশা নিতান্ত অসহনীয় হয়নি। আমি তাঁর নিকট খ্রীষ্টান-সুলভ আত্মস্বীকৃতি (Confession) ক'রে মনের ভার লাঘব করতাম।

চার মাস এরূপে অতিবাহিত হওয়ার পর আমার লেখাপড়ায় বাধা আসে। আমাকে সা-নায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একজন আলবেনিয়ার ভদ্রলোক তুরস্ক সরকারের ভার-প্রাপ্ত প্রতিনিধি ছিলেন; সা-না তখন তুর্কীদের অধীনে। তিনি আমার প্রতি খানিকটা সদয় হয়েই আমাকে লেখাপড়ার অনুমতি দিলেন এবং আমিও আমার পুঁথিপত্র ফেরৎ পেলাম।

যেশুইট্‌ সমিতির নির্দেশ মেনে নিয়ে আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি কিনা, আপনিই তা'র বিচার করবেন। আমার লেখা পড়ে পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন কিনা তা' আপনিই বলতে পারেন। আমার দিক থেকে বলতে পারি, অবশ্য আত্মশ্লাঘায় যদি আমি অভিভূত না হয়ে থাকি, —তবে ভারত-ইতিহাসের ছাত্ররা, বিশেষতঃ ভূগোল ও সাহিত্য সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী, তাঁরা নিরাশ হবেন না বলতে পারি।

সম্রাট আকবরের রাজসভায় এবং কাবুল অভিযানের সময় যা' যা' দেখেছি, যা' কিছু ঘটেছে, আমি তা'র হুবহু

বর্ণনা দিয়েছি। আমি আশা করি আমার লেখায় ঈশ্বরের গৌরবই প্রকাশ পেয়েছে। এই উদ্দেশ্য শুধু কাম্য মাত্রই নয়, পরন্তু যাতে তা' সফল হতে পারে তা'র জন্যই সর্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি আপনি মনে করেন যে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে, আপনার মূল্যবান বিচারে যদি আমার উপরোক্ত উদ্দেশ্য সফল হয়েছে মনে করেন, তা' হলেই আপনার সন্তোষ বিধান করতে পেরেছি মনে করবো। ইতি॥ —বিদায় ॥"

সা-না,

জানুয়ারী ৭, ১৫৯১ ॥

মোন্‌সারেটের কমেণ্টারী

প্রস্তুতি

বাংলাদেশের সপ্তগ্রামস্থিত ভিকার জেনারেল এবং হুগলী বন্দরের অধিকর্তা ফ্রান্সিস্‌ জুলিয়াস পেরেইরা (*) বিশেষ কোনও একটি প্রয়োজনে সম্রাট আকবরের নিকট গিয়েছিলেন। সম্রাট দীর্ঘ সময় ভিকার জেনারেলের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে জানতে চাইলেন ভারতে পর্তুগীজদের মধ্যে ধর্মযাজক আছে কিনা। প্রত্যুত্তরে ভিকার জেনারেল জানিয়েছিলেন যে তা' আছে এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত ও পণ্ডিত। ফ্রান্সিস্‌ পেরেইরা যেশুইট পাদ্রীদের কথাই বিশেষ ভাবে বলেছিলেন। বাদ্‌শাহ্‌ ইতি-

---

* রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু মহামান্য পোপের ভারতস্থিত আঞ্চলিক প্রতিনিধি। তাঁকে বলা হোত ভিকার জেনারেল। বিশপের সমতুল্য মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ফ্রান্সিস্‌ পেরেইরার পাণ্ডিত্য অপেক্ষা ধর্মপ্রাণতা ছিল বেশী। এঁর ধর্মপ্রাণতায় আকৃষ্ট হয়ে আকবর খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান সংগ্রহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি গোয়া থেকে দুজন পণ্ডিত পাদ্রীকে আমন্ত্রণ করার পরামর্শ দেন। আকবরের খৃষ্ট-জিজ্ঞাসার কথা তিনি গোয়াতে লিখে জানিয়েছিলেন।

পূর্বে ইস্মাইল কুলী খাঁ (*) এবং তাভারেজ্-এর (*) নিকট যেশুইটদের কথা শুনেছিলেন। এই ভাবে অনেকের কাছেই যেশুইট্ পাদ্রীদের কথা শোনার পর সম্রাট ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে গোয়াস্থিত পর্তুগীজ ভাইস্রয় লুই আথাইডে (শাসনকাল ১৫৬৮-৭১ এবং ১৫৭৮-৮১) এবং প্রধান ধর্মযাজককে দুইজন যেশুইট পণ্ডিত তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ ক'রে চিঠি লেখেন। গোয়ার আঞ্চলিক যাজকমণ্ডলীর প্রধানের নিকটও অনুরূপ অনুরোধ পত্র প্রেরিত হয়েছিল। এই পত্রগুলির বক্তব্য এইরূপ ছিল :—

"আল্লাহ্ তাল্লার দয়ায় অধিষ্ঠিত মহান্ জালালুদ্দীন বাদ্শাহ্ ব ফর্মান। সাধু পল্-এর অনুবর্ত্তী যাজক মণ্ডলীর প্রধান, আপনি, এতদ্বারা জ্ঞাত হোন যে

---

* ইস্মাইল কুলী খাঁ ছিলেন আকবরের অন্যতম বিশ্বস্ত কর্মচারী। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে (ব্লকম্যান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০) লেখা আছে যে ইয়োরোপ থেকে আমদানী প্রসাধন ও অন্যান্য শৌখিন দ্রব্য সংগ্রহ করতে এবং পর্তুগীজদের উপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য তাঁকে আকবর গোয়ায় পাঠিয়েছিলেন।

হুগলী বন্দরের প্রশাসনিক অধিকর্তা পিয়েত্রো তাভারেজ রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আকবরের দরবারে গিয়েছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় পর্তুগীজরা বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার, গির্জা নির্মান এবং ভারতীয়দের খৃষ্টান করার অধিকার লাভ করে। এঁরই তদ্বিরে পর্তুগীজদের কাছ থেকে আমদানী শুল্ক আদায় করা রহিত হয়েছিল। ইনিও কিছুকাল ফতেপুরসিক্রিতে ছিলেন এবং আকবরের রাজসভায় যোগ দিতেন।

আমরা আপনাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। আমরা আবদুল্লা (*) এবং ডোমিনিকাস্ পেত্রিউস্ (†) নামক দুইজন দূতকে আপনাদের নিকট পাঠালাম। এঁদের কাছে জানতে পারবেন যে দুইজন পণ্ডিত পাদ্রীকে খৃষ্টধর্ম বিষয়ক প্রধান প্রধান পুস্তক সমেত আমাদের এখানে পাঠাবার জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি। তাঁদের কাছে আমরা প্রকৃত ধর্মব্যাখ্যা শুনতে চাই। আমি নিজে খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম বিষয়ে আদ্যোপান্ত শোনার জন্য আগ্রহান্বিত। পাদ্রীরা যেন আমাদের এই দুই প্রতিনিধির সঙ্গেই চলে আসেন। সম্ভাব্য সব রকম সৌজন্য ও সম্মান সহকারে আমরা তাঁদের অভ্যর্থনা করবো। তাঁদের আগমণ আমার পক্ষে সমূহ আনন্দের কারণ হবে। খৃষ্টধর্ম জানবার যে আকাঙ্খা দীর্ঘকাল পোষণ ক'রে এসেছি, তা' যখন আমার আয়ত্ত হবে, তখনই আপনার প্রেরিত পাদ্রীরা স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করতে

---

* মুনিম খাঁ এবং আজিজ্ কোকাহর অধীনে একাধিক যুদ্ধে আবদুল্লা খাঁ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে আকবরের বিশ্বাসভাজন হন। ইয়োরোপে রাজদূত প্রেরণের সময় এঁকে প্রতিনিধি মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৫৮৯ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

† ডোমিনিকান সম্প্রদায়ভুক্ত পেরেজ পেত্রিউস্ ছিলেন আকবরের অন্যতম সভাসদ। জাতিতে আর্মেনিয়ান। ভারতীয় রমনী বিবাহ করেছিলেন। ১৫৭৮ ও ১৫৯৪ সালে গোয়ায় প্রেরিত বাদশাহী দৌত্য মিশনে দোভাষীর কাজ করেন।

পারবেন। প্রচুর সম্মান এবং উপহার সমেত আমি তাঁদের ফেরৎ পাঠাবো। এখানে আসতে তাঁরা যেন সামান্য দ্বিধাও না করেন। কথা দিচ্ছি যে আমি তাঁদের আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার আওতায় রাখবো। ইতি ॥”

সম্রাটের দূত ভিকার জেনারেলের লিখিত একটি চিঠিও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ভাইস্‌রয়, লুডোভিক্ আথাইডিউস্, প্রধান ধর্মযাজক, পাদ্রীরা এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সম্রাটের আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠেন, উল্লাসের প্রধানকারণ ছিল পেরেইরার চিঠি। তিনি লিখেছিলেন যে সম্রাটের সদভিপ্রায়ে যেন কোনও সন্দেহ করা না হয়। ভাইস্‌রয় সম্রাটের চিঠি যাজকমণ্ডলীর সর্বোচ্চ সমিতির নিকট উত্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। সমিতির সকল সদস্যই (*) তখন গোয়াতে

---

* প্রাচ্য দেশে রাজত্ব অপেক্ষা বাণিজ্য ও লুণ্ঠনই ছিল পর্তুগীজদের উদ্দেশ্য। উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা, আরব দেশগুলির উপকূল এবং ভারতে ও দূর প্রাচ্যে মুসলমান নাবিক, বণিক ও মুস্‌লিম রাজ্যগুলির কর্তৃপক্ষই ছিল তাদের প্রধান শত্রু। অমানুষিক বর্বরতায় তারা' মুসলমানদের বিবোধিত করেছে; বিদেশে স্বজাতি ও ধর্মের প্রসার কল্পে তা'রা বন্দীদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতো, বিদেশের মেয়েদের বিবাহ করতো এবং এই ভাবে ইন্দো-পর্তুগীজ সমাজের সৃষ্টি করে। এই উদ্দেশ্যে তা'রা প্রচুর সংখ্যক ধর্মযাজককে ভারতে ও অন্যান্য দেশে প্রেরণ করতো,। গোয়া ছিল পাদ্রী মণ্ডলীর প্রাচ্যদেশীয় সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক কমিটির কেন্দ্র। মোনসারেটের সময় গোয়াস্থিত কাউন্সিল অব্ বিশপ্‌স্ বা বিশপ সমিতির সদস্য

উপস্থিত ছিলেন। সদস্যদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করেন। প্রায় সবাই বলেন যে কোনও 'ইশ্‌মাইলের বাচ্চার' (*) কথায় আস্থা স্থাপন করা যায় না। সমিতি কোনও সিদ্ধান্ত নিলেন না' সম্রাটের পত্র সম্পর্কে যথাকর্তব্য নির্ধারনের জন্য তাঁরা প্রধান ধর্মযাজক ও অন্যান্য বিশপদের অনুরোধ করলেন। এঁরা সম্রাটের আমন্ত্রণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর ভাইস্‌রয় আর কালবিলম্ব করলেন না। তিনি যাজক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় বিশপ রোডারিক ভিন্‌সেন্টিনুস্‌কে ডেকে কাউন্সিল অব্‌ বিশপ্‌স্‌-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। স্থির হোল যে পাদ্রী রুডল্‌ফ্‌ অ্যাকোয়াডিভাকে নেতা ক'রে এবং দুই-জন সহকারী পাদ্রীকে নিয়ে একটি মিশন সম্রাট আকবরের

সংখ্যা ছিল তিন;— কোচিন ও দক্ষিণ ভারত তথা মালাবার অঞ্চলের জন্য ভারপ্রাপ্ত D. Frey Matheos, মালাক্কার তথা সুমাত্রা, মালয় ও জাভার জন্য ছিলেন D. Joao Rib-eyro Gayo, এবং চীন তথা সুদূর প্রাচ্যের জন্য ভারপ্রাপ্ত ছিলেন D. Frey Leonardo de sa নামক বিশপ। উল্লেখযোগ্য যে পর্তুগীজ পাদ্রীরা শুধু ধর্মপ্রচারেই নিয়োজিত থাকতো না, গোয়েন্দাগিরি এবং অধিবাসীদের হত্যাসাধন,— এই সব বিষয়েও অভিজ্ঞ ছিল।

* মোন্‌সারেট্‌ 'আগারেন্স্‌' শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইশ্‌মাইলের জননী 'হাগার' নাম থেকে শব্দটি উদ্‌ভূত। হাগারের সন্তান, অবজ্ঞার মনোভাব নিয়েই পাদ্রী 'ইশ্‌মাইলের বাচ্চা' লিখেছেন।

রাজসভায় প্রেরণ করা হবে। এই দুইজন হলেন হেন্‌রি-কুয়েজ্‌ এবং মোন্‌সারেট্‌। মিশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া রুডল্‌ফ্‌ ঈশ্বরের আদেশ ব'লে মেনে নিলেন। রুডল্‌ফের ধার্মিকতা সম্পর্কে আমি এর পরেও উদাহরণ দেবো।

ভাইস্‌রয় এবং অন্য সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে পাদ্রী মিশন সম্রাট আকবরের রাজধানী অভিমুখে গোয়া থেকে ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

যাত্রাপথ

পাদ্রী মিশন গোয়া থেকে জলপথে যাত্রা শুরু ক'রে আট দিন পর চাউল (Choul) বন্দরে পৌঁছন। চাউল থেকে দামন। দামনে মিশনের তৃতীয় সদস্য মোনসারেট্‌ মিশনের সঙ্গে মিলিত হন; (তিনি বিলম্বে যাত্রা করেছিলেন)। দামনে চার দিন থাকার পর পাদ্রীরা গন্তব্য স্থল অভিমুখে রওনা হন। মিশনকে বিদায় দেওয়ার সময় স্থানীয় প্রধান যাজক, তাঁর সঙ্গী যাজকরা ও অন্যান্য অনেকে শহর থেকে এক মাইল অবধি এগিয়ে এসেছিলেন। পর্তুগীজ অধিকারের সীমানায় অরোয়ার নামক এক গ্রামে পাদ্রীরা রাত্রি যাপন করলেন। ১৩ই ডিসেম্বর তাঁরা দামন ত্যাগ করেছিলেন। পরদিন সকালে 'নেরা' বা 'পাহাড় নীর' নামের একটি ছোট নদী পার হয়ে মুঘল সাম্রাজ্যে প্রবেশ করলেন। প্রথমে বুলসার (সুরাটের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরে অবস্থিত একটি ছোট শহর), তারপর সুরাটে উপনীত হ'ন। দামন ত্যাগ করার পর তৃতীয় দিনে মিশন সুরাট শহরে পৌঁছল। পথিমধ্যে নওসারিনুম্‌ (নওসারী) নামক একটি জনপদ অতিক্রম করা হয়।

নওসারিনুম (১) শহরে পার্শী বা জোরোয়াষ্ট্রীয়ান বা জরথুষ্ট্রের অনুগামী সম্প্রদায় বাস করে। জাতিগত ভাবে

এদের বলা হয় 'গাব্রিয়াল' (*)। পর্তুগীজরা বলে 'কুরাইনি'। এদের দেহের বর্ণ শ্বেত, ইহুদীদের অনুরূপ। ইহুদীদের মতোই এদের শারিরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট। পরিশ্রম-সহিষ্ণুতায় এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও পোষাক পরিচ্ছদ এবং আচরণ ব্যবহারে এদের সঙ্গে ইহুদীদের সাদৃশ্য প্রচুর। পর্তুগীজরা অনেক সময় ভুল ক'রে এদের ইহুদী বলে; এরা তা'তে কোনও আপত্তি করে না। কারণ, ইহুদী ও পার্শী উভয় সম্প্রদায়ই আব্রাহামের বংশধর ব'লে নিজেদের পরিচয় দেয়। হিব্রুদের মতো এরাও ছুন্নৎ ক'রে থাকে। নিজেদের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থের নজীর উধৃত ক'রে এরা খৃষ্টের পুনরাবির্ভাবের সঠিক দিনক্ষণ নিরূপণ করে। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠি ও সম্প্রদায় থেকে এদের আলাদা করে চেনার একটি সহজ উপায় আছে: এরা হাঁটু অবধি প্রলম্বিত একরকম বস্ত্রাবরণ দিয়ে শরীরের উপবাংশ ঢেকে রাখে। এই আবরণ বা আলখাল্লার দুই প্রান্ত সেলাই করা ও পরস্পর সংযুক্ত। এর এক অংশ মস্তকাবরণের কাজ করে। বুকের কাছে চার ইঞ্চি পরিমিত একটি চতুষ্কোণ অংশ ভাজ করা থাকে (অনেকটা শার্টের বুক পকেটের মতো)। এই অংশে কোনও জিনিস রাখা এদের সংস্কার বিরুদ্ধ। পশমে তৈরী একটি কটি-বন্ধনী দিয়ে এই আলখাল্লা শরীরের সঙ্গে আটকে রাখা হয়। ধর্মীয় অনুশাসন

* আরবী শব্দ 'কাফির' (অবিশ্বাসী) —(তুর্কী কিয়াভুব—গাবর) পারস্যে মুসলমানরা জোরেয়স্ট্রিয়ানদের এই বিশেষণে অভিহিত করতো।

অনুযায়ী প্রত্যেক পার্শীকেই আলখাল্লা পরতে হয়। মৃতদেহ স্পর্শ করলে এরা অশুচি বোধ করে। বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে মৃতদেহ বাইরে নিয়ে আসা পার্শীদের পক্ষে দোষাবহ। বাড়ীর পিছন দিকের দেওয়াল ফুটো ক'রে লাশ বার করতে হয়। মৃতদেহ কাঁধে ক'রে নিয়ে যাওয়া হয় না, দুই পায়ে দড়ি বেঁধে লাশ উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে যাওয়াই এদের নিয়ম। একটা উঁচু পাঁচিল-ঘেরা জায়গায় মৃতদেহ ফেলে রাখা হয়। পুড়িয়ে ফেলা বা কবর দেওয়া অপেক্ষা শকুন চিল কাক প্রভৃতির আহার্য ক'রে রাখাই যেন শ্রেয়ঃ। মৃতব্যক্তির ব্যবহৃত কোনও জিনিষই আর কেউ ব্যবহার করে না। মৃতদেহ অপসারিত হ'লে বাড়ীর চৌবাচ্চা, কলসী ও যাবতীয় পাত্র থেকে জল ফেলে দেওয়া হয়। ইহুদীদের ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে পার্শীদের এই ধরণের মিল লক্ষণীয়।

পার্শীরা যদিও ইহুদীদের ধর্মীয় আচার আচরণ অনেকটাই গ্রহণ করেছে, তবুও এক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। পার্শীরা অগ্নি এবং সূর্যের উপাসনা করে, অগ্নির উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মান করে। উপাসনার জন্য পুরোহিত, মন্দিরের জন্য পরিচালকমণ্ডলী এবং শান্তি স্বস্ত্যয়নের জন্য লোকজন নিযুক্ত করা হয়। এরা অগ্নিকে পবিত্র মনে ক'রে ঘি এবং সুগন্ধিতেল পোড়ায়। কোনও বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হলে এরা জ্বলন্ত আগুনে জল ঢেলে নিবিয়ে দেয়; এরকম না করলে অঙ্গীকার বৈধ বা বিশ্বাসযোগ্য হয় না।

উৎসবের দিন পার্শীরা সকালবেলা অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে প্রার্থনা করে। এদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে। একটি পুস্তকে এদের ধর্মগ্রন্থ নিবদ্ধ। যা'রা এদের বর্ণমালা জানে তা'রাই শুধু এদের ধর্মগ্রন্থ পড়তে পারে। তিন খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে ধর্মীয় অনুজ্ঞা, অতীতে আচরিত নীতি নির্দেশ এবং প্রাচীন ঋষিদের উচ্চারিত মন্ত্রসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। দুধ, ঘি, তেল, শাক, শব্জি, শস্য এবং ফলই এদের আহার্য। এরা মদ্যপান করে না। ইচ্ছামতো বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারে। অসতী স্ত্রীলোকের নাক কেটে দেওয়া হয় এবং এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক যদি বেশ্যা-জীবন যাপনে ইচ্ছুক হয়, তা'কে বাধা দেওয়া হয় না।

মোট কথা এই যে, পার্শীরা এমন বর্বর যে অন্যান্য 'হিথেন্' ও পার্শীতে কোনও প্রভেদ নেই। কোনও রকম জাতীয় দুর্বিপাক দেখা দিলে এরা বীভৎসভাবে আত্মহত্যা করতে পারে (*)।

সুরাট

সুরাট (২) শহরে পাদ্রীরা একমাস অবস্থান করতে বাধ্য হ'ন। কারণ, বাদশাহ্‌র প্রতিনিধি শুভতিথির অপেক্ষায় যাত্রা স্থগিত রেখেছিলেন। কোনও কাজ শুরু করার আগে

* পাদ্রীর জাতি-বিদ্বেষ প্রসূত উক্তি ও বর্ণনার, বিশেষতঃ শবদেহ সংকার সম্পর্কিত উক্তির কোনও তথ্যগত সমর্থন পাওয়া যায় নি। 'হিথেন' বা অখৃষ্টান মাত্রেই বর্বর ও ইতর, —এই মনোভাব ইয়োরোপীয়দের বহুদিনের মজ্জাগত।

মুসলমানরা লক্ষ্য করে যে সূর্যোদয়ের পরও আকাশে চাঁদ দেখা যায় কিনা। যদি দেখা যায় তবে সেই দিনটি শুভ ব'লে বিবেচিত হয়। বাধ্যতামূলক একমাস অপেক্ষা করার সময়টা সহযাত্রী মুসলমানরা অলসভাবে কাটিয়ে দিল। পাদ্রীরা এই সময় ফারসী ভাষা শেখায় মনোনিবেশ করলেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের লোকজন পাদ্রীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে আসতো। বিচিত্র তাদের বেশভূষা, ভাষা ও আচার ব্যবহার। বাদ্‌শাহ্‌র আমন্ত্রণ একটা বিশেষ সম্মানজনক ব্যাপার। অভিনব পোষাক পরিহিত ও অন্যদেশীয় আদব কায়দায় অভ্যস্ত পাদ্রীদের তা'রা সকলেই সম্ভ্রম ও সমাদর করতো। সকলেই একবাক্যে বাদ্‌শাহ্‌র প্রশংসা করতো। সম্রাটের আমন্ত্রণ যে নিশ্চিতই সদিচ্ছা-প্রণোদিত এবিষয়ে তাদের দ্বিমত ছিল না। পাদ্রীরা এই সব লোকজনদের যীশুখৃষ্ট ও মাতা মেরীর প্রতিকৃতি দেখাতেন; দর্শকরা তাতে অভিভূত হয়ে ছবি চুম্বন ক'রে ও মাথা ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা জানাতো। যা' প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ তা'র প্রতি সম্মান প্রদর্শন অবশ্যই স্বাভাবিক ব্যাপার; তবে কুসংস্কার ও অন্ধ প্ররোচনার প্রভাবেই সত্য ও শ্রেয়ঃকে সব সময় শ্রদ্ধা করা হয় না।

একদিন একটি আশ্চর্য ব্যাপার হয়েছিল; বলা যেতে পারে যে তা' ছিল দৈব ঘটনারই মতো। আগন্তুকদের একজন—কাফেরই হবে, ইহুদী বা পার্শীও হ'তে পারে—পাদ্রীদের সঙ্গে তুমুল তর্ক শুরু ক'রে দিল। ইতিমধ্যে রুডল্‌ফ্‌ তাঁ'র ঝোলা থেকে একটা কোটো নিয়ে এলেন; তা'র ভিতর ছিল সেন্ট্‌ ষ্টিফেন ও অন্যান্য অনেক সাধু সন্তের স্মারক চিহ্ন। রুডল্‌ফ কোটোর ঢাক্‌নি খুলতেই কাফেরটি

ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, পাগলের মতো চীৎকার ক'রে বলতে থাকলো, 'যদি ওর ভেতর মড়ার হাড় থাকে তবে এখনই আমার জামা কাপড় ছিড়ে ফেলব।' রুডল্‌ফ্‌ তখন প্রকৃত খ্রীষ্টানুরাগীর মতো ধীর শান্ত স্বরে বললেন, "আমরা মৃতদের নয়, জীবন্ত মানুষের হাড় বহন করি।" এই কথা ব'লে তিনি কোটোর ঢাক্‌নি বন্ধ ক'রে দিলেন। কাফেরটি তখন ভীতভাব কাটিয়ে আবার আলোচনায় যোগ দিল।

সুরাট শহর তাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত। তাপ্তী নদী শহর থেকে ভাটিতে ছ' মাইল দূরে সমুদ্রে মিশেছে। শহরটি সুরক্ষিত; এখানকার সেনানিবাসে দুইশত তীরন্দাজ অশ্বারোহী সর্বদা মোতায়েন থাকে। শহরের পাশেই একটি সুবৃহৎ দীঘি আছে; দীঘির পার বাঁধানো এবং নানা রঙের পাথরে সুরঞ্জিত। সমগ্র ভারতে এর তুলনা নেই। দীঘির চার পাশেই চওড়া মার্বেল পাথরের সিঁড়ি; সিঁড়ির এক একটা ধাপ দু'শ ফুট প্রশস্ত। দীঘির মাঝখানে একটি সুন্দর কারুকার্য মণ্ডিত সুউচ্চ মিনার আছে। নৌকোয় ক'রে নাগরিকরা সেখানে অবসর বিনোদন করতে যায়। সুরাটে খাজা সোফারিস্‌-এর (৩) একটি সমাধিও আছে। ইয়োরোপীয় লেখকরা প্রায়ই এর বিশ্বাসঘাতকতা ও চরিত্রহীনতার কথা লিখে থাকেন। এই সমাধিটির গড়ন একটু অসাধারণ, খুব সূক্ষ্ম স্থাপত্য কর্মে সমৃদ্ধ। নিকটে আর একটি অপদার্থের কবর আছে (*)। লোকটি ছিল ইথিওপিয়ান, খাজা

---

* মোন্‌সারেট্‌ সম্ভবতঃ সেরিয়াম নামক হাব্‌সী সেনাপতির কথা

সোফারিসের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি এবং খৃষ্টান-বিদ্বেষী। দামানের পর্তুগীজ শাসনকর্তার আদেশে একে বধ করা হয়। স্থানীয় স্ত্রীলোকেরা ফুল নিয়ে এসে এর কবর সাজিয়ে দেয় এবং পীর-ফকিরের মর্যাদা দেয়।

সুরাট একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে প্রচুর সংখ্যক বণিক ব্যবসায়ীরা বাস করে। বন্দর সর্বদাই বাণিজ্যপোতে পুর্ণ থাকে। নিকটেই সমুদ্র, নদী এখানে বেশ গভীর। পোতাশ্রয়ের পক্ষে খুবই উপযোগী।

শেষ পর্যন্ত আকাঙ্খিত শুভতিথির উদয় হোল। সূর্যোদয়ের পরও পাণ্ডুর চাঁদ আকাশে দেখা গেল। পাদ্রী মিশন পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। উট, পালকি ও অন্যান্য যানবাহন এবং প্রয়োজনীয় লোকজন সংগৃহীত হয়েছিল। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী পাদ্রীরা সুরাট ত্যাগ ক'রে সম্রাট আকবরের রাজধানী অভিমুখে রওনা হলেন। পাদ্রীদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে সম্রাট নিশ্চয়ই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন।

ভীল অঞ্চল

পরের দিন পথিমধ্যে পাদ্রীরা এক বিপদের মুখে পড়েন। মিশনের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে ডুলীতে ক'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ডুলীবাহকেরা জোর কদমে চলে মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিল।

লিখেছেন। সেবিয়াম নামক জনৈক সেনাধ্যক্ষ ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে দামনের যুদ্ধে বন্দী হয়ে পর্তুগীজদের হাতে নিহত হয়।

ওরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল এই উদ্দেশ্যে যে সুযোগ পেলেই পীড়িত পাদ্রীকে পথের ওপর ফেলে পালিয়ে যেতে পারবে। এই অগ্রগামী দলের সঙ্গে আর একজন পাদ্রীও ছিলেন। এক সময় বিপরীত দিক থেকে সুরাটের মুসলমান শাসনকর্তা আসছিলেন। ডুলীবাহকদের সামনাসামনি হ'লে শাসনকর্তা তাদের পরিচয় ও গন্তব্য স্থানের কথা জানতে চাইলেন। শাসনকর্তার সঙ্গে অনেক ভারতীয় অনুচর ছিল। তা'রা বিদেশী লোক দেখে 'ফ্রাঙ্ক্' 'ফ্রাঙ্ক্' ব'লে চিৎকার ক'রে পাদ্রীদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে ধাওয়া করলো। শাসনকর্তা তড়িৎবেগে ঘোড়া ফিরিয়ে আক্রমণকারীদের নিবৃত্ত করতে সচেষ্ট হলেন। যদি আত্মরক্ষার্থে পাদ্রীদের কেউ দুর্বৃত্তদের কাউকে হত্যা করতো তাহলে মুসলমান দুর্বৃত্তরা তাদের সকলকেই মেরে ফেলতো সন্দেহ নেই। মিশনের অপরাপর পাদ্রীরা ডুলী-বাহকদের দ্রুতপদে এগিয়ে যেতে দেখে সন্দিহান হন এবং তাঁরাও চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যখন অগ্রগামী দলের সঙ্গে মূল দলেব সাক্ষাৎ হোল, তখন পাদ্রীরা ঈশ্বরের দয়ায় বেঁচে গিয়েছেন ব'লে পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

এর পরের দিন পাদ্রীমিশন একটি দুর্গের নিকট পৌঁছলেন। একটি প্রাচীন হিন্দুমন্দির ধ্বংস ক'রে তা'র ইট পাথর দিয়ে দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দির ধ্বংস করা দোষাবহ হোত না, যদি দুষ্কৃতকারীরা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সৎকাজ করতো। দুর্গের পাশেই তাপ্তী নদী। পাদ্রীরা দুর্গের পাশে নদীর পারে তাঁবু খাটালেন। সেদিন ছিল রথ-সপ্তমী, হিন্দুদের পক্ষে একটি পবিত্র দিন। পুণ্যার্থীরা দলে দলে নদীতীরে এসে

বস্ত্র ত্যাগ ক'রে স্নানের উদ্দেশ্যে জলে নামছে ; তাদের প্রত্যেকের মাথায় প্রজ্বলিত প্রদীপ। পুণ্যার্থীরা ধীরে ধীরে মাথা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে নিলে প্রদীপটি নদীর স্রোতে ভেসে যেতে থাকে। এতে নাকি তা'র সর্বপাপ দূর হ'য়ে যায় !

নদী পার হয়ে পাদ্রী মিশন সুলতানপুর (*) পৌঁছলেন। ঐ দিন একটি মুস্‌লিম পরব ছিল। সম্রাটের প্রতিনিধিরা এই উপলক্ষ্যে এখানে তিনদিন থেকে গেলেন। এখানে ওরা কোরবানী করে। তিন দিন পরে পাদ্রী মিশন সাতপুরা পর্বতমালা অতিক্রম ক'রে সিন্দোয়া শহরে পৌঁছলেন। সমুদ্র থেকে পঁচাত্তর মাইল পূর্বে অবস্থিত এই পর্বতমালা ষোলো মাইল চওড়া। এই পার্বত্য অঞ্চল পার হতে চার দিন লেগেছিল। সরু আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে চল্‌তে হয়েছিল। দুরতিক্রম্য পথে উটগুলিকে একের পিছনে আর একটি, এই ভাবে চালিয়ে নেয়া হয়। উটে টানা মালবোঝাই গাড়ী-গুলি কাঁধে ক'রে পার করতে হয়। বন্ধুর পথ, দুই পাশে নিবিড় অরণ্য। এই পথে সম্রাটের প্রতিনিধিদলের একজন

---

* ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন খিল্‌জীর সেনাপতি মালিক নায়েব কাফুর দাক্ষিণাত্যে অভিযানকালে এখানে বিশ্রাম করেছিলেন। সুলতানের নামানুসারেই শহরের নামকরণ হয়। ভীলদের সহযোগিতায় যশোবন্ত রাও হোল্‌কার এই শহর ধ্বংস করেন। পশ্চিম খান্দেশ জেলায় অবস্থিত এই শহর তৎকালে দিল্লী তথা উত্তর ভারত থেকে দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিমোপকূলে যাওয়ার পথে ছিল।

লোক দস্যুদের হাতে নিহত হয়; কোনও প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হয়নি। এই পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা ভূত প্রেতের পূজা করে। তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্যে এই পার্বত্য অঞ্চল বিভক্ত, তিনজন রাজার মধ্যে একজন প্রধান, সকলে তা'কে সম্রাটতুল্য সম্মান করে ও তাঁর আদেশ মেনে চলে (*)। মঙ্গোলদের সঙ্গে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকে। একদলের সঙ্গে যখন মঙ্গোলরা সন্ধি করে, তখন অপর দুই রাজ্যের অধিবাসীরা মঙ্গোল সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণে নাস্তানাবুদ করে। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ খুবই কম হয়। চোরাগুপ্তি আক্রমণ ও লুঠতরাজই এদের প্রধান কৌশল। এই সব স্থানীয় অধিবাসীদের 'ভীল' বলা হয়। এরা বন্য এবং অত্যন্ত বর্বর ও হীন প্রকৃতির। বাঁশে তৈরী ধনুক এবং সূক্ষ্মাগ্র ছোট ছোট তীরই এদের হাতিয়ার। এদের কোনও অশ্বারোহী বা গোলন্দাজ সৈন্য নেই, শুধু অব্যর্থ তীর চালিয়েই এরা মঙ্গোল বাহিনীকে বিপর্যস্ত ক'রে থাকে। ভীলরা অত্যন্ত দুঃসাহসী, পার্বত্য ও আরণ্য পরিবেশই এদের সহায়। গভীর খাদ ও নিবিড় অরণ্যই এদের আত্মরক্ষার ও আত্ম-গোপনের শ্রেষ্ঠ পরিবেশ। যথাসাধ্য এরা সম্মুখ সমর এড়িয়ে চলে।

এই অঞ্চলের প্রধান শহরের নাম সাতপুরা। ভীলদের প্রধান রাজার রাজধানী এখানে। খুব উঁচু ও চওড়া প্রাচীরে ঘেরা শহরটি বেশ সুরক্ষিত। কিন্তু প্রাচীর-বেষ্টনীর অভ্যন্তরে ভীলদের বাসগৃহগুলি নিতান্তই কুঁড়ে ঘর ও দারিদ্রের পরিচায়ক।

বিপদ সঙ্কুল পার্বত্য অঞ্চলের শেষ দিকে একটি সঙ্কীর্ণ

ও ভয়াবহ পথ অতিক্রম ক'রে আমরা সুরানা পৌঁছলাম। ৩১শে জানুয়ারী রাত্রি এগারোটায়—যখন আমরা সুরানায় পৌঁছই তখন চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছিল। পরের বছর সংবাদ পাই যে ঐ চন্দ্রগ্রহণের দিন পর্তুগালের রাজা হেন্‌রি (৪) পরলোক গমণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখও ৩১শে জানুয়ারী। রাজা হেন্‌রির জন্মদিনে পর্তুগালের উলিপ্‌সিন জেলায় প্রচুর তুষারপাত হয়েছিল, ওর আগে কোনওদিন ঐ অঞ্চলে তুষারপাত হয়নি। জন্মের দিন হয়েছিল তুষারপাত, মৃত্যুর দিন হোল চন্দ্রগ্রহণ। জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ এক এবং উভয় দিনই প্রাকৃতিক দুর্বিপাক দেখা দিয়েছিল ব'লে রাজা হেন্‌রি সম্পর্কে পর্তুগালের জনগণ বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ ক'রে থাকে। যাই হোক, তাঁর মৃত্যুর দিন চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং তারপর থেকেই পর্তুগালের দুরবস্থা ঘনিয়ে আসে।

সুরানার অদূরে নর্মদা পার হয়ে পাদ্রী মিশন আহমেদাবাদে পৌঁছলেন। ব্রোচের নিকট নর্মদা সমুদ্রে মিশেছে। বর্ষাকালে এই নদী স্ফীতকায় হয়, ঘোলাটে জলরাশি সবেগে প্রবাহিত হয়, সেতু বা নৌকা ব্যতিরেকে নদী পারাপার হওয়া যায় না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে নদীতে জল থাকে কম, তখন হেঁটেই পার হওয়া যায়। নদীতে প্রচুর মাছ ও কচ্ছপ। গ্রীষ্মকালে জল যখন পরিষ্কার থাকে, তখন নদীর তলদেশের নুড়িটি অবধি গুণে দেওয়া যায়। নদীর উভয় তীরেই লতাপাতার ঝাড়, তাতে অনেক ওষুধের গুল্মও আছে (*)।

---

* ব্রোচের প্রাচীন নাম 'ভৃগু কচ্ছ' বা ভৃগুর তীর। গ্রীকরা

মাণ্ড

নর্মদা পার হওয়ার দুইদিন পরে পাত্রীরা মাণ্ডুশহরে (৫) পৌছন। শহরটি যে এককালে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল, এখনও তা'র নিদর্শন দেখা যায়। বিরাট প্রাসাদের মতো সব বাড়ী,—তা'র অনেকই এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত বটে,—যে সব বাড়ী এখনও ব্যবহারের যোগ্য আছে, তা' দেখেই শহরের অতীত দিনের অবস্থা বেশ অনুমান করা যায়। এক সুউচ্চ ও সুপ্রশস্ত প্রাচীর শহরের চতুস্পার্শ্ব বেষ্টন ক'রে আছে। প্রায় চব্বিশ মাইল দীর্ঘ এই প্রাচীর, অনেক অংশই এখনও অটুট রয়েছে। পূর্বোক্ত প্রাচীর ছাড়াও, শহরের চারদিকেই পাহাড় ও গভীর খাদ এবং পাহাড়ের খাড়াই মাণ্ডুকে দুর্ভেদ্য ক'রে রেখেছে। মাত্র একটি অপরিসর রাস্তা দিয়ে শহরে প্রবেশ করা যায়। শহরে কখনও জলের অভাব হয় না, শহরের মধ্যে অনেক জলাশয় এবং শহরের আশে পাশে অনেক ঝরণা ও গভীর কুপ আছে। শহরের প্রবেশ মুখের পরই পাহাড়ের খাড়াইতে পর পর পাঁচটি প্রাচীর। ফলে, শত্রুর পক্ষে শহর আক্রমণ ও অধিকার করার সম্ভাবনা কম। একমাত্র খাদ্যের সরবরাহ বন্ধ করা ছাড়া মাণ্ডু শহরকে পর্যুদস্ত করার অন্য কোনও উপায় নেই। এই শহরের প্রতিষ্ঠা কবে হয়েছিল তা' সঠিক কেউ বলতে পারে না। মুসলমানরা—স্বভাবতঃই এরা বর্বর—ইতিহাসের কোনও গুরুত্ব বোঝে না। এদের ইতিহাস শুধু

এর নাম দিয়েছিল 'বারুগজ'। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে ব্রোচ্ খুব সমৃদ্ধ ও উন্নত নগরী ছিল। "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সূতীবস্ত্রের উৎপাদক" এই নগরীকে পর্তুগীজরা ধ্বংস ও লুণ্ঠন করে।

কিম্বদন্তী ও উপকথার বেশি কিছু নয়। যাই হোক, প্রাচীরের গঠন পর্যবেক্ষণ ক'রে মনে হয় যে মাণ্ডু খুব পুরনো শহর নয়, মুসলমানদের রাজত্বকালেই নির্মিত হয়েছে। আমি শুনেছি মঙ্গোলরাই শহরটি নির্মাণ করেছিল। অবশ্য বর্ত্তমান কালের মঙ্গোলদের মতো প্রসিদ্ধ ছিল না তা'রা। কিম্বদন্তী এই যে, মঙ্গোলরা নিজেদের দেশে স্থানাভাব হওয়ায় নতুন স্থানের অন্বেষণে ভারত আক্রমণ করে এবং মালব প্রদেশের সর্বোত্তম এই অংশে তা'দের একটি শাখা এসে বসবাস করে। এই মঙ্গোলরা পরবর্ত্তীকালে পাঠানদের কাছে অনেক সংগ্রামে পরাজিত হয়ে মাণ্ডুতে আশ্রয় নেয়। সাত বছর ধ'রে অবরোধ ক'রে পাঠানরা শেষ পর্যন্ত মাণ্ডু শহর ধ্বংস করে। পাঠানরা বুঝতে পেরেছিল যে, সোজাসুজি আক্রমণ ক'রে মাণ্ডু অধিকার করা যাবে না; তাই তা'রা শহরের খাদ্য যোগানের পথ বন্ধ ক'রে নগরবাসীদের 'ভাতে মারার' ব্যবস্থা করে। পাঠান-রাজ মাণ্ডু শহরের প্রবেশ পথের পাশে রাজমিস্ত্রী, কামার, কুমোর, মজুর ও ঠিকাদারদের সাহায্যে তা'র সৈন্যদের জন্য একটি ছাউনী তৈরী করিয়ে নেয়। ছাউনিটি এত বড় ছিল যে তা'কে একটি শহরই বলা যায়। মাণ্ডুশহরে যেন কোনও দিক দিয়েই খাদ্য যেতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে অশ্বারোহীদের দিয়ে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হয়। শহরের পিছনের দিকে খাড়া পাহাড় বেয়ে মাণ্ডুতে প্রবেশের একটি পথ ছিল, কিন্তু তা' এতই দুরারোহ যে সে পথে খাদ্য বা কোনও দ্রব্যই বয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল; তথাপি সে পথেও কড়া নজর রাখা হ'ল। শেষ পর্যন্ত শহরের পতন ঘটে এবং পাঠান রাজের নির্দেশে তা' ধ্বংস করা হয়। শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি

বিরাট কামান আছে, হিন্দুরা কোনও অজ্ঞাত কারণে তাতে তেল সিঁদুর মাখিয়ে রেখেছে ; এটিকে তা'রা ফুল পাতা দিয়ে নিয়মিত পূজা ক'রে থাকে। খুব বড়ো একটি প্রাসাদ আছে ; সেকালে মাণ্ডুর রাজারা এখানে বসবাস করতো। বর্তমানে মুঘল সম্রাটের আঞ্চলিক শাসনকর্তা বাস করে। একটি অর্ধ-নির্মিত সমাধি আছে, —বোধ হয় কোনও দিনই তা' সম্পূর্ণ হবে না। এই সমাধির বিশাল আয়তন ও স্থাপত্য কর্ম বিশেষ দর্শনীয়। একটি চতুষ্কোণ বেদীর উপর কবরটি স্থাপিত। সমগ্র সমাধিও চতুষ্কোণ ও সুউচ্চ ভিত্তির উপর নির্মিত। মাটি থেকে পাঁচ হাত উঁচু ও আশী ফুট দীর্ঘ এই সমাধির সর্বত্র স্তম্ভ ও বাঁকা খিলানের ছড়াছড়ি। কবরটি আড়ে পাশে বিশ ফুট। মেঝে থেকে চল্লিশ ফুট উঁচুতে সমাধির গম্বুজের তলদেশ। সমাধির চার কোণে চারটি মিনার, প্রত্যেকটি সাত তল বিশিষ্ট। মিনারগুলি অষ্টতল ; প্রতিটি তল পাঁচ হাত উঁচু। মিনারগুলির চারদিকে জানালা আছে, সেখানে মুয়াজ্জিনের আজান ধ্বনিত হয়। এই আওয়াজ শুনে মুসলমানরা নামাজে সমবেত হয়। কবরের বেদীর উপর তিনজন মঙ্গোল (*) নবাবের মৃতদেহ প্রোথিত রয়েছে। একজন নবাবের গৃহশিক্ষকের কবরও এই সমাধির নিকটে দেখা যায়। কবর তিনটির সামনে তিন নবাবের ব্যবহৃত সোনালী কাজ করা সিংহাসন স্থাপিত

---

* মোন্‌সারেট তাঁর ডায়েরীর সর্বত্রই 'মুঘল' শব্দের স্থানে 'মঙ্গোল' লিখেছেন।

আছে। সমাধি হর্ম্যে সাজানো মোজেইক্, অগভীর রিলিফ্-এ ভাস্কর্য ও জাফ্রির কাজ দেখা যায়।

মাণ্ডুতে খৃষ্টীয় চার্চের আদলে তৈরী একটি মন্দিরও আছে। মন্দিরের দুই পাশে দুইটি উপমন্দির, সেখানে বেদী বানিয়ে পূজা ও আরতি করা হয়। এই উপমন্দির দুইটির পাশে একটি ক'রে দরোজা আছে,—যা দিয়ে মূল মন্দিরে পাশ থেকে প্রবেশ করা যায়। উপমন্দির দুইটির প্রত্যেকটিতে উপরে একটি কুঠরী আছে, তা'র ছাদের চালা ও কার্নিস বক্রায়িত। হয়তো আমার উক্তি অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে, তবু লিখছি যে, শহরের প্রাচীরের বাইরে একটা কবরখানা আছে,—যার দৈর্ঘ্য ছয় মাইল। কথাটা অত্যুক্তি নয়,—মুসলমানেরা কি বিপুল অর্থব্যয় ক'রে সুরম্য কবর নির্মান করে যে বলার নয়। মহম্মদের নাম ক'রে যারা মারা যায়, বেহশ্তের অধিবাসী সাধু সন্তদের সমপর্যায়ভুক্ত ক'রে তাদের গণ্য করা হয়। এতটা দৃঢ় বিশ্বাস,—মহম্মদের নাম নিয়ে মৃত্যু হ'লে সাধু সন্তদের সঙ্গে স্বর্গবাস সম্পর্কে নিশ্চয়তা —অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না।

উজ্জয়িনী

মাণ্ডু ত্যাগ করার পর দ্বিতীয় দিনে পাদ্রী মিশন মাছি-ওয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত উজ্জয়িনী (৬) নগরীতে উপনীত হলেন। উজ্জয়িনীর স্থাপয়িতা বীর বিক্রমকে (*) দেবতুল্য

* দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত; বিক্রমাদিত্য নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। রাজত্ব-কাল ৩৭৫-৪১৩ খৃষ্টাব্দে। মালব-বিজয়ের পর ইনি শক রাজ-

সম্মান দেখানো হয়। গুজরাটের অধিবাসিরা এই রাজাকে সর্বপ্রকার ব্যবহারিক শিল্পের উদ্‌গাতা ব'লে বিশ্বাস করে। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরাও এই রাজার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। এই নগরীতে বহু প্রাচীন নদী আছে; বলা হয় যে এই রাজার রাজত্বকালেই সেই সব মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এখনও এখানকার অনেক মন্দিরই ভালো অবস্থায় বিদ্যমান। প্রবাদ এই যে, এই রাজা ভারতের অন্য অনেক স্থানেও অনুরূপ সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই সব মন্দিরেব একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে; দেখতেও ভাল লাগে, যদিও রোমক স্থাপত্যের তুলনায় অনেক নিম্ন মান সম্পন্ন।

পাদ্রীরা যে সময় উজ্জয়িনীতে ছিলেন সেই সময় হিন্দুরা এক বৃদ্ধেব মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। শবাধার সোনালী রঙে রঞ্জিত ছিল। শবযাত্রা রাত্রিতে হয়েছিল; কিন্তু শবযাত্রা যে পথ দিয়া যাবে আগে থাকতেই তা' পবিস্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখা হয়েছিল, কুটোটি পর্যন্ত ঝাঁট দিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। খুব সতর্কভাবেই পথঘাট পরিস্কার করা হয়েছিল। ধূপ ও অন্যান্য সুগন্ধি মশলা শবাধারের চারপাশে সাজিয়ে রাখা হয় এবং সেগুলি সারাপথ ধ'বে পুড়তে থাকে। এই সব অখৃষ্টান হিথেনরা যাদের সাধু সজ্জন বলে মনে করে, তাদের প্রতি কী সম্মানই

শক্তিকে পবাভূত কবে' উজ্জয়িনী অধিকাব কবেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যেব অন্তর্ভুক্তির পব থেকে উজ্জয়িনী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ট কেন্দ্র রূপে পবিগনিত হয়।

না দেখিয়ে থাকে! অথচ দুষ্ট প্রকৃতির খৃষ্টানরা প্রকৃত সন্তদের কোনও সম্মানই দেখায় না।

সরঙ্গপুর ও সিরঞ্জ

উজ্জয়িনী ছেড়ে দুদিন চলার পর পশ্চিম প্রবাহিনী একটি নদী পার হয়ে সরঙ্গপুর পৌছন গেল (*)। এখানে প্রাদেশিক শাসনকর্তা বাস করেন। সরঙ্গপুরে তিন দিন থাকার পর আবার চলা। পথিমধ্যে পার্বতী নামক নদী পার হয়ে তিন দিন পরে পিপলাধর অতিক্রম করা হয়। কর্কটক্রান্তি রেখার উপর পিপলাধর অবস্থিত।

পিপলাধরের পর সিরঞ্জ নামের একটি নোংরা অস্বাস্থ্যকর শহরে পাদ্রী মিশন উপস্থিত হয়। এখানকার লোকজনও অত্যধিক কুসংস্কারপূর্ণ। নানা জাতীয় বিষাক্ত কীট পতঙ্গ, সজারু, গোঁসাপ ও বড়ো বড়ো গিরগিটি এখানে অজস্র দেখতে পাওয়া যায়। এক ধরনের গিরগিটি আছে যাদের চোখে দৃষ্টি পড়লেই মৃত্যু অবধারিত। এদের পেটের দিকটা উজ্জ্বল লাল রঙের; শরীরের অন্যান্য অংশ কমলা রঙের, ক্রমশঃ গাঢ় বাদামী রঙে শেষ হয়েছে। এর শরীরের রঙই সম্মোহনের কাজ করে; প্রাণী মাত্রই এর রঙ দেখে আকৃষ্ট হয়। লতাপাতা

---

* কালী সিন্ধ নদীর তীরে অবস্থিত অতি প্রাচীন এই শহর। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাজা সরঙ্গ সিং খিচিরের সময় এই শহরের বর্তমান নামকরণ হয়। মুসলিম আমলে রূপমতী ও রাজ বাহাদুরের বিখ্যাত প্রণয় কাহিনীর নায়িকা রূপমতীর কবর—'রূপমতীকা গম্বুজ' এখানের অন্যতম দ্রষ্টব্য পুরাকীর্তি।

ও ঝোপের আড়ালে এরা ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করে, অসতর্ক মানুষ যদি সামনে এসে যায় তবে তাঁর মরণ অনিবার্য। স্থানীয় লোকজন অত্যন্ত জোর দিয়েই একথা জানালো। চারদিকেই অসমতল পার্বত্য এলাকা; এই সব জায়গাই বিষাক্ত কীট, পতঙ্গ ও সরীসৃপের আস্তানা হয়ে থাকে।

নরওয়ার

এর পর তিনদিন কষ্টকর এবং বিপজ্জনক পথ চলার পর আমরা নরওয়ার (*) শহরে পৌঁছলাম। একটি পাহাড়ের সানুদেশে এই শহরটি অবস্থিত। পাহাড়ের শিরোদেশ সমতল ক'রে একটি দুর্গ তৈরী হয়েছে। এখানে খুব ঝড় বৃষ্টি হয়, কোনও বাড়ীর ছাদই অটুট থাকতে পারে না। ঈশ্বরই এই সমস্যার সমাধান করেছেন। চতুর্দিকে মার্বেল

---

* কিংবদন্তী এই যে মহাভারতোক্ত রাজা নল এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কানিংহাম মনে করেন যে ভবভূতির 'মালতী মাধব' নাটকে বর্ণিত প্রাচীন নৈষধের রাজধানী পদ্মাবতী বা নলপুরই হচ্ছে বর্তমান নরওয়ার (নৈষধপুর—নলপুর—নরওয়ার)। পর্যায়ক্রমে কচ্ছবাহ ও তোমর বংশের সময় নরওয়ারের বিশেষ উন্নতি হয়। মুসলিম আমলে নরওয়ার প্রসিদ্ধি লাভ করে। উইলিয়ম ফিঞ্চ নামক জনৈক ইয়োরোপীয় পর্যটক ১৬১০ খৃষ্টাব্দে এই নগরীর পরিধি 'প্রায় ছয় কোশ' ছিল বলে' বর্ণনা করেছেন। হিন্দু সংস্কৃতির কোনও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এখানে আবিষ্কৃত হয়নি। তবে দুর্গমধ্যস্থ এক কক্ষে মাটির নীচে থেকে পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রায় একশ' জৈন মূর্তি অক্ষত অবস্থায় পেয়েছিলেন।

পাথরের বড়ো বড়ো চাক প'ড়ে আছে ; সেই পাথর কেটে কুটে ঘষে মেঝেই বাড়ীর ছাদ বানানো হয়। পাদ্রী মিশন যে সময় নরওয়ারে ছিলেন, —১৫ ফেব্রুয়ারী নাগাদ, তখন রমজানের মাস শেষ হয়ে মুসলমানদের মহরম পর্ব শুরু হয়েছে। মহম্মদের কন্যা ফতিমার স্বামীর নাম আলী। এদের দুই ছেলে হাসান ও হুসেনের স্মৃতিতেই মহরম পালিত হয়। কিম্বদন্তী এই যে মাতামহের ধর্ম প্রচার কল্লে এরা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে পরাজিত হয়। অবিশ্বাসীরা (মুসলমানেরা আমাদের অবিশ্বাসী বলে মনে করে) তা'দের উপর নৃশংস অত্যাচার করে। জ্বলন্ত আঙ্গারের উপর দিয়ে তাদের খালি পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই কারণেই মুসলমানেরা নয় দিন উপবাস করে ; শুধু ডাল-জাতীয় খাদ্য খায়। এই নয় দিনের কোন একদিন একটি উঁচু মাচা তৈরী ক'রে তা'র সামনে সর্বসমক্ষে অশ্রু বর্ষণ করে ও শোকগাথা আবৃত্তি করে। মহরমের শেষ দিন শবদাহের উপযোগী চিতা তৈরী ক'রে মাচাগুলি একের পর এক পুড়িয়ে ফেলে এবং পা দিয়ে ভস্ম ইতস্ততঃ ছড়িয়ে দেয় এবং বিকট স্বরে 'হাসান হোসেন' বলে বিলাপ করতে থাকে।

একই সময় হিন্দুদের হোলি উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। এটাও কম বর্বরতা নয়। পনেরো দিন ধ'রে যাকে খুসী গায়ে ধুলা কাদা মাখাবার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। উৎসবকারীরা নিজেদের শরীরও কাদা মাখিয়ে রাখে। পিচ্‌কিরি দিয়ে লাল রঙ পরিচিত অপরিচিত সকলের গায়ে ছিটিয়ে দেয়। একপক্ষ কাল এই রকম বর্বরতার পর সর্বাপেক্ষা কুৎসিৎ একটা অনুষ্ঠান করা হয়। তাল গাছের

অনুরূপ একটা গাছকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ ক'রে তা'র চার পাশে শুক্‌নো ডাল পাতা জড়ো ক'রে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

গোয়ালিয়র

নরওয়ার ত্যাগ করার দুই দিন পর পাদ্রী মিশন গোয়ালিয়র (৭) পৌঁছয়। এখানে খাড়া পাহাড়ের শীর্ষদেশে খুব মজবুত একটি দুর্গ আছে, সেখানে আছে রাজপ্রাসাদ। শহরটি হ'চ্ছে পাহাড়ের পাদদেশে। দুর্গে প্রবেশ করার পথ একটি মাত্র। সেই পথের পাশে পাথরে তৈরী বিরাট একটি হস্তী মূর্তি আছে (*)। পাহাড়ের খাঁজে ও বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর নয়, এমন সব জায়গায় অনেক মন্দির ও বসত বাড়ী আছে। একটি জায়গায় মন্দিরের প্রাচীরে তেরোটি নগ্ন প্রস্তর মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। এই মূর্তিগুলি দেখে পাদ্রীরা খুব বিস্মিত হন। তাঁরা মনে করলেন যে তেরোটি মূর্তির মধ্যস্থলে যেটি তা' হ'চ্ছে যীশুর, ও দুই পাশে তাঁর দ্বাদশ শিষ্যের প্রতিমূর্তি (৮)। কিন্তু খৃষ্ট-অনুভূতিসূচক কোনও চিহ্ন বা প্রতীক এই মূর্তিগুলিতে ছিল না। এটা ঠিক নয় যে মুসলমানরা এই মূর্তিগুলি নির্মান ক'রে নি, কেননা,

---

* তোমর বংশীয় রাজা মানসিংহের সময় এই হস্তী ভাস্কর্যটি স্থাপিত হয়েছিল। হাতীর পিঠে মাহুত ও মানসিংহের (১৪৮৬—১৫১৬) মূর্তি ছিল। বাবুরের আত্মজীবনী ও আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে এই ভাস্কর্যটি থাকার জন্য দুর্গে প্রবেশ পথের নাম 'হাথিয়া পৌর' বা হাতী দরোয়াজা বলে' বর্ণিত হয়েছে।

তা'রা মূর্তি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং পারলেই তা' চূর্ণ করে ফেলে। আমি জানি যে তিন শতাব্দী আগে এখানে খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বী লোক বাস করতো। মুসলমানদের আক্রমণে তাঁ'রা পরাজিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জনসাধারণ ও কিছু সংখ্যক অপদার্থ লোকই সাধারণ মুসলমানদের ভেল্‌কি, ধোকাবাজী ও ফুশ্‌মন্তরে আবিষ্ট করে রেখেছে। কয়েক বৎসর আগে এখানে 'বাবা কাপুর' (*) নামক এক দুর্বৃত্ত আফিম-গোলা জলে তৈরী এক প্রকার পাণীয় ব্যবহারের রেওয়াজ চালু করে। এই উন্মাদ মনে করতো যে শরীর ও মনের ক্লেশ ভুলতে পারলেই অবিমিশ্র আনন্দ পাওয়া যায়। অফিম-মিশ্রিত পানীয় গলাধঃ-করণ করে' বাবা কাপুরের শিষ্যরা দুই হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে সারাদিন বুঁদ হয়ে থাক্‌তো। লোকটা নিজে সচ্চরিত্র ছিল। মৃত্যুর পর তা'র কবরের উপর শিষ্যরা এক জাকজমক পূর্ণ দরগা বানিয়ে দেয়। বাবা কাপুরের অনুরাগী অন্ততঃ ত্রিশজন লোক দিনরাত কবরটি পাহারা দেয়। কালক্রমে দরগাটি মুসলমানদের নিকট পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য হয়ে ওঠে। এখানে যা'রা ফুল ছড়াতে ও বাতী জ্বালিয়ে পুণ্য

---

* শেখ কিপ্‌পুর মজ্‌ঝুর বা বাবা কাপুর ছিলেন মুসলমান হোসেনী সম্প্রদায়ভুক্ত ফকীর। প্রথম জীবনে ছিলেন সৈন্য, পরে জনকল্যানে আত্মনিয়োগ করে' ফকীর অবস্থায় বাকী জীবন যাপন করেন। আবুল ফজল এঁকে 'বাবা গফুর' নামে অভিহিত করেন এবং সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি রূপে বর্ণনা করেছেন।

করতে যায়, তা'রাও আফিন-গোলা জলকে পবিত্র বলে মনে করে। দরগা থেকে ভক্তদের এই জল দেওয়া হয়।

গোয়ালিয়রের পর চম্বল নদী পার হয়ে পাদ্রীরা ঢোলপুর বা প্রাচীন ধবলপুর শহরে প্রবেশ করেন। চম্বল নদীই উত্তর মালব ও দিল্লী রাজ্যের সীমা নির্দেশ করে। ঢোলপুর থেকে আগ্রা এবং ফতেপুরসিক্রি সমদূরবর্তী। দুই শহরেই এখান থেকে দুই দিনে যাওয়া যায়। সাম্রাজ্যের রাজধানী আগ্রায়, কিন্তু সম্রাট থাকেন ফতেপুর সিক্রিতে। সম্রাটের প্রতিনিধিরা আমাদের ফতেপুরসিক্রির পথেই নিয়ে চললেন।

গোয়া থেকে পাদ্রীরা যতোই এগোচ্ছিলেন, ভৌগলিক পরিবেশও ততোই বদ্‌লে যাচ্ছিল। পাদ্রীরা লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁরা 'ক্রমাগতই একটু একটু ক'রে উঁচুতে উঠছিলেন। মনে হচ্ছিল যে সামনে দূরবর্তী বাড়ীঘর, মাঠ, পথ, বন সবই ঢালু পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। এক এক জনপদ ও গ্রাম আগেরটির চেয়ে উঁচুতে অবস্থিত। আর একটি বিষয় পাদ্রীরা লক্ষ্য করছিলেন যে ধর্মান্ধ মুসলমানরা অতি সুন্দর মন্দিরও ধ্বংস করেছে। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা পাথরের টুক্‌রোর উপর মনোরম ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন দেখেই পাদ্রীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তৎসত্ত্বেও এবং মুসলমান শাসকদের অমনোযোগিতার জন্যই, এইসব ভাঙ্গা মন্দিরে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ভীড় কম হয়না। প্রকাশ্যেই পশু বলি দেওয়া হচ্ছে। যেখানেই দেবদেবীর মূর্তির টুক্‌রোও প'ড়ে রয়েছে সেখানেই ফুল চন্দন ও ধূপশিখা দেখা যায়। হিন্দু মন্দিরের ভিত্তির উপর অনেক মন্দিরের চত্বরেই অনেক ছোট

ছোট মস্‌জিদ, ইদ্‌গা, ও কবর নির্মিত হয়েছে। দুষ্ট প্রকৃতির ও হীনচরিত্র লোকদের স্মারক হিসাবেই এইসব ইমারতের মূল্য। কুসংস্কার বশতঃই বাজে লোককেও সাধুসন্ত ব'লে মনে করা হয়। পাদ্রীরা এই বিষয়ে চিন্তা ক'রে অন্তরে করুণা অনুভব করলেন। পবিত্র সাধু সন্তকে ভক্তি না ক'রে অপদার্থ-দের শ্রদ্ধা দেখিয়ে যে নিজের আত্মাকেই বিনষ্ট করা হচ্ছে এই কথা ভেবে পাদ্রীরা বিমর্ষ হলেন (*)।

বাদ্‌শাহী দরবার

দূর থেকে ফতেপুর সিক্রির বাড়ী ঘর চোখে পড়তেই পাদ্রীরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপাসনা করলেন। প্রভূত বিপদ ও কষ্ট সহ্য করেও যে তাঁরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পেরেছেন এই জন্য তাঁরা পথের দুঃখ ও অসুবিধার কথা ভুলে গিয়ে আনন্দিত হলেন। নগরীর বিরাট আয়তন এবং সুরম্য প্রাসাদ ও গৃহাদি তাঁরা মুগ্ধ হয়ে দেখ্‌তে লাগলেন। পাদ্রীরা নগরীতে প্রবেশ করার পর থেকেই স্থানীয় লোকজন তাঁদের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছিল। পাদ্রীদের বেশ ভূষাই তাদের বিস্ময়ের কারণ ছিল। পাদ্রীদের লম্বা কালো গাউন, অদ্ভুত ধরনের টুপী, গোঁফ দাড়ি কামানো মুখমণ্ডল, নেড়া মাথা, —সবাই অপলক হয়ে দেখ্‌ছিল।

* আকবর বাদ্‌শাহ্‌ কোনও হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেছিলেন, ইতিহাস একথা বলে না। আকবরের পূর্বে যে সকল মুসলমান নরপতি হিন্দুমন্দির বিনষ্ট করতে উৎসাহী ছিলেন তাঁদের মধ্যে আলাউদ্দীন খিলজি, মালিক নায়েব থাপর, সিকান্দার লোদী এবং আকবরের পিতামহ বাবুরের নাম উল্লেখযোগ্য।

সম্রাটের দরবারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাদ্রীরা উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করলেন। সম্রাট একটি উঁচু বেদীর উপর সিংহাসনে ব'সে ছিলেন। পাদ্রীদের তিনি নিকটে আসতে বললেন। তাঁরা কাছে আসনে সম্রাট কুশল প্রশ্ন করলেন এবং শিষ্টাচারমূলক কয়েকটি কথা বললেন। গোয়ার আর্চ্‌বিশপ (প্রধান ধর্মযাজক) সম্রাটকে একটি ভূগোলক উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন; পাদ্রীরা সেইটি সম্রাটের হাতে তুলে দিলেন। তিনি সস্মিত ভাবেই উপহার গ্রহণ করলেন। পাদ্রীদের দেখ সম্রাট খুবই খুসী হয়েছেন বোঝাযাচ্ছিল, কিন্তু বাইরে তাঁর মনোভাব প্রকাশ পেলো না। দেখাচ্ছিল যেন নিরুত্তাপ; কথাবার্তাও বেশি বললেন না। সম্ভবতঃ নিজের পদ মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখেই মনের ভার প্রকাশে অত্যন্ত সংযত ছিলেন। সম্রাট একসময় হঠাৎ সিংহাসন থেকে উঠে দরবার ছেড়ে পার্শ্ববর্তী একটি কক্ষে প্রবেশ করলেন। কিছু সময় পরে পাদ্রীদেরও ঐ ঘরে ডাক পড়লো। এই কাম্‌রাটির নাম 'কাপুর তালাও'; অন্দরমহলের বেগমরাও যাতে পাদ্রীদের দেখতে পা'ন সেই উদ্দেশ্যেই সম্রাট পাদ্রীদের এই কাম্‌রায় আসতে বললেন। এরপর 'সম্রাট পাদ্রীদের নিয়ে একটি প্রাঙ্গণে আসেন। রাজপ্রাসাদেব এই অংশের নাম 'দৌলতখানা'। আলাপ আলোচনা করতে করতে সবাই যখন উঠানে পাইচারী করছিলেন, তখন হঠাৎ বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। সম্রাট সোনার কোমর বন্ধনী আঁটা ঘন লাল রঙের একটি পর্তুগীজ কোট গায়ে চাপালেন। তিনি তাঁর ছেলেদেরও একই ধরণেব কোট ও মাথায় পর্তুগীজ টুপী পরতে বললেন। আগন্তুকদের প্রীতি বর্ধনের উদ্দেশ্যেই

সম্রাট পর্তুগীজ পোষাক পরলেন, সন্দেহ নেই (*)। সম্রাট পাদ্রীদের আটশত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার আদেশ দিলেন। কিন্তু, পাদ্রীরা তা' নিতে অস্বীকার ক'রে জানালেন যে তারা অর্থ-প্রাপ্তি আশা ক'রে তাঁর নিকট আসেন নাই। বিশেষ অনুরোধ করার পরও যখন পাদ্রীরা স্বর্ণমুদ্রা নিলেন না, তখন সম্রাট পাদ্রীদের নির্লোভ আচরণ ও আত্মসংযমের জন্য বিস্ময় প্রকাশ করলেন। মোহরগুলি তিনি তখন পাদ্রীদের অনুচরদের মধ্যে বিতরণ ক'রে স্থানান্তরে গেলেন।

সম্রাটের সহৃদয় ব্যবহারে পাদ্রীরা খুব প্রীত হলেন। তাঁর যে খৃষ্টধর্মের প্রতি সবিশেষ অনুরাগ আছে, তৎসম্পর্কে আলোচনা করতে করতে তারাও তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট অবস্থানের দিকে চললেন।

বাংলাদেশ থেকে পর্তুগীজ শাসনকর্তা এবং ভিকার জেনারেল পেরেইরাকে সম্রাট আগেই রাজধানীতে আনিয়েছিলেন। পেরেইরা সেই সময় ফতেপুরসিক্রিতেই ছিলেন। এই সময় খৃষ্টানদের লেন্ট বা বার্ষিক পুণ্য সহভাগের (৯)

* আকবর পর্তুগিজদের সংস্পর্শে প্রথম আসেন ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে। আন্টোনিও কাব্রাল নামক জনৈক পর্তুগিজ স্বজাতির ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা আদায়ের জন্য আকবরের দরবারে এসেছিল। তার কাছেই উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত পর্তুগীজ পোষাক পরিধান করে সম্রাট পাদ্রীদের চমৎকৃত করেছিলেন।

কাল চলছিল। খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে সম্রাটের প্রকৃত মনোভাব জানতে চাইলে পেরেইরা বলেন যে তিনি যতোটা বুঝেছেন ও দেখেছেন তাতে তাঁর মনে হয়েছে যে সম্রাট সত্যিই খৃষ্ট এবং মাতা মেরীকে শ্রদ্ধা করেন। পেরেইরা একথাও বলেন যে সম্রাটের এই শ্রদ্ধাপ্রকাশ ভগবৎভক্তিরই সমতুল্য। তা' ছাড়া, বাইবেলের যে সব অংশ সম্রাটকে পড়ে শোনানো হয়, তা' তাঁর সপ্রশংস অনুমোদন পেয়েছে। পেরেইরা এও জানান যে তিনি যখন সম্রাটকে বলেন যে সংজীবন যাপনের অনুকূল নয় ব'লে একাধিক পত্নীগ্রহণ খৃষ্টীয় সমাজে অপরাধ ব'লে গণ্য হয়, তখন সম্রাট আশ্চর্য হয়েছিলেন। খৃষ্টীয় ত্রিত্ব বা 'ট্রিনিটি' বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে সম্রাট বলেছেন যে তাঁর বিচার-বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নয় বলেই 'ট্রিনিটির' (*) ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম হয়নি। একটি কুমারীর গর্ভে ঈশ্বর পুত্র

* ঈশ্বর হচ্ছেন স্বর্গস্থ পিতা। জগতের কল্যাণকল্পে তিনি তাঁ'র একমাত্র পুত্র যীশুকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। এক পবিত্র আত্মা সততই প্রতি মানুষের সঙ্গে রয়েছে। খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস এই ত্রিত্বের ভিত্তির উপর গ'ড়ে উঠেছে। পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা,—এই তিনই এক, ঈশ্বরই এই তিন রূপে স্বপ্রকাশিত। জীবনের প্রতি মুহূর্ত এই ত্রিত্ব-বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ সম্ভবপর। পবিত্র আত্মা জীবনকে সংপথে চালিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বদাই মানুষের সঙ্গে রয়েছে (হিন্দুর বিবেক-বোধ এই প্রসঙ্গে তুলনীয়)। যীশুর পবিত্র জীবন এবং অমেয় উপদেশ মানব-জীবনের পাথেয় রূপে গৃহীত ও অনুসৃত হলেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হবে। খৃষ্টীয় ত্রিত্ববোধ এই ধারণাই সৃষ্টি করেছে।

উৎপাদন করলেন, সেই পুত্র ক্রুশবিদ্ধ হলো এবং ইহুদীরা তা'কে হত্যা করলো ; —এই কাহিনী যদি প্রকৃতই ঈশ্বর ব'লে থাকেন তাহলে সম্রাট তা' মেনে নিতে পারেন। খৃষ্টের অলৌকিক কাহিনী সম্রাট মনোযোগ সহকারে শুনেছেন ; কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন নি যে তিন ব্যক্তি কি ক'রে এক হতে পারে, অথবা ঈশ্বর কি ক'রে একই সময় তিন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। ক্রুশবিদ্ধ ও নিহত যীশু কি ক'রে কবর থেকে বেরিয়ে এলেন, কেনই বা তিনি কুমারী মায়ের পেটে জন্ম নিলেন, —এইসব প্রশ্ন সম্রাটের নিকট অবোধ্য ও হেঁয়ালী ব'লে মনে হয়। সম্রাট অবশ্য খৃষ্টের অলৌকিক কাহিনী সাগ্রহেই শুনেছেন। তাঁর খানা কামরায় মাতা মেরী, মুসা ও মহম্মদের প্রতিকৃতি (১০) টানানো আছে। ভিকার জেনারেলের বর্ণনা শুনে পাদ্রীরা সম্রাটকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার উৎকৃষ্ট কোনও পন্থা উদ্‌ভাবন করা যায় কিনা চিন্তা করতে লাগলেন।

যেশুইট মিশনের আগে এইগিদিউস্ নামক এক পাদ্রী আকবরকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু দোভাষীর অভাবে ধর্মসংক্রান্ত গভীর আলোচনা ব্যাহত হয়। খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্য তা'কে জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করার উশ্‌কানিও মোল্লারা দিয়েছিল।

আকবর গুজরাট বিজয় ক'রে প্রত্যাবর্তনের সময় আকবর আগ্রার অনতিদূরে, —এখন যেখানে ফতেপুরসিক্রি সেখানে তাঁবু ফেলেছিলেন। তখনই তিনি এই নগরের পরিকল্পনা করেন। বিন্ধ্য গিরিমালার উত্তর-পশ্চিমে এই স্থানটির অবস্থিতি। পশ্চিমে এক'শ মাইল দূরে আজমির।

জায়গাটা পার্বত্য এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যও সুন্দর নয়।

বিগত নয় বছরের মধ্যেই ফতেপুরসিক্রি গ'ড়ে উঠেছে। চার দিকেই এর পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী অর্থব্যয়ে নগরীকে সুন্দর ক'রে তোলা হয়েছে। বহু অভিজাত ও গণ্যমান্য নাগরিক এখানে নিজেদের বাড়ী তৈরী করেছিলেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হোল সম্রাটের দরবার। বিরাট আয়তনের এই কক্ষের বারান্দায় দাঁড়ালে সমগ্র নগরী দেখা যায়। তারপর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দরবার কক্ষের সুউচ্চ খিলানের উপর অর্ধগোলাকৃতি ছাদ এবং চারদিক প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তৃতীয়তঃ, প্রাসাদের পাশেই উণ্মুক্ত একটি বিশাল চত্বর, সেখানে পশুর লড়াই, মানুষে-পশুতে লড়াই, হাতির খেলা ও অন্যান্য খেলা, ভোজবাজী ও আমোদ ক্রীড়া হয়। এক রকম খেলার নাম 'পলো' (*)। ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে খেলোয়াড়েরা লম্বা হাতলযুক্ত কাঠের হাতুড়ি দিয়ে একটি কাঠের বল ইতস্ততঃ চালিত ক'রে থাকে। চতুর্থত:,—সম্রাট পরিবারের ব্যবহার্য ছায়ামণ্ডিত স্নানাগার। পঞ্চমতঃ—উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফতেপুরসিক্রির বাজার; আধ মাইলেরও বেশি জায়গা জুড়ে এই বাজার। এখানে পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্য পণ্য, বাণিজ্যিক দ্রব্য ও বিলাস সামগ্রি পাওয়া যায়; সর্বদাই বাজারে ক্রেতার ভীড়।

নগরীর প্রয়োজনীয় পানীয় জল সরবরাহের জন্য দুই

---

* আকবরের সময়ই পলো খেলার উৎপত্তি ও প্রচলন হয়। শাহ্জাদাদের পক্ষে পলো খেলা একটি আবশ্যিক ক্রীড়া হিসাবেই পরিগণিত হয়েছিল।

মাইল লম্বা ও আধ মাইল চওড়া একটি জলাশয় প্রচুর অর্থ-ব্যয় ও পরিশ্রমে তৈরী হয়েছে। সম্রাট আকবরের পরিকল্পনায় ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই বিরাট দীঘি কাটা হয়েছিল। শহরের নিকটে অনেকটা নীচু জমি আছে; সেই জায়গা ঘিরে সুদৃঢ় মাটি ও পাথরের বাঁধ দিয়ে এই দীঘি তৈরী হয়। বর্ষার সময় পাহাড়িয়া এলাকার ঢালু গা বেয়ে বৃষ্টির জল এসে দীঘিতে জমা হয় এবং সারা বছর ধ'রে নগরবাসীর প্রয়োজন মেটায়। বিস্তৃত জলাশয় পাশে থাকায় শহরের তাপমাত্রাও বেশি হয় না। সম্রাট এবং আমীর ওম্‌রাহরা দীঘির প্রশস্ত বাঁধের উপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন।

ফতেপুরসিক্রিকে বেষ্টন ক'রে এক উঁচু প্রাচীর আছে। চার দিকে চারটি দরওয়াজা। পূব দিকের দরওয়াজার নাম আগ্রা দরওয়াজা, পশ্চিম দিকেরটির নাম আজ্‌মিরি, দক্ষিণেরটির নাম ঢোলপুর, উত্তর দিকেরটির নাম খেলা দরওয়াজা। শেষোক্ত দরওয়াজা দিয়েই সম্রাট ক্রীড়াভূমিতে প্রবেশ করে থাকেন। এই দরওয়াজার দুই পাশে দুইটি পূর্ণাবয়ব হস্তী মূর্তির ভাস্কর্য আছে।

সম্রাট প্রথমে আগ্রায় থাকতেন। সেলিম চিস্তি (*)

---

* সেলিম চিস্তি ছিলেন ফকীর। জনবিরল মরুভূমি সদৃশ ফতেপুর-সিক্রিতে এঁকে ১৫৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম দেখা যায়। নিজামুদ্দীন লিখেছেন, "আগ্রা শাহরের পশ্চিমে বারো ক্রোশ দূরে সেলিম চিস্তি থাকতেন। সম্রাট আকবরের একটি পুত্র সন্তান হবে, তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করলে সম্রাট হর্ষোৎফুল্ল হ'ন, এবং তাঁর

নামক একজন দার্শনিকের উপদেশ অনুযায়ী তিনি রাজধানী আগ্রা থেকে ফতেপুরসিক্রিতে স্থানান্তরিত করেন।

আগ্রা

আগ্রা একটি সুন্দর, বিস্তৃত পরিসর প্রাচীন শহর (১১)। যমুনার তীরবর্তী এই শহরেই সম্রাট জালালুদ্দীন আকবরের জন্ম হয় এবং বাল্যকালও এখানেই অতিবাহিত হয়। এই শহরেই তাঁর পিতার আকস্মিক মৃত্যু হয় এবং এখানেই আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন (*)। পিতা হুমায়ুন সবিশেষ বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাদর করতেন। পক্ষান্তরে, আকবর কোনদিন লেখাপড়া শেখেন নি। সম্রাট হয়েই তিনি দিল্লী থেকে আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তরিত

জনৈক। মহিষী অন্তঃসত্বা হলে তা'কে সঙ্গে নিয়ে ফকীরের নিকট যান এবং মহিষীকে চিস্তি সাহেবের হেফাজতে রেখে আসেন। এই মহিষী হচ্ছেন অম্বরের বিহারী মলের কন্যা, সম্রাটের প্রাসাদের সর্বময় কর্তা রাজা ভগবান দাশের ভগিনী—মরিয়ম্—উজ্—জমানী।" ফকীরের কুটিরেই মরিয়ম বেগমের এক পুত্র সন্তান হয় ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখে। ফকীরের নামানুসারেই ছেলের নামকরণ হোল সেলিম। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে সেলিম চিস্তির মৃত্যু হয়। ফতেপুরসিক্রিতে তাঁ'র সমাধি অদ্যাবধি বিদ্যমান।

* হুমায়ুনের মৃত্যু হয় ২৭শে জানুয়ারী ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে,—দিল্লীতে, আগ্রাতে নয়। দিল্লীর দুর্গে শের শাহ্‌র নির্মিত 'শের মহল' অংশে হুমায়ুনের লাইব্রেরী ছিল। বাড়ীর ছাদে ওঠার সময় পড়ে' গিয়ে হুমায়ুন গুরুতর আঘাত পান, ঐ আঘাতের ফলেই

করেন। দিল্লীতেই প্রাচীনকালে খৃষ্টান সম্রাটদের রাজধানী ছিল (১২)। আকবরই প্রথম সম্রাট যিনি দিল্লী থেকে রাজধানী অন্যত্র সরিয়ে নেন। আগ্রার প্রাসাদ অতি মনোরম লাল রঙের পাথরে নির্মিত, প্রত্যেকটি পাথরের চাক সমান আকারের হওয়ার ফলে সমগ্র প্রাসাদই নয়নাভিরাম হয়েছে। পাথরের চাকগুলি পরস্পরের সঙ্গে এত দক্ষতায় সন্নিবদ্ধ হয়েছে যে জোড়া লাগার রেখা চোখেই পড়ে না। প্রাসাদের প্রধান প্রবেশ দ্বারের দুই পাশে দুইটি রাজার মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। শোনা যায় যে সম্রাট আকবর এই দুই রাজাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের হাতে বন্দুকের গুলী দিয়ে হত্যা করেছিলেন (*)।

সম্রাটের সুবিবেচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে আগ্রা শহর। নিকটের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে তাপমাত্রা নীচু। এখানের মাটি উর্বরা, সামনেই প্রসিদ্ধ যমুনা নদী। প্রত্যেকটি বাড়ীর সামনে সুন্দর বাগান। সব মিলে আগ্রার সৌন্দর্যকে বিশ্ববিখ্যাত করেছে। শহরের আয়তন লম্বায় চার মাইল

তাঁর মৃত্যু হয়। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরের অন্তর্গত কালানৌর দুর্গে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেরুয়ারী আকবরের রাজ্যাভিষেক হয়। হুমায়ুনের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পরেই অর্থাৎ রাজ্যাভিষেকের তিন দিন আগেই অভিষেকের কথা দিল্লীতে ঘোষণা করা হয়। দুইটি বিষয়েই মোন্‌সারেট ভুল তথ্য দিয়েছেন।

* ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে আকবর চিতোর অবরোধ করেন। আপন প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে রাণা উদয়সিং পলায়ন করে; দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব পরে বেদ্‌নরের জায়গীরদার জয়মল রাঠোরের উপর। জয়মল এবং তা'র ষোল বছর বয়স্ক বালক পুত্র পোত্তা অসম বিক্রমে মুঘলদের বাধা দেয়। আকবরের বন্দুকের গুলীতে পিতাপুত্র উভয়ের মৃত্যু হয়।

চওড়ায় দুই মাইল। মানুষের প্রয়োজনের ও আরাম উপভোগের যাবতীয় দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়। ইয়োরোপের দূরতম প্রান্ত থেকেও বাণিজ্য সম্ভার এখানে আমদানী হয়। কামার, স্যাঁকরা ও অন্যান্য শ্রেণীর কারিগরের সংখ্যা এখানে অগুনতি। আগ্রায় কখনই খাদ্যাভাব হয় না। সাম্রাজ্যের ঠিক কেন্দ্র-স্থলে আগ্রার অবস্থিতি ব'লে সম্রাটের পক্ষে রাজ্যের সর্বত্র কর্মচারী ও সৈন্য প্রেরণ করা সহজসাধ্য। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও লোকজনের পক্ষে রাজধানীতে আসা যাওয়া কম সময়েই হতে পারে।

এ সব হ'লেও কী হবে! মানুষ ভাবে এক হয় অন্য রকম। আগ্রার প্রাসাদ যখন সম্পূর্ণ হোল, তখন সম্রাট আকবর সপরিবারে এখানে বাস করতে এলেন। কিন্তু দেখা গেলো ভূতের উপদ্রব। অশরীরি ভূত এখানে ওখানে চলাফেরা করে, এটা ওটা ভাঙ্গে, শিশু ও স্ত্রীলোকদের ভয় দেখায়, ঢেলা ছুঁড়ে মারে। শেষ পর্যন্ত প্রাসাদের সকলেরই কিছু না কিছু ক্ষতি হতে লাগ্‌লো। শয়তানের কাণ্ডকারখানা এই সবেই নিবদ্ধ থাকলে সহ্য করা যেত, কিন্তু দেখা গেল

পোত্তার মা ও বালিকা স্ত্রীও কম বীরত্ব দেখায় নি। পুরুষরা নিহত হলে অন্যান্য পুরস্ত্রীর সঙ্গে এঁরাও জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেয়। জয়মল ও পোত্তার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আকবর তাদের হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় মর্মর মূর্তি বানিয়ে আগ্রা দুর্গের প্রবেশ দ্বারের পাশে স্থাপিত করেছিলেন। মূর্তি দুটি বর্তমানে দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। বার্ণিয়ার এই মূর্তি দুইটির সবিশেষ প্রশংসা করেছেন।

সম্রাটের সন্তানদেরও রেহাই দেওয়া হচ্ছে না ; ছটি সন্তান জন্মের দুই এক দিনের মধ্যেই ভূতের উপদ্রবে মারা গেল। শোকার্ত সম্রাট অপুত্রক অবস্থায়ই মারা যাবেন এই রকম আশঙ্কা ক'রে তিনি ফতেপুরসিক্রির পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে নির্জনে মনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। পূর্বোক্ত দার্শনিক ফকীর সেলিম চিস্তির সঙ্গে এখানেই সম্রাটের পরিচয় হয় এবং তাঁর পরামর্শে ফতেপুরসিক্রিতে নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়।

ধর্মালোচনা

সম্রাটেব সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর পাদ্রীরা তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে বিশ্রাম করলেন। পথযাত্রার ক্লান্তি খানিকটা লাঘব হলে তাঁ'রা আবার সম্রাট সকাশে উপস্থিত হলেন। এবার পাদ্রীরা সম্রাটকে পবিত্র ধর্মপুস্তক বাইবেল উপহার দিলেন। চারটি ভাষায় লিখিত এই ধর্মপুস্তক সাত খণ্ডে বাঁধাই ছিল। রাজসভার উপস্থিত যাবতীয় আমীর ওম্‌রাহদের সমক্ষেই সম্রাট ভক্তিভরে বাইবেল গ্রহণ করলেন এবং মাথায় ঠেকিয়ে ও চুম্বন ক'রে ধর্মগ্রন্থেব প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন। তিনি জানতে চাইলেন প্রভু যীশুর বাণী কোন্ খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ অংশটি দেখিয়ে দিলে তিনি পুনরায় ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। এর পর সম্রাট পাদ্রীদের নিয়ে পৃথক একটি কক্ষে প্রবেশ করলেন। এই কক্ষে কয়েকটি আলমারী ছিল ; বাদ্‌শাহ্‌র লাইব্রেরী এটি। বাইবেলের প্রতি আবার ভক্তি প্রদর্শন ক'রে তিনি গ্রন্থটি একটি সুদৃশ্য আলমারীতে সাজিয়ে রাখলেন।

এরপর প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাদ্রীদের সঙ্গে সম্রাটের ধর্মালোচনা হ'তে থাক্‌লো। খৃষ্টীয় এবং মুসলিম ধর্মের তুলনামূলক আলোচনাই হোত। মুসা এবং অন্যান্য ধর্মগুরুদের দ্বারা কীর্তিত পবিত্র বাইবেলের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে পাদ্রীরা সম্রাটকে প্রচুর তথ্য ও তত্ব জানাতে লাগলেন। বাইবেলের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে মুসা এবং আরও অনেক ধর্মনেতা সাক্ষ্য দিয়েছেন, কিন্তু মুস্‌লিম ধর্মগ্রন্থের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে কয়টা লোক বলতে পেরেছে? পাদ্রীরা সম্রাটকে এই প্রশ্ন করলেন। মহম্মদ যে ভোজ ও উৎসবাদির নির্দেশ দিয়েছেন, বাইবেলের নির্দেশের সঙ্গে তাঁ'র কোনও সামঞ্জস্য নেই, সুতরাং পাদ্রীদের মতে তা' বর্জনীয়। মুসা ও অন্যান্য অবতারের উপদেশ সমন্বিত ধর্মগ্রন্থগুলি অতিপ্রাচীন। কোরাণে এমন কোনও কথা নেই যা' থেকে প্রমাণিত হতে পারে যে খৃষ্টীয় ধর্মগুলি অভ্রান্ত নয়। কোরাণে এই কথা লেখা আছে যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর খৃষ্টকে ধর্মপুস্তক দিয়েছিলেন, যেমন তিনি দিয়েছিলেন মুসাকে 'তোরা', ডেভিডকে 'জাবুর' (*), মহম্মদকে কোরাণ। এটা লক্ষণীয় যে কোরাণের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে কেউ কিছু বলে নি। এই সব কথা শুনে সম্রাট খুবই বিচলিত হলেন মনে হলো। পাদ্রীরা তা' বুঝতে পেরে সেদিন আর কিছু বললেন না।

আলোচনার শেষে সম্রাট পাদ্রীদের একান্তে বললেন, "আপনাদের বক্তব্য খুব ভালোভাবেই বলেছেন। আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনাদের ধর্মগ্রন্থের কথা শুনে আমার ভালোই লেগেছে। কিন্তু একথাও বলবো আপনারা কথাবার্তা ও

---

* Psalms

ব্যবহারে যেন সতর্ক থাকেন, কারণ আপনাদের যা'রা বিরুদ্ধবাদী তা'রা প্রত্যেকেই এক একটি দুরাত্মা। যাক সে কথা। এখন আমি একটি প্রশ্ন করবো : পরম শক্তিমান ঈশ্বর কিরূপে একাধারে তিন, আবার এক হ'তে পারেন। কি করেই বা কুমারীর গর্ভে তাঁ'র পুত্র জন্মাতে পারে ?" সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে পাদ্রীরা বললেন, "আমরা মুস্‌লিম মোল্লা—মৌলভীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবো। প্রাণভয়েই যে সতর্ক থাকবো, তা নয় ; আপনার পরামর্শ মেনে নিয়েই আমরা সতর্ক থাকবো। কারণ, আমরা আপনাকে মান্য করি। আপনি যে অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন, যে প্রশ্ন আপনাকে ভাবিয়ে তুলেছে, তা'র সমাধান পেতে হ'লে আপনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, তিনিই আপনাকে আলোক দেখাবেন।"

বাইবেল একাধিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও কোন পরস্পর বিরোধী উক্তি নেই। একই সত্য বিভিন্ন ভাষার বর্ণিত হয়েছে। সেন্ট বার্ণার্ড কৃত কোরাণের লাতিন অনুবাদ পাদ্রীরা উত্তম রূপেই পড়েছেন। এই জন্য মোল্লা-মৌলবীরা কোরাণ বিষয়ক আলোচনায় পাদ্রীদের পরাস্ত করতে পারতো না। এর ফলে তাঁ'রা আরও ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ত। পাদ্রীরা সকলেই একই ধারায় তাঁদের বক্তব্য রাখতেন, কিন্তু মুসলমান ধর্মযাজকরা সকলে একমত হয়ে তর্ক করতেন না, একই বিষয়ের ব্যাখ্যা যাঁ'র যেমন খুশী করতেন। সম্রাট এতে খুবই অসন্তুষ্ট হতেন।

উপরোক্ত আলোচনার তিন দিন পরে আবার বৈঠক বসলো। স্বর্গীয় সুখ বলতে, মহম্মদের উক্তি স্বরূপ উত্তম খানা-পিনা এবং অপবিত্র আমোদকেই বোঝায়। পক্ষান্তরে,

বাইবেলে ঠিক এর উলটো কথাই লেখা হয়েছে। পাদ্রীদের কথার কোনও প্রতিবাদই মোল্লারা করতে পারলেন না।।

দিন কয়েক পরে তৃতীয় অধিবেশন হোল। মহম্মদের গর্বান্ধ আত্মম্ভরিতা নিয়েই এই আলোচনা হয়। কোরাণে মহম্মদ লিখেছেন যে খৃষ্ট সৎ ছিলেন এবং তাঁ'র কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল না। পবিত্র আত্মার ঔরসে কুমারী মাতার গর্ভে তিনি জন্মেছিলেন এবং পৃথিবীর নশ্বর মানুষ কেহ তাঁ'র পিতা ন'ন। অপর পক্ষে মহম্মদ নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি পাপ করেছেন এবং মূর্তি পূজা করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে তিনি কোনও দিন কোনও অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারেন নি। তথাপি তিনি লজ্জাহীন ঔদ্ধত্যে নিজেকে খৃষ্টের তুলনায় মহত্তর এবং অধিক ক্ষমতাশালী ব'লে প্রচার করেছেন। পাদ্রীরা বললেন যে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে যিনি নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে থাকেন, তাঁ'কে নিশ্চয়ই নির্লজ্জ ও হাস্যকর রূপে আখ্যাত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, অবতার ও প্রসিদ্ধ সজ্জন ব্যক্তিরা যীশুর আবির্ভাব সম্পর্কে পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ধর্মপুস্তকে যীশুর অলৌকিক কাহিনী তাঁ'র সদ্‌গুণ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে ; এই সব কথা যীশু লেখেন নি। পক্ষান্তরে কোরাণের জোড়াতালি দিয়েছিলেন মহম্মদ নিজেই। মহম্মদ নিজেই নিজের সম্পর্কে একমাত্র সাক্ষী, তাঁর ক্রিয়াকর্মের একমাত্র ভাষ্যকার। তিনি অদ্বিতীয়। মুসলমান যাজকরা বড়োই অসুবিধা বোধ করলেন। তাঁ'রা ধর্মগ্রন্থের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটা প্রস্তাব করলেন। তাঁরা বললেন, 'বেশ, পরীক্ষা করে দেখা যাক কোন্ ধর্মগ্রন্থ সত্য। আগুন জ্বালানো হোক। সেই আগুনে পাদ্রীরা ওঁদের

বাইবেল হাতে নিয়ে প্রবেশ করুন এবং আমাদেরও একজন কোরাণ হাতে নিয়ে সে রকম করুক। যে ধর্মগ্রন্থ ও তা'র বাহক অদগ্ধ অবস্থায় আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে তাকেই সত্য ব'লে স্বীকার করে নেওয়া হবে (১৩) সম্রাটও মোল্লাদের এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। কিন্তু পাদ্রীরা বিনয় সহকারে জানালেন যে খৃষ্টধর্মের সত্যতা ও বাইবেলের অভ্রান্ততা প্রমাণের জন্য তাঁরা ঐরূপ পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক ন'ন। রুডল্‌ফ্‌ বললেন, "সম্রাট, আমার এবং আমার সহগামীদের খৃষ্টধর্মে ঐকান্তিকার পরীক্ষা করতে চান। যীশুখৃষ্টের ভগবদ্‌ বিশ্বাস ও তাঁ'র প্রচারিত ধর্ম আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, জন্ম থেকেই মাতৃস্তনের সঙ্গে সেই অমেয় সুধারস পান করেছি, ঐ ধর্মেই আমাদের অস্তিত্ব সংস্থাপিত। উৎফুল্ল ভাবেই আমরা জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করতে প্রস্তুত; শুধু একটিতে নয়, সহস্র চিতার আগুনও আমাদের ভয়ের কারণ হবে না। জ্বলন্ত আগুন থেকে ঈশ্বরই তিনটি হিব্রু শিশুকে রক্ষা করেছিলেন। স্বর্গীয় সহায়তায় ও করুণায় আমরা অক্ষত অবস্থাতেই বেরিয়ে আসতে পারব আমরা হাতি, সিংহ, বাঘ, বেত্রাঘাত, ক্রুশ বা কোনও প্রকার দৈহিক নির্যাতনকেই ভয় করি না। সম্রাট, আপনি এই মুহূর্তেই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আমরা সত্য কথা বলছি কি না। কিন্তু আপনি যদি কোনও অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার অভিলাষ ক'রে থাকেন, যদি ভেবে থাকেন যে ঈশ্বর আমাদের প্রিয় জ্ঞান ক'রে আমাদের অক্ষত রাখবেন, —আমরা স্বীকার করছি যে অন্যান্য অনেক বিষয়ে আমদের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। ধর্ম বিষয়ে আমাদের অনেক

গোঁড়ামী আছে। আমরা জানিনা ঈশ্বর প্রকৃতই আমাদের প্রিয় জ্ঞান করেন, না কি তাঁর পথের কঁাটা ব'লে আমাদের মনে করেন। সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে, বাইবেল ঈশ্বরের নিকটই প্রাপ্ত কিনা, বাইবেল হাতে নিয়ে যে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করলো —তাঁ'র পু'ড়ে যাওয়া না যাওয়ার উপর বাইবেলের স্বর্গীয়তা, শ্রেষ্ঠতা ও অভ্রান্ততা নির্ভর করে, —এই ধরণের মনোভাব ও পরীক্ষা খৃষ্টের জীবনী ও বাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করার পর হেরড্ বলেছিল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে ক্রুশকাঠ থেকে নেমে এসো। যদি তা' পারো তবেই আমরা তোমার কথা মেনে নেবো।' প্রভু একথায় কর্ণপাত করেন নি। অনেক সাধু সন্ত, আমাদের চেয়ে অনেক মহৎ, তাঁরাও আগুনে প্রবেশ ক'রে বেঁচে থাকতে পারেন নি। অনেক বাড়ী-ঘর, বাইবেল থাকা সত্ত্বেও, পুড়ে ছাই হয়েছে। মুসলমানদের অনেক মস্‌জিদ্‌ও তা'দের ধর্মগ্রন্থ সমেত পু'ড়ে বিনষ্ট হয়েছে। অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা ধর্ম বা ধর্মপুস্তকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হতে পারে না। আপনি যদি বলেন, আমরা অবশ্যই খৃষ্টধর্মের প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করতে রাজী আছি। কিন্তু, সম্রাট, মোল্লারাও যদি অনুরূপ অগ্নিপরীক্ষা দিতে চা'ন, আপনি তাঁ'দের প্রতিনিবৃত্ত করুন। এটা আমাদের অনুরোধ। ওঁরা ম্যাজিক ও অলৌকিক ঘটনার উপরই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। চল্লিশ বছর আগে আন্দ্রিয়া স্পোলাটেনুস্ নামক একজন ফ্রান্সিস্কান পাদ্রীকে মরক্কোর মুসলমানরা জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়ে তাঁ'র ধর্মীয় বিশ্বাসের পরীক্ষা নিয়েছিল। তা'রা দেখলো যে আন্দ্রিয়া অগ্নিশিখা পরিবেষ্টিত হয়ে

আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে পায়চারি করছেন! এই দেখে বন্দী অন্যান্য খৃষ্টানরা আনন্দে করতালি দিতে লাগলো। তখন উপস্থিত মুসলমান ও ইহুদীরা ইট পাথর ছুঁড়ে আন্দ্রিয়াকে মেরে ফেল্‌ল, পাছে পাদ্রীর শরীর আগুনে না পোড়ে!"

সম্রাট রুডল্‌ফের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। বললেন, "খোদা হাফিজ্, আমি অগ্নিপরীক্ষার জন্য আপনাদের ডেকে আনিনি। তবে, আমার দরবারে কুতুবদ্দীন নামে একজন মৌলানা (*) আছেন। তিনি কোরাণের একভাষ্য লিখেছেন। বহুবিধ দুষ্কার্যের প্ররোচক এই লোকটা। আমি তা'কে সমুচিত শিক্ষা দিতে চাই। এই বিষয়ে আমি আপনাদের সাহায্য প্রার্থী।

রুডল্‌ফ্ বললেন, "আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে কোনও সহায়তাই করতে পারবো না। সম্রাট, আপনার আদেশে কারও মৃত্যুদণ্ড বা অন্য কোনও শাস্তি হবে, আমরা ধর্মযাজক হয়ে তা'তে কোনও প্রকারে জড়িত হতে পারিনে (†)।"

---

* অগ্নিপরীক্ষার অজুহাতে পাদ্রীদের পুড়িয়ে মারার চক্রান্তের মূলে ছিল শেখ্ কুতুবুদ্দীন নামক জনৈক মোল্লা। তিনি কোরাণের একটি ভাষ্য লিখেছিলেন। অত্যন্ত ধর্মান্ধ এবং আকবরের উদার ধর্মীয় নীতির উগ্র বিরোধী ছিলেন। ঐতিহাসিক বদায়ুনী আকবরের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, তিনিও কুতুবুদ্দীনকে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁ'কে অসৎ এবং ভড়ংবাজ আখ্যা দিয়েছেন।

† পর্তুগীজদের বর্বরতার কাহিনী পর্তুগীজরাই লিখে গিয়েছে।

সম্রাট বললেন, "আমি চাই না যে আপনারা অগ্নি-পরীক্ষা দিন। আমি শুধু চাই যে আপনারা রাজী আছেন এই কথা বলবেন।"

"না আমরা তাতেও রাজী নই।" রুডল্ফ্ জানালেন।

"অন্ততঃ এইটুকু রাজী হ'ন: আমি ঘোষণা করবো যে আপনারা চিতায় উঠবেন, তখন আপনারা কোন প্রতিবাদ না ক'রে নীরব থাকবেন।"—সম্রাট বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে রুডল্ফ উত্তর দিলেন, "আপনি যদি এই কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, আমরাও প্রকাশ্যে সবাইকে শুনিয়ে বলবো যে না এতে আমরা রাজী নই। সম্রাট, আপনি যদি এই লোকটাকে শাস্তি দিতে চান তবে এই ছলনার প্রয়োজন কী!"

সম্রাটের সঙ্গে যে ক'জন সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বাসভাজন অনুচর ছিলেন তাঁ'রা রুডল্ফের সাহসিক সবল উক্তি শুনে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্লেন।

সম্রাট ও তাঁ'র ধর্মযাজকদের প্রাথমিক অধিবেশন

বর্বরতায় পর্তুগীজ জাবজ, বর্ণসংকর ও ধার্মিক অভিজাত এবং ধর্মযাজকে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। আরব সাগরে হজযাত্রী স্ত্রীলোকের হাতের কব্জি কেটে চুড়ি বালা প্রভৃতি অলংকার ছিনিয়ে নেওয়া কোঙ্কন ও গুজরাট উপকূলে স্ত্রীলোকদের স্তন কেটে দেওয়া, মালাক্কা ও দূরপ্রাচ্যে মানুষকে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে শিকারী কুকুর লেলিয়ে দেওয়া প্রভৃতি কর্মে পর্তুগীজ মাত্রেই যে পারদর্শী ছিল —তা' বিভিন্ন পর্তুগীজ লেখকের কথা উদ্ধৃত করেছেন ঐতিহাসিক হোয়াইটওয়ে।

কয়টি এইভাবে সমাপ্ত হোল।

সম্রাট আকবরের সঙ্গে পাদ্রীদের ধর্মালোচনা মাঝপথে থেমে রইল। সম্রাট তর্কবিতর্ক পছন্দ করেন না, পাদ্রীরা তা ভুলতে পারেন নি। সম্ভবতঃ সভাসদদের খুসী করার উদ্দেশ্যেই ঐ কথা বলেছিলেন। সম্রাটের দরবারের আমীর ও আমাত্যগণ ধর্মালোচনায় যোগ দিতে চাইতেন না। সেইজন্য সম্রাটের প্রকৃত মনোভাব বুঝবার উদ্দেশ্যে পাদ্রীরা নিম্নবর্ণিত প্রসঙ্গ তাঁ'র নিকট উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন ঃ—

"খৃষ্টধর্মের তাৎপর্য সম্যক্ রূপে জানতে হলে দুইটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। খৃষ্টও প্রায়ই নিজেকে পরীক্ষা করে নিতেন, যেন ঈশ্বরের করুণায় আপ্লুত হওয়ার উপযোগী অবস্থা বজায় থাকে। পাপ যাতে স্পর্শ করতে না পারে সেই দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়! খৃষ্ট সবাইকে কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা করতে বলেছিলেন। পাপই মানুষকে চঞ্চল ক'রে তোলে; তাই পাপকে মনের গভীর তলদেশ থেকে উন্মুল ক'রে ফেলতে হয়। যখন মানুষ গৃহ নির্মাণ করে, তখন যেমন গভীর ভীত কেটে আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে হয়, মনের পাপও তেমনই নিশ্চিহ্ন ক'রে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। তা' না করতে পারলে ঈশ্বর কেন করুণা করবেন? পরিষ্কার পোষাক পরার আগে যেমন পরিহিত ময়লা জামা খুলে ফেলতে হয়। এও তেমনই।"

"সম্রাট, আরও শুনুন। প্রত্যেকেই যেন একটি বিবাহিত

পত্নী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। যা'কে বিবাহ করা হয়, সেই একমাত্র স্ত্রী ছাড়া অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গ করা ব্যভিচার। প্রথমতঃ, অতীতে কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা; দ্বিতীয়তঃ, উপপত্নীদের ত্যাগ করা; তৃতীয়তঃ, উপবাস, অনুতাপ; প্রার্থনা দান এবং অন্যান্য সৎকাজে নিয়োজিত হওয়া;—ঈশ্বরের অনুকম্পা পেতে হ'লে এই সব করা দরকার।

"সৎভাবে কিছুদিন চলার পর এবং যে সব সৎকাজের উল্লেখ করা হোল তা' মেনে চলার পর একটি নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে, কোনও তর্ক বা প্রশ্ন না ক'রে শ্রদ্ধাবনত ছাত্রের মতো আমাদের উপদেশ শুনবেন। যে কথা ভালো ক'রে বুঝতে পারবেন না, জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নেবেন। একটি উপাখ্যান আছে যে রাস্তায় বীজ ছড়ালে তা' পাখীরা খেয়ে ফেলে। এখানে রাস্তা বলতে হৃদয়কে বোঝানো হয়েছে। যা' হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না, তা' ব্যর্থ হতে বাধ্য। পাপরূপ পাখীরা সদুপদেশের বীজ সর্বদাই বিনষ্ট করে ফেলে। নির্মল অন্তঃকরণেই ঈশ্বর-সমীপ্যে যাওয়া চলে।"

রুডল্‌ফ্ সম্রাটের নিকট এই কথাগুলি বলার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই সুযোগ পাওয়া গেল। পাদ্রীরা আকবরের নিকট গেলে তিনি তাঁদের গোপনে জানালেন যে তাঁরা ইচ্ছা করলে গীর্জা স্থাপন করতে পরেন (*),

---

* উপাসনার জন্য পাদ্রীরা তাঁদের বসবাসের একটি কক্ষকে সম্রাটের অনুমতিক্রমে chapel বা উপাসনাগৃহে পরিবর্তিত করেছিল। কিন্তু আকবর অখৃষ্টানকে ধর্মান্তরিত করার অনুমতি সহজে দেন নি। অনেক বাধা ও আপত্তির পর ১৬০২ খৃষ্টাব্দে এই

এবং খৃষ্টানরা সেখানে নিরুপদ্রবে নিজেদের ধর্মানুযায়ী আচার অনুষ্ঠান করতে পারে। রুডল্‌ফ্ ভেবে দেখলেন যে সুযোগ পাওয়া গিয়েছে বটে, কিন্তু এখনই তা'র বক্তব্য পেশ করা ঠিক হবে না। দুদিন পরে সম্রাটকে একান্তে পাওয়া গেল। রুডল্‌ফ্ এই কয়দিন ধ'রে সম্রাটকে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে সব বক্তব্য প্রস্তুত করেছিলেন, তা' বললেন। এই উপদেশের কি প্রতিক্রিয়া হয়, সম্রাট কি করবেন, সে বিষয়ে জানাবার

অনুমতি দেওয়া হয় (J A.S.B Vol. LXV, 86)। বার্নিয়ারের বর্ণনায় জানতে পারি তাঁ'র সময় আগ্রায় ২৫।৩০ টা খৃষ্টান পরিবার ছিল। একটি গীর্জা ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে মীর্জা জুলকার্নিন নামক একজন ওমরাহ লাহোরের গভর্ণর ছিলেন, আর্মেনিয়ান মাতা ও খৃষ্টান পিতার পুত্র জুলকার্নিন যেশুইট্ পাদ্রীদের পৃষ্ঠাপোষক ছিলেন। এই পাদ্রীরা নিয়মিত ভাবে নানাবিধ মূল্যবান সংবাদ গোয়াতে পাঠাতেন। জাহাঙ্গীরও খৃষ্টধর্ম এবং ইয়োরোপীয় পোষাকের অনুরাগী ছিলেন। দুই ভাগ্নেকে খৃষ্টান হ'তে অনুমতি দিয়েছিলেন। একবার দরবার শুদ্ধ সবারই জন্য ইয়োরোপীয় পোষাক দরজীদের দিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন, অবশ্য প্রবল বিরোধিতার জন্য তা' ব্যবহৃত হয় নি। পাদ্রী দা' আকোষ্টা বাইবেল হাতে নিয়ে অগ্নিপরীক্ষা দিতে আগ্রহী হ'লে জাহাঙ্গীর মোল্লাদের কাউকে অনুরূপ পরীক্ষার জন্য না পেয়ে বিরক্ত হয়েছিলেন। শাহ্‌জাহানের সময় থেকেই পাদ্রীদের দুঃসময় দেখা দেয়। মমতাজ মহলের দুই কন্যা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, এতে ক্রুদ্ধা হয়ে মমতাজ সম্রাটকে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে সফল হয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব আগ্রা এবং লাহোরের গীর্জা ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করেছিলেন।

জন্য রুডল্‌ফ্‌ অনুরোধ করলেন। দেশময় একটা রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি না ক'রে এবং নিজের জীবন বিপন্ন না ক'রে সম্রাট কিরূপে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে পারেন তা' ভেবে স্থির করতে বললেন। আকবর খৃষ্টান হতে অভিলাষী হয়েছিলেন, কিন্তু তা'র ফলে শত্রুরা যাতে বিপদ ঘটাতে না পারে সে দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রতিপক্ষের প্রবল চাপে প'ড়ে সম্রাটের যাতে মতি পরিবর্তন করতে না হয় সে রকম একটা পন্থা গ্রহণ যে নিতান্ত বিধেয়, একথা সম্রাটও ভাবছিলেন। একটি ইমারৎ তৈরী করতে গিয়ে মাঝপথে কাজ বন্ধ করা অথবা যুদ্ধের উদ্যোগ ক'রে হঠাৎ পিছিয়ে আসা যেমন সমূহ ক্ষতির কারণ হয়, সম্রাটের পক্ষে ধর্মান্তরিত হতে গিয়ে মত বদ্‌লানোও প্রায় তেমনই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। যদি ধর্মান্তর গ্রহণের প্রতিবাদে কেউ সম্রাটকে হত্যা করে, তা' হলে সম্রাটের বংশ লোপ পাবে এবং সাম্রাজ্যও ধ্বংস হয়ে যাবে।

সম্রাট পাদ্রীর কথা নীরবে মন দিয়ে শুনলেন। তারপর সংক্ষেপে বললেন, "সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। যারা প্রকৃতই সত্যানুসন্ধানী, ঈশ্বরই তাদের পথ দেখিয়ে দেন। আমার নিজের কোন ঐহিক কামনা নেই। স্ত্রী পুত্র এমনকি সাম্রাজ্যকেও আমি মূল্য দিই না। যদি দেশময় গোলোযোগের সৃষ্টি না ক'রে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তা'হলে একটা কাজ করা যেতে পারে। আমি মক্কা যাওয়ার নাম ক'রে গোয়ায় গিয়ে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হতে পারি।"

পাদ্রীরা এই কথা শুনে বিশেষ উৎসাহ বোধ করলেন। ইষ্টার পর্বের সময় তাঁরা সম্রাটের নিকট গিয়ে খৃষ্টীয় রীতি

অনুযায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানালেন। সম্রাট পাদ্রীদের কাছে ইষ্টারের মর্ম জানতে চাইলেন। প্রাসাদের অভ্যন্তরেই পাদ্রীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন, যা'তে সম্রাটের পক্ষে সাধারণের অগোচরে পাদ্রীদের বাসস্থানে গিয়ে রাত্রি পর্যন্ত তাঁদের সাহচার্য ও ধর্মোপদেশ পেতে পারেন। ইষ্টারের রাত্রিতে দীর্ঘকাল ধ'রে কেন প্রার্থনা করতে হয়এবং এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য এবং নিয়মই বা কি, তা' জানতে চাইলেন। রুডল্‌ফ গভীর আগ্রহভরে সম্রাটকে ইষ্টারের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয় সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলেন। পরের দিন সম্রাট নিজের খানাটেবিল থেকে পাদ্রীদের জন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য পাঠিয়ে দিলেন। সকালবেলা পাদ্রীরা তাঁদের বাসকক্ষে সম্রাট আবার একাকী পেলেন। তিনি সোজা পাদ্রীদের 'চ্যাপেল' কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কক্ষে প্রবেশ করার আগে মাথা থেকে উষ্ণীস খুলে তাঁ'র দীর্ঘ কেশরাশি ছড়িয়ে দিলেন এবং মাতা মেরী ও যীশু খৃষ্টের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে ঘরেব মেঝেতে লুটিয়ে পড়-লেন। তারপর চললো আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়েগভীর আলোচনা।

এর এক সপ্তাহ পরে সম্রাট তাঁ'র তিন পুত্র (*) এবং কয়েকজন বিশিষ্ট অমাত্যকে প্রার্থনা গৃহ দেখাতে নিয়ে এলেন। প্রার্থনা গৃহে প্রবেশের আগে সকলকেই পায়ের জুতো খুলে বাইরে রেখে আসতে বললেন। মাতা মেরী ও খৃষ্টের প্রতিকৃতির দিকে সসম্মানে তাকাবার জন্য পুত্রদের আদেশ করলেন। অমাত্যদের একজন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'সিংহাসনে যে অপরূপা সুন্দরী মহিলা উপবিষ্টা আছেন, তিনি

---

* সেলিম, মুরাদ ও ড্যানিয়েল।

নিশ্চয়ই স্বর্গের রাণী।' মাতা মেরীর একটি ক্ষুদ্র আলেখ্য সম্রাটকে উপহার দেওয়া হ'লে তিনি খুব খুশী হ'য়ে হাত পেতে নিলেন। সম্রাটকে উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পাদ্রীরা মেরীর ছবিটি রোম থেকে আনিয়েছিলেন।

আকবরের ব্যবহারে পাদ্রীরা যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব করলেন। একটা নতুন প্রীতিকর মানসিক উত্তেজনা তাঁ'রা পেলেন। ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করলেন যেন তাঁদের অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সফল হয়। তাঁদের উদ্দেশ্য সফল করতে হলে সম্রাটের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান ও কথাবার্তা আরও সহজ হওয়া দরকার। দোভাষীর মাধ্যমে তা' হতে পারে না। পাদ্রীরা ফার্সী শেখার সংকল্প করলেন এবং একজন শিক্ষকের জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করলেন। রাজদরবারে এবং অন্যত্রও ফার্সী ভাষা বুঝতে না পারলে চলে না। সম্রাট পাদ্রীদের ফার্সী শেখাবার জন্য একজন অল্পবয়স্ক শিক্ষককে নিযুক্ত করলেন (*)। এঁর শিক্ষকতার গুণে রুডল্‌ফ্ অল্পকালের মধ্যেই ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়ে উঠলেন। পাদ্রীরা খুব কম সময়েই ফার্সীভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছেন দেখে সম্রাটের সভাসদরা চমৎকৃত হলেন। ফার্সী খুব সুন্দর ভাষা, দর্শন ও ধর্মবিষয়ক আলোচনা ও লেখাপড়ার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। পাদ্রীমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন ফ্রান্সিস্ হেনরিকুয়েজ্ ; তিনি ছিলেন জাতিতে পারসিক, অর্মুজ্ শহরের অধিবাসী। ইস্‌লাম থেকে ধর্মান্তরিত

---

* পাদ্রীদের ফার্সী শেখাবার জন্য যাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন ইতিহাস বিখ্যাত আবুল ফজল। তখন তাঁ'র বয়স ত্রিশ বছর।

হয়ে তিনি খৃষ্টান হয়েছিলেন। দীর্ঘকাল অনভ্যাসের ফলে তিনি মাতৃভাষা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনিও নবোদ্যমে ফার্সী শিখলেন। রুডল্‌ফের ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ সকলের প্রশংসা অর্জন করলো এই কারণে যে তিনি বিদেশী এবং ফার্সী ভাষার সঙ্গে তাঁর কোনদিনই পরিচয় ছিলনা। তাঁর ফার্সী উচ্চারণে যে বিদেশী ভঙ্গি প্রকাশ পেতো, তা'ও সকলেই বেশ খুসী হয়ে উপভোগ করতো। ফার্সী ভাষা আয়ত্ত হওয়ার পর পাদ্রীরা এই ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করতে শুরু করলেন। বাইবেল থেকে বাছাই ক'রে কয়েকটি অনুচ্ছেদ তাঁ'রা প্রথমেই অনুবাদ করলেন; মুসলমান মোল্লা-মৌলবীরা প্রধানতঃ এইসব অংশের বিষয় নিয়েই তর্ক ক'রে থাকেন। পাদ্রীরা সেইসব অংশের অনুবাদ ও তৎসহ নিজেদের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য সংযোজিত ক'রে সম্রাটের হাতে তুলে দিলেন। তাঁ'রা আকবরকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি অবসর সময় ঐ অংশগুলি পাঠ ক'রে বাইবেলের পবিত্র ভাবরাশি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং ধর্মান্ধ মোল্লারা যখন বাইবেলের বিরুদ্ধতা করবে তখন যেন তা'দের নিরস্ত করতে পারেন (*)।

---

* এই পাদ্রীরা কি রকম অনুবাদ করেছিল তা' আমরা জানিনে। তবে, ফার্সীতে বাইবেলের অনুবাদ তাঁ'রাই প্রথম করেন নি। **Bagstar** প্রণীত **Bible in Every Land** গ্রন্থ এই সূত্রে দ্রষ্টব্য। ৮২৮ খৃষ্টাব্দে জনৈক ইহুদী কর্তৃক বাইবেলের প্রথম ফার্সী অনুবাদ হয়েছিল। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে তা' কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লে মুদ্রিত হয়। পাদ্রী মিশনের অনুবাদ আকবরের মনঃপূত হয় নি; কেননা, তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের জন্য গোয়াতে অনুরোধ করে-ছিলেন। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার্সের জনৈক আত্মীয় জেরোম্‌জেভিয়ার

মুসলমান উলেমাদের সঙ্গে পাদ্রীদের প্রায়ই ধর্মীয় আলোচনা হোত। খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ব, ঈশ্বরের প্রেরিত পুত্র যিনি ঈশ্বরত্ব লাভ করেছিলেন, তাঁ'র মৃত্যু, মহম্মদ, কোরাণ, শেষ বিচারের দিন, যীশুর কবর থেকে উত্থান এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও দার্শনিক বিষয় সমূহই ধর্মালোচনা ও তর্কের উপাদান ছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে পাদ্রীরা বাইবেল হাতে নিয়ে জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ ক'রে ধর্মপুস্তকের মাহাত্ম্য প্রমাণ করুন, — মোল্লারা অবিরত এই দাবী করতেন। এই দাবীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পাদ্রীদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা। কারণ, তর্কে যা'দের পরাস্ত করা যায় না, তা'দের বধ করতে পারলেই তো আপদ চুকে যায় (*)। মহম্মদ ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হ'তে শিষ্য ও অনুগামীদের নিষেধ করেছিলেন।

এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে জনৈক আর্মেনিয়ান জেরোম জেভিয়ারকে ফার্সী সংস্করণ বাইবেলের কপি অনুবাদ কার্যের সহায়ক হবে ব'লে দিয়েছিলেন। জেরোম অনুবাদের সঙ্গে খৃষ্টের জীবনী, খৃষ্টীয় কিম্বদন্তী, উপাখ্যান প্রভৃতিও সংযোজিত করেন। অবিশ্বাস্য এবং ছেলেমানুষী গল্প Fables সমন্বিত এই অনুবাদ ১৬০২ খৃষ্টাব্দে আকবরকে উপহার দেওয়া হয়। এই সব আজগুবী গল্প শুনে আকবর কৌতুক অনুভব করেছিলেন। শোনা যায়, নাদির শাহ্ও বাইবেলের একটি কপি উপহার পেয়ে এবং তাঁ'কে তা' পড়ে শোনানো হলে প্রচুর হেসেছিলেন। জেরোম জেভিয়ার যদি নিজের পাণ্ডিত্য না দেখিয়ে বাইবেলের যথাযথ অনুবাদ করতেন তা' হলে হয়তো আকবর বাইবেলকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন না।

* শঙ্করাচার্য লাঠিয়াল অনুচর নিয়ে ভারতের তৎকালীন পণ্ডিত

মুসলমানদের ক্রোধের আরও একটি কারণ ছিল : পাদ্রীরা তর্কের সময় যথাসম্ভব কোরাণের উধৃতি দিয়েই নিজেদের বক্তব্য ও মতবাদ প্রতিষ্টা করতেন। নিজেদের অস্ত্রেই পরাভূত হতেন, তাই ধর্মান্ধ মোল্লাদের ক্রুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কী উপায় ছিল। সম্রাটের সভাসদদের মধ্যে শ্রেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন আবুল ফজল ; পাদ্রীদের তিনি ফার্সী শেখাতেন। তিনি মোটেই ধর্মান্ধ ছিলেন না। তিনি সর্বদাই পাদ্রীদের পক্ষ সমর্থন করতেন। পাদ্রীবা কোবাণ থেকে যে সব উধৃতি দিতেন, প্রকৃতই তা' কোরাণে আছে কি না, এনিয়ে মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠত। মোল্লা মৌলবীদের প্রতিবাদ ও প্রশ্ন শেষ হওয়া পর্যন্ত আবুল ফজল (১৪) নিঃশব্দে অপেক্ষা করতেন।, কা'রও প্রশ্ন ও প্রতিবাদে বাধা দিতেন না। আবুল ফজল লক্ষ্য করেছিলেন যে ধর্মালোচনার আগে পাদ্রীরা কোরাণ ও বাইবেল খুব ভালো করেই অধ্যয়ন ক'রে আসতেন। পাদ্রীদের উধৃতিতে কোন ভুল থাকতো না। এ সত্য আবুল ফজলের অজ্ঞাত ছিল না।

আকবর নিজেই পাদ্রীদের পক্ষ নিতেন। সুযোগ পেলেই তিনি সর্বসমক্ষে পাদ্রীদের পাণ্ডিত্য ও ধর্মজ্ঞানের প্রসংশা করতেন। এক এক সময় পাদ্রীরা এতে লজ্জিত হতেন। ঐহিক বিষয়ে পাদ্রীদের উদাসীনতা এবং আন্তরিকতা ও শুচিবোধ সম্রাটকে সবিশেষ আকৃষ্ট করেছিল।

সমাজকে পবাস্ত করেছিলেন। ওরিষ্যায় পুরীর অদূবে দয়া নদীর তীরে বৈষ্ণব পণ্ডিতদের তিনি 'তর্কযুদ্ধে' এমন পরাজিত কবেন যে তা'দেব প্রাণহীন দেহ চিতায় ভস্মীভূত করতে হয়েছিল।

তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন যে পার্থিব ভোগসুখ বর্জন ক'রে ঈশ্বরের আরাধনাতেই জীবন কাটিয়ে দিতে তাঁ'র খুবই ইচ্ছা। ঐহিক ভোগসুখ, স্ত্রী ও সন্তান এবং বিত্ত বৈভব ত্যাগ ক'রে যে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারে, ঈশ্বর তা'কে করুণা করেন। সম্রাট নিজেই এই কথা বলেছেন। পাদ্রীদের উপর তাঁ'র শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এতটা গভীর হয়েছিল যে তাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের গৃহশিক্ষকরূপে পাদ্রীদের নিযুক্ত করলেন (*)। এর আগে মুরাদ আবুল ফজলের কাছে পড়াশুনা করতো। পাদ্রীদের সততায় সম্রাট এতটা বিশ্বাস করতেন যে তাঁ'রা যাতে দীন দরিদ্রদের যথেচ্ছ দান করতে পারেন তজ্জন্য তাঁদের হাতে প্রচুর মুদ্রা দেওয়ার জন্য খাজাঞ্চীকে আদেশ দিয়েছিলেন। পাদ্রীরা খুসী হয়েই মুরাদের শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু রাজকোষ বা অন্য কারও থেকে টাকাকড়ি নিতেন না। সামান্য খাদ্য ও অল্প কয়েকটি জামাকাপড় ছাড়া অন্য কিছুই পাদ্রীরা সম্রাটের নিকট গ্রহণ করেন নি। যেশুইট পাদ্রীদের প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে মানুষকে শিক্ষার আলোক দেওয়া। পাদ্রীরা মুরাদ এবং সম্রাটের নির্বাচিত আরও কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে নিয়মিত ক্লাস করতেন। প্রত্যেক দিন ক্লাস শুরু হওয়ার আগে মাতা মেরী ও যীশুর নাম ভক্তিভরে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করা হোত। তারপর নিজ নিজ কপালে আঙুল দিয়ে ক্রশ্ চিহ্ন দিয়ে খৃষ্টের প্রতিকৃতিকে প্রণাম করা হোত।

---

* আইন-ই-আকবরীতে লেখা আছে যে মুরাদকে খৃষ্টধর্ম বিষয়ে জ্ঞান-লাভের উদ্দেশ্যে আকবর তাঁ'কে পাদ্রীদের নিকট পড়াশুনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন।

মুরাদেব জন্ম হয় ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুন তারিখে। ফতেপুরসিক্রির পার্বত্য অঞ্চলে জন্ম হয়েছিল বলে তা'কে 'পাহাড়ী' ব'লে ডাকা হয়। মুরাদের গৃহশিক্ষক আগে ছিলেন ফৈজী। তারপর আবুল ফজল। মুরাদের যখন দশ বছর বয়স তখন তা'কে পাদ্রীদেব হাতে দেওয়া হোল। মুরাদ খুব মেধাবী ছিল। পাদ্রীদের শিক্ষকতার গুণে সে অল্পকালের ভিতরই বেশ উন্নতি দেখাতে পারলো। তিন মাসের মধ্যেই তা'র হাতের লেখা শিক্ষকের মতোই হোল। সম্রাট প্রত্যহ মুরাদের কাছে দিনের পড়া জিজ্ঞাসা করতেন, সেও গড়্গড়্ ক'রে তা' আবৃত্তি করতো। সম্রাট যদিও ছেলেদের প্রতি খুবই স্নেহশীল ছিলেন, তথাপি, সামান্য ত্রুটি বেয়াদপী ও অপরাধ ক্ষমা করতেন না; চড চাপড় ও অন্যান্য দৈহিক শাস্তি দিতে দ্বিধা করতেন না। পাদ্রীদেরও বলতেন যেন ছেলেদের প্রয়োজন বোধেই মারধোর করেন। কিন্তু পর্তুগীজদের রীতি হচ্ছে এই যে একমাত্র পিতামাতা ব্যতীত অন্য কেহ রাজপুত্রদের গায়ে হাত তুলতে পারে না। পাদ্রীরাও মুরাদ ও তা'র ভাইদের এবং অন্যান্য শিক্ষার্থী বালকদের কাউকে কখনও কোন শারীরিক শাস্তি দেন নি। ফলে, রাজপুত্ররা পাদ্রীদের সঙ্গে বিশেষ সম্ভ্রম ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতো।

খৃষ্টিয় উপদেশ সম্বলিত একটি পুস্তিকা থেকে খৃষ্টধর্মের তত্ব সরলভাবে শেখানো হোত। তাদের একটি খাতায় তা' লেখা থাকতো। মুরাদ খুব বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিল, তাঁর ব্যবহারও ছিল প্রশংসনীয়। সব দিক দিয়ে বিচার ক'রে দেখলে তা'কে যেকোনও ইয়োরোপীয় রাজপুত্রের তুলনায় নীচু স্তরের বলা যায় না। শিক্ষকদের প্রতি বিনয়ী, —এক

এক সময় দেখা যেত সে শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তরে চোখ তুলে কথা বলতো না। তিন মাসের মধ্যেই সে লিখতে পড়তে শিখলো। তা'র হাতের লেখা সুন্দর হোল। পড়া-শুনায় তা'র উন্নতি দেখে সম্রাট খুব খুসী হলেন। পিতার নিকট উৎসাহ পেয়ে সে আরও বেশি মনোযোগী হয়ে উঠলো।

আগেই লিখেছি, মুসলমান উলেমাদের শ্রেষ্ঠ ছিলেন শাহ আবুল ফজল। সম্রাটের প্রধান মন্ত্রীও ছিলেন তিনি। পাদ্রীদের সঙ্গে তিনি খুব ভদ্র ব্যবহার করতেন। পাদ্রীদের প্রতি সম্রাটের সহৃদয়তার অন্যতম কারণ যে আবুল ফজলের পাদ্রীদের প্রতি অনুকূল মনোভাব, তা'তে সন্দেহ নেই। তাঁ'র পিতার নাম শেখ মুবারক (*)। ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ভগবৎ চিন্তায় তিনি প্রায় সবক্ষণ অতিবাহিত করতেন। ধর্মান্ধ মোল্লাদের মতো কোরাণ ও মহম্মদের কথা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করতেন না। তাঁ'র প্রত্যেকটি ছেলেই পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। তিনি প্রকাশ্যেই স্বীকার করতেন যে কোরাণে অনেক পরস্পর বিরোধী এবং অধর্মীয় উক্তি আছে। খৃষ্টধর্মে তাঁ'র সহানুভূতি লক্ষ্য ক'রে পাদ্রীরা চমৎকৃত হ'ন। তিনিও সম্রাটের ন্যায়ই বাইবেল হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে ও চুম্বন ক'রে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। সম্রাটের নিকট একান্তে পাদ্রীদের পক্ষ নিয়ে তিনি অনেক কথা বলতেন। পাদ্রীরা প্রতি শনিবার (১৫) মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন (†)।

---

* ১৫০৩—৯৩।

† শেখ, সৈয়দ, উলেমা ও আমীর,—এই চার শ্রেণীর মুসলমানই আকবরের সাপ্তাহিক ধর্মসভায় যোগ দিতেন। ইবাদৎখানায়

সম্রাট জালালুদ্দীন আকবরও সেই সব আলোচনায় যোগ দিতেন (১৬)। বাংলাদেশের সুবাদার মুজাফ্ফর খাঁ তুরবতী বিদ্রোহী পাঠানদের হাতে বন্দী হয়ে নির্যাতনে নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে সম্রাট কিছুদিন ধর্মালোচনায় নিয়মিত আসতেন না। তিনি শীঘ্রই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন, রাজধানীতে এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল; ধর্মালোচনায় নিয়মিত যোগদান স্থগিত রাখার এও একটা কারণ ছিল। এতে পাদ্রীদের কিছুটা সুবিধা হোল; তাঁ'রা বাইবেল ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করার সময় বেশি ক'রে পেলেন। সম্রাট এই অনুবাদ মুসলমান পণ্ডিতদের সমক্ষে পড়ে' শোনাতে বলতেন। এর ফলে ঈশ্বরের প্রেরিত পুত্র যীশু সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ বেশি পাওয়া গেল। তাঁ'র আবির্ভাব ও মানবজন্ম গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়ে পাদ্রীরা বিশদ আলোচনা করতেন। এই আলোচনায় আবুল ফজল সবিশেষ প্রভাবান্বিত হ'ন। প্রভু যীশুর নরদেহ ধারণের উদ্দেশ্য ও জন্মকালীন দৈব লক্ষণসমূহ তিনি এমন প্রাঞ্জল ভাবে বর্ণনা করতে পারতেন যে পাদ্রীরা খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। প্রভু যীশুর মৃত্যুর বর্ণনা শুনে মুসলমানদের অনেকেই এমন অভিভূত হয়ে পড়তো যে বলার নয়। এঁরাও আবুল ফজলের মতোই প্রভু যীশুর হত্যার কাহিনী হুবহু পুনরুক্তি করতে পারতেন। কিন্তু, প্রভুর আন্তরিকতা, মানব-প্রেম ও দয়াগুণের দ্বারা যে তাঁ'রা অভিভূত হয়েছিলেন, তা' বলা যায় না। তবে, আবুল ফজল বলতেন যে পাদ্রীদের

প্রতি বৃহস্পতিবার যে ধর্মসভা বসতো, এই আলোচনাচক্র সে'টি নয়। শনিবারের বৈঠক ছিল শুধু খৃষ্টের জীবনী ও বাণী সম্পর্কে।

উপাসনা কক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই তাঁর মন একেবারেই শান্ত হয়ে যেত।

পাদ্রীদের প্রতি সম্রাটের অসামান্য অনুরাগই উভয় পক্ষের মধ্যে ঘন ঘন সাক্ষাতের অন্তরায় হয়েছিল। দরবারের অনেকেই পাদ্রীদের সঙ্গে সম্রাটের অন্তরঙ্গতা পছন্দ করতো না। সম্রাটও তা' জানতেন। তিনি ইচ্ছা করেই পাদ্রীদের সঙ্গে দেখাশোনা কমিয়ে দিয়েছিলেন। পাদ্রীরা তাঁদের বাসস্থান সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করলেন। প্রাসাদ-প্রাচীরের বাইরে লাগোয়া একটি বাড়ী ছিল; পাদ্রীরা এই বাড়ীতে উঠলেন। এই বাড়ীতে সম্রাটের পরিবারস্থ সকলের প্রয়োজনীয় আতর, গন্ধদ্রব্য ও প্রসাধন সামগ্রী রাখা হোত। পাদ্রীদের ব্যবহারের জন্য এই বাড়ীতে কৌচ প্রভৃতির ব্যবস্থা হোল। বড়দিন সমাগত হ'লে যীশুর জন্মকালীন পরিবেশের দৃশ্যাবলীর অনুকরণে প্রার্থনা কক্ষটি সাজানো হোল। কয়েকজন অন্তরঙ্গ আমাত্যকে নিয়ে আকবর বড়দিনের পূর্বদিন সন্ধ্যাব সময় প্রার্থনা কক্ষে প্রবেশ করলেন। যীশুর জন্মকালীন পরিবেশেব বর্ণনা যেরূপ শুনেছিলেন, তা' চাক্ষুষ ক'রে তিনি খুবই প্রীতি লাভ করলেন। প্রত্যেকটি দ্রব্য তিনি ছুঁয়ে ছুঁয়ে তারিফ করলেন।

উপস্থিত সকলেব খুশ্ মেজাজের সুযোগ নিয়ে রুডল্ফ কোরাণে উল্লিখিত দুইটি পরস্পর বিরোধী উক্তির সুসম্মত ব্যাখ্যার জন্য উলেমাদের অনুরোধ করলেন। একটি উক্তি হচ্ছে যে খৃষ্টকে ইহুদীরা সত্য সত্যই বধ করে নি; অপর বয়ানটিতে বলা হয়েছে যে যীশুর আবির্ভাব, তিরোধান ও পুনরুত্থানে ঈশ্বরের করুণা প্রকট, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সে সব

সম্ভবিত হয়েছে। পাদ্রীরা বললেন, তা' সমস্যা দাঁড়ায়ঃ যীশুকে যদি বধ করাই হয় নি, তবে তাঁ'র মৃত্যুর কথা উঠ্‌লো কেন? যদি তাঁ'র মৃত্যুই না হয়ে থাকে তবে পুনরুত্থান হলো কী ক'রে? পুনরুত্থান যদি না হয়েই থাকে তা'হলে ঈশ্বরের উক্তি মিথ্যা ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। আর যদি স্বীকার করা হয় যে যীশু কবর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, তা'হ'লে নিশ্চয়ই কিছু সময় তিনি মৃত ছিলেন। যীশুর মৃত্যু হয়েছিল এই কথা মেনে নিলে কোরাণের উক্তির সঙ্গতি হয় না। কারণ, একটি বয়ানে তাঁ'র মৃত্যু হয়েছিল বলা হয়েছে, অপর এক বয়ানে তা'র বিপরীত কথা লেখা হয়েছে। তা' হ'লে বলতে হয় যে মহম্মদের উক্তি ব'লে কোরাণে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা' মিথ্যা; স্বীকার করতে হয় যে যীশুকে নয়, অন্য কাউকে হত্যা করা হয়েছিল। এই পরস্পর বিরোধী উক্তি যিনি করেছেন, তাঁকে পয়গম্বর বলা যায় না।

মোল্লা-মৌলবীরা রুডল্‌ফের যুক্তির কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না। অল্‌কোরাণ ও তা'র অনেক ব্যাখ্যা পূর্ণ পুঁথি ঘেঁটেও রুডল্‌ফের যুক্তি খণ্ডনের কোনও উপায় বের করতে পারলেন না। উপরন্তু কোরাণের অংশ বিশেষ উল্লেখ ক'রে রুডল্‌ফ্ মোল্লাদের মুখের উপরই বললেন যে অস্বাভাবিক ও ঘৃণা এক আচরণের অনুমতি এতে দেওয়া হয়েছে। কেতাব খুলে দেখা গেল যে রুডল্‌ফের অভিযোগ সত্য। মুসলমানরা লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌লেন। অনেকেই এই বয়েত পাঠ ক'রে আশ্চর্য হলেন; কেহ বললেন যে কোরাণের উল্লিখিত বিষয়ের পর্যালোচনা করা অনাবশ্যক। রুডল্‌ফ বললেন যে উল্লিখিত অংশটিকে ভাষার মারপ্যাঁচ বলে মনে করার কোনই হেতু নাই, কারণ

যে অস্বাভাবিক কর্মের নির্দেশ দেওয়া আছে, তা' সরল বাক্যেই লেখা হয়েছে। "এই কামান্ধতা যেখানে ধর্মীয় প্রশ্রয় পায় সেখানে প্রকৃত শান্তি সম্ভব হতে পারে না।" এই কথা ব'লে রুডল্‌ফ তাঁ'র সেদিনের বক্তব্য শেষ করলেন।

ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় সম্রাট তাঁ'র ছেলেদের প্রার্থনা কক্ষের উৎসব সজ্জা দেখতে পাঠিয়েছিলেন।

পাদ্রীরা তাঁদের চ্যাপেলে' মাতা মেরীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মূর্তিটির সৌন্দর্য-খ্যাতি অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলমান ও হিন্দু, উভয় ধর্মেরই লোক দলে দলে এসে মূর্তিটি দেখতো, এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতো। খৃষ্টানদের মধ্যে যাঁ'রা ইয়োরোপে যেশুইট ধর্মমতের বিরোধীতা করতো, তা'দের চেয়ে এই মুসলমান ও হিন্দু দর্শকরা অনেক উন্নত ছিল : এরা মাতা মেরীর মূর্তির সামনে আকাশে বাহু প্রসারিত ক'রে প্রার্থনার ভঙ্গিতে সম্ভ্রম প্রকাশ করতো।

আকবর পাদ্রীদের জ্ঞান ও বিচক্ষণতার জন্য বিশেষ সমীহ করতেন। পাছে তাঁ'র সমীহবোধের গুরুত্ব না থাকে, সেই উদ্দেশ্যে পাদ্রীরা সম্রাটের দোষ ত্রুটিরও উল্লেখ ক'রে তাঁ'কে সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত করার চেষ্টা করতেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সম্রাটের দীর্ঘসূত্রিতার সমালোচনা করতে পাদ্রীরা কখনই দ্বিধা করতেন না। অবশ্য সম্রাটের মনের অবস্থা বুঝেই যতোটা সম্ভব সবিনয়ে তা' নিবেদন করতেন।

মানুষে-পশুতে লড়াই দেখা সম্রাটের অন্যতম ব্যসন ছিল। এ রকম একটি লড়াই দেখার আমন্ত্রণ পাদ্রীরা দৃঢ়স্বরে প্রত্যাখ্যান করেন। সম্রাট পীড়াপীড়ি করলেন না। কিন্তু পাদ্রীদের নিকট তাঁ'র আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের কারণ জানতে চাইলেন। পাদ্রীরা তা'র উত্তরে জানালেন যে মানুষ ও পশুর লড়াই, অথবা মানুষ হত্যার যে কোনও দৃশ্য দেখা বা তদ্বিষয়ে উৎসাহবোধ খৃষ্টীয় ধর্মশিক্ষার প্রতিকূল। ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুর সামনে অসহায় বন্দীকে এগিয়ে দেওয়াকে পাদ্রীরা জঘন্য নৈতিক অপরাধ ব'লে মনে করেন। সম্রাট যদি সত্য সত্যই মানুষ ও হিংস্র পশুর লড়াই দেখে ফূর্তি পেতে চান, তবে যেন তিনি বন্দীদের ভোঁতা তরোয়াল, ঢাল এবং বক্ষাবরণে সুসজ্জিত করেন, যা'তে তা'রা হিংস্র পশুর তীক্ষ্ণ নখর ও দাঁত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। ভোঁতা তরোয়াল দিয়ে পশুকে বধ করার সুযোগ থেকে বন্দীকে বঞ্চিত করলে সাহস ও শক্তির পরীক্ষা সত্যই উপভোগ্য হবে। কোনও পক্ষেরই প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকবে না। সম্রাট এই প্রস্তাবের সারবত্তা স্বীকার করলেন (*) এবং খৃষ্টধর্মে দয়ার স্থান অতি উঁচু দেখে আনন্দিত হলেন।

---

* অহিংসায় পুণবিশ্বাস স্থাপন করার পর সম্রাট অশোক প্রাসাদের পাকশালায় কুক্কুট মাংস রান্না বন্ধ করেছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্মে 'জীবে দয়া' নীতির স্থান অতি উঁচু, আকবর এই কথা মেনে নেওয়ার পর gladiator এর লড়াই বন্ধ করেছিলেন, —মোন্সারেট তা' লেখেন নি, ইতিহাসেও তা' বলে না।

সমসাময়িক ঘটনা

ব্রাহ্মণদের এক অদ্ভুত প্রথা পাদ্রীরা লক্ষ্য করেছিলেন। ব্রাহ্মণ-বিধবাদের সদ্যমৃত স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় দাহ করে মারা হয়। এইরূপ একটি সহমরণ প্রত্যক্ষ করার জন্য আকবর পাদ্রীদের আমন্ত্রণ করলেন (*)। পাদ্রীরা ঐ প্রথা সম্পর্কে আগে কিছুই জানতেন না। তাঁ'রা সতীদাহেব স্থানে উপস্থিত হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন। মর্মান্তিক ও বিমর্ষকব এই নিদারুণ ঘটনা দেখে রুডল্‌ফ সর্বসমক্ষেই সম্রাটকে এই বীভৎস দাহ প্রথা দেখার জন্য তিরস্কাব করলেন। অসহায়া সদ্য বিধবার কোনও স্বাধীন চিন্তার অবকাশ নেই; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আফিম বা ধুতুরার বীজ খাইয়ে অচৈতন্য ক'বে তা'দের চিতায় তুলে দেওয়া হয়। যদি কোনও বিধবা জ্ঞান ফিরে পেয়ে চিতা থেকে স'বে আসার চেষ্টা কবে তবে তা'কে লম্বা বাঁশ দিয়ে চিতাব উপব চেপে রাখা হয়, যেন তা'র প্রাণ বাঁচানোর ক্ষমতা না থাকে। রুডল্‌ফের তিরস্কার অনেকেই শুনতে পেয়েছিলেন এবং উপস্থিত সকলেই তা'তে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু

---

* আইন-ই-আকববী বা অন্য কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থে আকবব সতীদাহ দেখেছিলেন, বা দেখাব জন্য কাউকে অনুবোধ কবেছিলেন, এবকম উল্লেখ নেই। আকবব সতীদাহ প্রথা সমর্থন কবতেন না, কিন্তু আইনেব দ্বারা এই প্রথার অবসান ঘটাবাব প্রযাস তিনি কবেন নি, কাবণ তাঁ'ব আশঙ্কা ছিল যে তা'ব ফলে হিন্দুবা ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে ব'লে বিক্ষুব্ধ হবে। আওরঙ্গজেব সতীদাহ প্রথাব বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন, কিন্তু তা' কাগজে কলমেই নিবদ্ধ ছিল, কোনও সুবেদার তার প্রয়োগ করতে সাহস পায় নি।

সম্রাটের সামনে কেউ বিক্ষোভ দেখায় নি। এই ঘটনার পরে প্রাসাদের প্রধান কর্মচারী রাজা ভগবান দাস আর কোনও দিন পাদ্রীদের সতীদাহ দেখার জন্য অনুরোধ করেন নি। হিন্দুদের ধর্মসংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে সম্রাটকে পরামর্শ দেওয়ার সর্বোচ্চ অধিকার ছিল রাজা ভগবান দাসের।

পাদ্রীরা একদিন দেখলেন যে নষ্টচরিত্র একদল পুরুষ স্ত্রীলোকের মতো সাজ পোষাক প'রে মেয়েলি ঢঙ্-এ নাচ্ছে। সম্রাট এই ধরনের কুরুচিপূর্ণ আমোদআহ্লাদে খুব উৎসাহ দেখাতেন। আকবরের মতো একজন সৎ ও বিবেচক সম্রাট কী ক'রে যে এই সব জঘন্য মানুষের প্রগল্‌ভতা সহ্য করতে পারেন, তা' তাঁ'রা বুঝে উঠতে পারেন নি। ফতেপুর থেকে পাদ্রীরা এদের বিতাড়িত করার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করলেন। পয়গম্বরের বাণী উধৃত ক'রে পাদ্রীরা বললেন, সৎ যা'রা তা'দের যেন সততা ও পবিত্রতার জন্য দুর্ভোগ পোহাতে না হয়। সম্রাট এই বিদ্রুপাত্মক মন্তব্যে হেসে উঠলেন। বললেন যে তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করবেন।

আকবরের দুই ছেলে, সেলিম এবং ড্যানিয়েল, দুইজন বৃদ্ধ মুসলমানের নিকটও লেখাপড়া শিখতো। এই বৃদ্ধদের বিদ্যাবুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য বিশেষ ছিল না, কিন্তু মোল্লাদের মতোই ধর্মান্ধ ছিল। পাদ্রীরা সম্রাটপুত্রদের এদের নিকট থেকে সরিয়ে আনার প্রস্তাব করলেন। সম্রাট ধৈর্য সহকারে তাঁদের বক্তব্য শুনলেন। বললেন যে তাঁ'র পিতা ও পিতামহের রাজত্বকালীন ইতিহাসই ঐ বৃদ্ধ শিক্ষক দুইজন পড়াবেন। সম্রাট পুত্ররা তাঁ'দের কাছে অন্য কোনও বিষয় পড়বে না।

পাদ্রীরা আকবরের দয়ালুতার অনেক নিদর্শন পেয়ে-

ছিলেন। ধর্মাচরণে দীর্ঘসূত্রী মনোভাব সম্পর্কে রুড্‌লফ্ সম্রাটকে যে তিরস্কার করেছিলেন তা'তে তিনি ক্ষুব্ধ হন নি। নিজের দুর্বলতা স্বীকার করতে সম্রাট কুণ্ঠিত হতেন না। পাদ্রীরা যখন তাঁ'দের টুপি খুলে সম্রাটকে অভিবাদন জানাতেন, সম্রাট সস্মিত মুখে প্রত্যভিবাদন করতেন। খৃষ্টিয় রীতি অনুযায়ী কখনও মাথা খোলা রাখতে নেই। সেই তথ্য আকবরের জানা ছিল; তিনি তাঁ'র সামনে থাকার সময় পাদ্রীদের টুপী প'রে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। দরবারের কোনও আলোচনাই পাদ্রীদের উপস্থিতিতে নিষিদ্ধ ছিল না। সম্রাট যদি কোথাও নিভৃতে অবস্থান করতেন, পাদ্রীরা সেখানে বিনা বাধাতেই যেতে পারতেন। পাদ্রীদেব কেহ অসুস্থ হ'লে সম্রাট নিজে গিয়ে তাঁকে দেখে আসতেন। পর্তুগীজ ভাষায় কুশল প্রশ্নাদি করতেন। প্রায়ই নিজের খানা টেবিল থেকে পাদ্রীদের জন্য ভোজ্যদ্রব্য পাঠিয়ে দিতেন। পাদ্রীবা যেন কোন সময়ই অর্থাভাবে না পড়েন, সেদিকে তাঁ'র প্রখর দৃষ্টি ছিল।

পাদ্রীদের প্রতি আকবরের সহৃদয়তার অন্যরূপ ব্যাখ্যা হতে লাগলো। রাজধানীতে প্রবল গুজব রটলো যে সম্রাট খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করছেন। সম্রাট নিয়মিত জুম্মার নামাজ পড়তেন না, রোজা মানতেন না, মহম্মদের কথা উঠলে তিনি তরল চিত্তেব পরিচয় দিতেন। এতে বহু মুসলমানই অসন্তুষ্ট হতেন, বিশেষতঃ খাজা মনসুর (১৭) নামক জনৈক সম্মানিত ওমরাহ বিশেষ মর্মাহত হ'ন। ধর্মগুরুর সম্পর্কে সম্রাটেব অশোভন উক্তি সহ্য করতে না পেরে তিনি গোপনে সম্রাটের বিদ্রোহী ভ্রাতার সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। আকবরের এই বিদ্রোহী ভ্রাতার

নাম মীর্জা মহম্মদ হাকিম, কাবুলস্থিত ভাইসরয়। ইনি আকবরের বৈমাত্র ভাই। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে উজ্‌বেগ বিদ্রোহকে উপলক্ষ্য ক'রে হাকিমকে সম্রাট করার একটা চক্রান্ত হয়েছিল। পুনরায়, ১৫৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে আকবর যখন বাংলাদেশে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় হাকিমও কাবুলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মোল্লাদের সমর্থনেই এই বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহী হাকিমের উদ্দেশ্যে লিখিত শাহ্‌ মনসুরের একটি চিঠি সম্রাটের হাতে পড়ে। তা'তে শাহ্‌ মনসুর লিখেছেন, "অলস্য পরিহাস ক'রে এবং ধর্মের প্রতি অবহেলা না ক'রে আপনি, কাফের ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা পয়গম্বরকে যে অবমাননা করছে, তা'র প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ পরিকর হোন। ধর্মচ্যুত ভাইএর বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তা' হ'লে আমাকে যাঁ'রা বিশ্বাস করেন, তাঁদের অনেকেরই সমর্থন আপনি পাবেন। আমিই তা'দের নেতা। যুদ্ধ শুরু হ'লে আপনার ভ্রাতা আকবর বাদ্‌শাহ্‌ আমার হাতেই অথবা আমা অপেক্ষাও সহজে ও নিরাপদে কার্য সমাধা করতে সক্ষম এরূপ ব্যক্তির হাতে নিহত হবেন। বাদ্‌শাহ্‌র অনেক আত্মীয় স্বজন আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যু হ'লে একটি রক্তপাতহীন বিপ্লব সফল হবে।" মনসুর এই চিঠির কয়েকটি অনুলিপি করিয়েছিলেন; এরই একটি সম্রাটের হাতে পড়ে। সম্রাটের আদেশে শাহ্‌ মনসুরকে নজরবন্দী রাখা হয়। সম্রাট আকবর হাকিমকে পত্রযোগে হুঁশিয়ার ক'রে দিলেন যে কোনও বেয়াদপী তিনি সহ্য করবেন না। হাকিম যদি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন, সম্রাট তাঁ'কে পদচ্যুত করতে দ্বিধা করবেন না। একমাস নজরবন্দী রাখার পর শাহ্‌ মনসুরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রচার করা হোল

যে অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন সম্রাট তা' বিবেচনা করেই তাঁ'কে মুক্তি দিলেন। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার সন্দেহে অনেককে সাম্রাজ্যের দূর দূর প্রান্তে বদ্‌লী করা হয়।

আকবর খুব সাহসী ও সরল চিত্ত ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে পূর্বোক্ত পন্থায় তিনি বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে পেরেছেন। তথাপি, এর পর থেকে তিনি সর্বদাই সশস্ত্র থাকতেন। এদিকে পাদ্রীদের অবস্থাও খুব নিরাপদ ছিল না। বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলেও শাহ্‌ মন্‌সুর তাঁ'র পুরানো অভিসন্ধি ছাড়েন নি। পুনরায় তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। মীর্জা হাকিমকে উস্কানি দিয়ে আবার তিনি চিঠি দিলেন। সেনাবাহিনীর মধ্যেও তিনি অসন্তোষের বীজ ছড়াতে লাগলেন। সম্রাটও চরের মারফৎ এই সব সংবাদ পাচ্ছিলেন।

মুঘল সামরিক সংগঠন

আকবর এবং তাঁ'র পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটরা তাঁ'দের পূর্বপুরুষ চেঙ্গিশ্‌ খাঁ'র প্রবর্তিত সৈন্যবাহিনী গঠনের পদ্ধতিই অনুসরণ করতেন (১৮)। আকবর এই পদ্ধতির প্রভূত আধুনিকিকরণ করেন। একে মন্‌সবদারী প্রথা বলা হয। সেনানায়ক-দেরই মন্‌সবদার বলা হয়। সাধারণ দশটি সৈনিকের নায়ক হচ্ছে সর্বনিম্ন মন্‌সবদার। একশত সৈনিকের নায়ক হচ্ছে তা'র উপর শ্রেণীর মন্‌সবদার। তারও উপরে হচ্ছে এক হাজার থেকে দশ হাজার সৈন্যের নায়ক মন্‌সবদার। অধীনস্থ সৈন্যদের বেতন দেওয়ার সময় মনসবদারদের প্রদত্ত সংখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। সাধারণতঃ তা'দের অবিশ্বাস করা হয় না। শাহ্‌ মন্‌সুর ছিলেন

সম্রাটের অর্থমন্ত্রী। তিনি মনসবদারদের প্রদত্ত সংখ্যায় সন্দিহান ছিলেন, এবং তা' সম্রাটকে অবিশ্বাস করতে পরামর্শ দিতেন। শাহ্ মনসুর সন্দেহ করতেন যে ভুয়া হিসাব দিয়ে মনসবদারেরা সরকারী অর্থের অপচয় করছে, তা'রা পদাতিক এমন কি গৃহ ভৃত্যদেরও অশ্বারোহী সৈন্য বলে চাপিয়ে দিচ্ছে এবং তা'দের নাম ক'রে রাজকোষ থেকে টাকা নিচ্ছে। শাহ্ মনসুর নিয়ম করলেন যে অশ্বারোহী সৈন্যেরা নিজ নিজ ঘোড়া নিয়ে বেতনের দিন হাজিরা দেবে, এবং মীর বক্‌শী বা তা'র প্রতিনিধি বেতন দেওয়ার ঘোড়ার গায়ে রঙ দাগিয়ে দেবে, যেন একই ঘোড়া বারে বারে দেখিয়ে নিজের বেতন ও ঘোড়ার রসদের টাকা সৈন্যেরা না নিতে পারে। হাওলাত ক'রে নিয়ে এসে ঘোড়া দেখানো চলতো না। যদি কোনও অশ্বারোহী সৈন্যের ঘোড়া ম'রে যেত তবে ঘোড়ার লেজ কেটে এনে মীর বক্‌শীকে দেখাতে হোত। সম্রাটের অনুমতি ছাড়া কেহ ঘোড়া কিনতে বা বিক্রয় করতে পারতো না। এছাড়া আরও কিছু উপদ্রব চাপিয়ে দিয়েছিলেন শাহ্ মনসুর। ব্যয়সঙ্কোচের অজুহাতে বেতন ভাতা ও রসদের জন্য টাকার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ও বিহারের জায়গীরের মূল্য কমিয়ে দেওয়া হোল এবং ঐ দুই প্রদেশের সরকারী কর্মচারীদের ভাতার পরিমাণ হ্রাস করা হোল। ব্যয়সঙ্কোচ হবে ব'লে সম্রাট এই সম্পর্কিত ফর্মানে সই করেছিলেন। এর ফলে অনেক রাজকর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর একটা বড়ো অংশ সম্রাটের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে।

শাহ্ মনসুর ধূমায়িত অসন্তোষকে স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার রূপে গ্রহণ করেন। তিনি এমন সব কথাবার্তা বলতে লাগলেন যে সবাই মনে করলো ঐ পূর্বোক্ত ফর্মানজারীতে তাঁ'র ব্যক্তিগত

সমর্থন ছিল না। যেন সম্রাট নিজ ইচ্ছাতেই ঐ আদেশ জারী হয়েছে। দেশময় সম্রাটের বিরুদ্ধ সমালোচনা হ'তে থাকলো। তাঁ'কে 'অত্যাচারী বাদ্‌শাহ্‌' আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হ'তে থাকে। অবস্থা এমন হয়ে ওঠে যে সার্বজনীন অসন্তোষকে কেন্দ্র ক'রে ধর্ম ও স্বাধীনতার নামে সম্রাটের বিরুদ্ধে জেহাদ্‌ ঘোষণার সম্ভাবনা দেখা দিল। নানা রকম গুজব ছড়ালো। শেষে একদিন পাদ্রীরা সম্রাটের কাছে গিয়ে জান'তে চাইলেন যে তিনি তাঁ'দের বিদায় দেওয়ার ইচ্ছা কারণ কিনা। কারণ, একটা গুজব ছড়িয়েছিল যে সম্রাট খৃষ্টান ধর্মযাজকদের ডেকে এনে এখন পস্তাচ্ছেন। পাদ্রীদের কথা শুনে আকবর বিদ্রুপ ক'রে বললেন যে পাদ্রীরাই বোধ হয় ঘর-মুখো টান অনুভব করছেন। পাদ্রী-দের মনোকষ্টের প্রধান হেতু হোল যে তাঁ'রা অনেক কষ্ট ও অসুবিধা স্বীকার ক'রে যে উদ্দেশ্য নিয়ে গোয়া থেকে এত দূরে এসে এতদিন অপেক্ষা করলেন তা'র সাফল্যের কোন লক্ষণই তাঁ'রা দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁদের আশা ছিল যে আকবর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। সে আশা পূর্ণ হবে ব'লে তাঁ'রা আর মনে করতে পারছিলেন না।

এই গোলযোগের সময় সম্রাট আকবর শাহ্‌ মনসুরের দ্বিতীয় বারের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন। মীর্জা হাকিমও এই সুযোগে কাবুলে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করেন। পনেরো হাজার মঙ্গোল ঘোড় সওয়ার নিয়ে তিনি সিন্ধু, ঝিলম, চেনাব এবং রাভি নদী অতিক্রম ক'রে লাহোরের অভিমুখে অগ্রসর হ'ন। সে সময় পাঞ্জাবের সুবাহদার ছিলেন মীর্জা ইউসুফ্‌ খাঁ। তিনি রোটাস্‌ দুর্গ (১৯) সুরক্ষিত ক'রে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিলেন এবং মীর্জা হাকিমের নিকট আত্মসমর্পন করতে

অস্বীকার করলেন। মীর্জা হাকিম রোটাস্ দুর্গ আক্রমণ করলেন না, পাশ কাটিয়ে গেলেন। রোটাস্ দুর্গের পতন ঘটানোকে তিনি অযথা শক্তিক্ষয় ব'লে মনে করলেন। মীর্জা হাকিম আদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর সৈন্যেরা যেন জনসাধারণের বিরাগ উৎপাদক কোনও কাজ না করে। তিনি যাত্রাপথের সর্বত্র, বিশেষতঃ পাঞ্জাবের জায়গীরদারগণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব ও সহায়তা প্রার্থনা করলেন; কিন্তু তাঁর অহ্বানে কেহ সাড়া দিল না। মীর্জা হাকিম এতে প্রমাদ গণলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল যে আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তিনি এগিয়ে গেলেই সকলের সমর্থন পাবেন। এখন বুঝতে পারলেন যে তাঁর প্রাপ্ত সংবাদের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। এবার তাঁর ভয় হোল, তিনি অনুশোচনা করতে লাগলেন। তিনি জানতেন যে শাহানশাহ্ আকবরের ক্ষমতা অসীম। যা'রা মীর্জা হাকিমকে উত্তেজিত করেছিল, সময়কালে কা'রোই পাত্তা পাওয়া গেল না, তা'রা সবাই গা' ঢাকা দিয়েছে।

মীর্জা হাকিম চতুর্দিকে চর পাঠালেন। তা'রা ফিরে এসে খবর দিল যে কোথাও কোন উত্তেজনা বা উৎকণ্ঠার চিহ্ন মাত্র তা'রা দেখতে পায়নি। মীর্জা হাকিমের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ আকবর পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যাক্রমণ বা প্রতিরোধের কোনও উদ্যোগ না ক'রে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে মীর্জা হাকিমের নিকট দূত পাঠালেন। হাকিমকে স্তোকবাক্যে বশীভূত ক'রে রাজধানীর নিকটে এনে ফাঁদে ফেলাই ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। এদিকে মীর্জা হাকিম সংবাদ পেলেন যে আকবর যুদ্ধের জন্য তো প্রস্তুত হচ্ছেন না, বরঞ্চ শিকারের

উদ্দেশ্যে রাজধানী ছেড়ে রওনা হয়েছেন এবং শিকারের জন্য নির্বাচিত স্থানের নিকটে বাদশাহী তাঁবু পড়েছে। যুদ্ধের উদ্যোগ না ক'রে মৈত্রী আলোচনার প্রস্তাব এবং সঙ্গে সঙ্গেই পশু-শিকারের আয়োজন, হাকিমের মনে বেশ খট্‌কা লাগলো। আকবরের প্রকৃত মনোভাব মীর্জা হাকিম বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় পশ্চাদপসারণ সুরু করলেন। চন্দ্রভাগা নদীর উপর সেতু না থাকায় এবং নদী পার হওয়ার জন্য নৌকার বন্দোবস্ত করতে না পারায় (*) সৈন্যদের এবং নিজেকেও সাঁতার কেটে নদী পার হতে হয়। সাঁতার জানতো না, এমন চারশ' অশ্বারোহী ঘোড়া সমেত ডুবে মরে। বিতস্তা ও সিন্ধু নদ পার হওয়ার সময়ও অনেক সৈন্য মারা যায়।

মীর্জা হাকিমের দুর্দশা এতেই শেষ হোল না। আকবর তাঁ'র দুর্বিনীত ব্যবহারের শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। প্রথমেই তিনি শাহ্‌ মনসুরকে দ্বিতীয়বার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দিলেন। ষড়যন্ত্রের বিন্দু বিসর্গও যে সম্রাট জানতে পেরেছেন তা' তাঁ'র কথাবার্তা বা ব্যবহারে প্রকাশ পেলো না। শাহ্‌ মনসুর জানলো যে সম্রাট নিছক্‌ সন্দেহের বশেই তাঁ'কে বন্দী করেছিলেন, অভিযোগের কোন ভিত্তি না দেখতে না পেয়ে তাঁ'কে মুক্তি দিলেন। আকবরের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। ষড়যন্ত্রীদের নিধন ও বিদ্রোহী ভ্রাতার বিরুদ্ধে অভিযানের

---

* সিন্ধু অঞ্চলের যাবতীয় সরকারী কর্মচারীকে আকবর এই নির্দেশ দিলেন যে হাকিমকে নদী পার হওয়ার জন্য কেউ যেন কোনরকম সাহায্য না করেন। আবুল ফজল এই তথ্য দিয়েছেন (ব্লকম্যান কৃত অনুবাদ, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৪২৪)।

পরিকল্পনা নিয়েই তিনি চিন্তা করছিলেন। তিনি তাঁর নিকট আত্মীয় ও বিশ্বস্ত কর্মচারী মীর্জা আজিজ্ কোকাহ্‌কে (২০) বাংলাদেশের এক বিদ্রোহ দমন করতে পাঠিয়ে দেন। তৈমুর লঙ্-এর অনুকরণে আজিজ্ কোকাহ্ কালো পতাকা নিয়ে (†) রওনা হ'ন, এবং চরম নিষ্ঠুরতায় বিদ্রোহীদের হত্যা করেন। এই সংবাদ কাবুলেও প্রচার করা হয়েছিল। তারপর শুরু হোল অভিযান। সম্রাটের অভিপ্রায় ছিল না যে নিজের খাশ্ রাজ্য মধ্যে হাকিমকে দমন করবেন, বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি তা' অনায়াসেই করতে পারতেন। মীর্জা হাকিম লাহোর অবধি এসেছিলেন। সম্রাট স্থির করলেন কাবুলেই হাকিমকে শায়েস্তা করবেন। যদি হাকিম পলায়ন করেন, সম্রাট সিদ্ধান্ত নিলেন যে তা' হ'লে তাঁকে তাড়া করবেন।

কাবুল অভিযান

অভিযানের প্রস্তুতি শেষ হ'য়ে এলো। একদিন পাদ্রীরা নিবেদন করলেন যেন সম্রাট তাঁ'দেরও অভিযানের সামিল ক'রে নেন। সম্রাট খুব খুশী হলেন, তবে তাঁ'দের জানালেন যে তিনি রাজধানীর বাইরে গেলে সম্রাটের মা হামিদা বানু পাদ্রীদের দেখা শোনা করবেন এই রকম ব্যবস্থা হয়েছে। সম্রাটের সঙ্গে না গিয়ে তাঁ'রা যদি রাজধানীতে থেকেই ধর্মচর্চা করেন, তা' হ'লে কি ভালো হয় না! পাদ্রীরা বললেন, সম্রাটের সুবিবেচনা ও সহৃদয়তা তাঁ'রা উত্তমরূপে অবগত আছেন। একথাও বললেন যে ধর্মাচারণ যদিও

---

† এই পতাকার তাৎপর্য হোল যে শত্রুর বিনাশ সাধন ব্যতিরেকে যুদ্ধের সমাপ্তি নেই।

তাঁ'দের পবিত্র কর্তব্য, তথাপি, সম্রাটের সান্নিধ্যও তাঁ'দের কাম্য। সব কথা শুনে সম্রাট রুডলফ্ এবং মোন্সারেটকে অভিযানের সামিল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'তে বললেন।

সম্রাট কাবুল অভিযানে যাচ্ছেন, এ কথা গোপন রাখা হোল। ঘোষণায় বলা হো'ল যে সম্রাট সদলবলে শিকারে যাচ্ছেন। রাজধানী থেকে চার মাইল দূ'রে বাদ্শাহী ছাউনী পড়্লো।

সম্রাট যতোদিন রাজধানীর বাইরে থাকবেন, সেই সময়ের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হোল: সম্রাটের মা হামিদা বানু সম্রাটের হয়ে রাজ্য শাসন করবেন। কনিষ্ঠ পুত্র ড্যানিয়েল পিতামহীর কাছে থাকবেন। গুজরাট এবং রাজপুতানায় দশহাজার এবং রাজধানীতে বারো হাজার সৈন্য মোতায়েন থাকবে। সুবাহ্ বাংলার শাসনভার থাকবে আজিজ্ কোকাহর হাতে, এবং পাঁচ হাজারী মনসবদার বিশ্বস্ত কুতুবুদ্দীন খাঁ গুজরাটের শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকবেন। বাংলা দেশের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রয়োজন হ'লে বিশ হাজার সৈন্য, পাঁচ জন অধস্তন সেনাপতি এবং পাঁচ বা ছয় হাজার (মতান্তরে চার হাজার) অশ্বারোহী সৈন্য অতিরিক্ত পাবেন।

সম্রাটের সঙ্গে থাকবেন তাঁ'র বড়ো দুই ছেলে, সেলিম মুরাদ। মুরাদের গৃহশিক্ষক মোন্সারেট্ও সঙ্গে থাকবেন। কনিষ্ঠা কন্যা জিমিনি বেগম ও কনিষ্ঠ পুত্র ড্যানিয়েল পিতামহীর হেফাজতে থাকবেন। কয়েকজন বিশিষ্টা বেগম এবং বয়ঃপ্রাপ্তা রাজকন্যা, শাহ্জাদী খানুম্, শাহরুন্নিসা এবং আরাম বানুবেগম,—সম্রাটের সঙ্গে যাবেন। হাতী ও উটের পিঠে বিস্তর সোনা রূপা ও নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী বোঝাই হোল। সম্রাটের যাত্রাপথে মাতা হামিদা বানু অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। ছাউনীর তাঁবুতে দুরাত্ কাটিয়ে তিনি ফতেপুর সিক্রি ফিরে গেলেন।

মুঘল (*) রাজবংশের জাঁক জমক এবং আকবরের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার পরিচয় এই অভিযানে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বিরাট সেনাবাহিনী, অসংখ্য সেনানায়ক ও সেনাপতি, বিপুল ধনরত্ন, খাদ্যদ্রব্যের ভাণ্ডার, অগ্রগামী বস্তুকার ও পূর্তবিভাগের লোকজন, প্রহরী, দূত, দৌবারিক, চর, বিরাট আকারের কামান, নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র, —সব মিলিয়ে যেন এক চলমান রাজধানী! সম্রাটের নিজস্ব পেশাখানা শ্বেতবর্ণের একটি তাঁবুতে; এই তাঁবু দুই প্রকস্তের ছিল। একটি 'সেট্' খাটানো হ'লে বাদ্‌শাহ্ তা'র ভিতরে দরবারে বসতেন। অপর প্রশস্ত তাঁবুটি তখন অগ্রগামী দল পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে খাটিয়ে রাখ্‌তো, যেন বাদশাহকে তাঁবু খাটানোর জন্য অপেক্ষা করতে না হয়। সুনির্বাচিত একটি উঁচু জায়গায় সম্রাটের পেশাখানার তাঁবু খাটানো হোত। পেশাখানার ডানপাশে থাকতো সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও তাঁ'র নিজস্ব কর্মচারীদের তাঁবু, বা পাশে থাকতো দ্বিতীয় পুত্র ও তাঁ'র কর্মচারীদের তাঁবু। প্রথম সারির তাঁবুগুলির বিন্যাস সর্বদাই এই রকম হোত। এর ঠিক পিছনের সারিতে থাকতো বাদ্‌শাহী পরিবারভুক্ত অন্যান্যদের তাঁবু। তা'রও পিছনে খাটানো হোত সেনাপতি ও সেনানায়কদের তাঁবুর সারি। সৈন্যেরা নিজ নিজ নায়কদের তাঁবু ঘিরে অবস্থান করতো (†)। ভিড় ও বিশৃঙ্খলা

---

* মোন্‌সারেট্ সর্বত্রই 'মুঘল' না লিখে 'মংগোল' লিখেছেন।

† আবুলফজল আকবরের কাবুল অভিযানকালীন শিবির-বিন্যাসের নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন :— 'সম্রাটের নিজস্ব বিরাট তাঁবুর ডাইনে, বামে এবং পশ্চাতে, প্রতি দিকে ৩৬০ গজ উন্মুক্ত স্থানে থাকতো। কোন প্রহরীও ঐ উন্মুক্ত এলাকায় প্রবেশ করতে পারতো না।

যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র ছাউনী বিভিন্ন অংশ বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক অংশেরই নিজস্ব তোষাখানা এবং ভাঁড়ারের কর্মচারী ছিল। সম্রাট এবং তাঁ'র পুত্রদের ও পদস্থ ওম্‌রাহ্‌দের জন্য পৃথক দোকানপাট তাঁ'দের তাঁবুর সারির নিকটেই স্থাপিত হোত। এই সব দোকানে শুধু শস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যই থাকতো না, প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যই মজুত থাকতো। ছাউনীর বিন্যাস সর্বদাই একই নক্‌শা অনুযায়ী হোত। কয়েকদিন ছাউনীতে থাকার পরই পরিবেশ সম্পূর্ণ অভ্যস্ত ও পরিচিত হয়ে যেতো। কখনোই মনে হোত না যে নিজের নিত্য পরিচিত শহর ছেড়ে দূরে অন্য কোথায়ও আছি। ছাউনীর বাজারগুলি 'উর্দু' (*) নামে অভিহিত। সম্রাটের তাঁবু ছিল দ্বিতল; সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে ওঠা যেত।

এই খোলা জায়গায় বাদ্‌শাহী তাঁবুর একশত গজের মধ্যে কিছুটা বাঁ দিকে থাকতো মরিয়ম বেগম (সেলিমের জননী, রাজা বিহারী মলের কন্যা), গুলবদন বেগম ও অন্যান্য বিশিষ্ট বেগমদের ও কনিষ্ঠ পুত্র ড্যানিয়েলের তাঁবু সমূহ।

* মুঘল সম্রাটরা তাঁদের পূর্বপুরুষ তাতারদের কাছ থেকেই অনবরত নতুন নতুন রাজ্যজয়ের প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাতার দলপতি এবং মুঘলরাও যখন রাজ্য আক্রমণ করতে সসৈন্য অগ্রসর হতেন, তা'দের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্য সামগ্রীও সঙ্গে সঙ্গে চলতো। হাটের মতো দোকানপাট বসতো। চলমান সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে চলমান বাজারও থাকতো। মুঘল সৈন্যদলে নানা ভাষাভাষী লোক থাকতো, বাজারে কেনাবেচা ও কথাবার্তার জন্য মিশ্র এক কথ্য ভাষার উদ্ভব হয়; এই ভাষার নামই 'উর্দু'। তুর্কীভাষায় উর্দু শব্দের মানে হচ্ছে 'বাজার'। মিশ্রভাষারূপে 'জবান-ই-উর্দু' কালক্রমে রাজকার্যের এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের

সম্রাট এই অভিযানে আঠাশটি কামান নিয়েছিলেন। অবশ্য কোনও নগর বা দুর্গ অবরোধের পক্ষে এই কামানগুলি বিশেষ কার্যকরী নয়, কারণ, এর কোনটাই দূর পাল্লার ভারী কামান নয়। সামনাসামনি লড়াই এর পক্ষেই এই ধরণের কামান উপযোগী। কামানগুলি সম্রাটের তাঁবুর সম্মুখস্থ খোলা ময়দানের একপাশে সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকতো। একটি উঁচু খুঁটির মাথায় সারারাত মশাল জ্বলতো; অনেক দূর থেকেও মশালের আলো দেখা যেত। যদি ছাউনির কোনও অংশে কোন গোলযোগ দেখা দিলে সকলে ঐ খুঁটির দিকে দৌড়ে যেত। ছাউনী থেকে দূরে গেলেও রাত্রে মশালের আলো দেখে লোকে ছাউনীতে ফিরে আসতে পারতো। সমগ্র অভিযানের মস্তিষ্ক ও প্রাণকেন্দ্র ছিল ঐ খুঁটিটি।

শাহ্ মনসুরও সম্রাটের আদেশে অভিযানের সঙ্গেই চল্‌ছিলেন। তাঁকে রাজধানীতে রেখে আসা হয়নি। কোনও উপদ্রব যাতে না করতে পারেন, সেই জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

১৫৮১ খৃষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারী কাবুল অভিযান শুরু হয়। কিন্তু সম্রাটের কথাবার্তায় ও ব্যবহার দেখে মনে হোত না যে তিনি যুদ্ধ করতে চলেছেন। রাজধানী ছেড়ে আসার একদিন

ভাষা হয়ে উঠেছে।

চলমান বাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত বাজার, —এ ব্যবস্থা মুঘলরাই প্রবর্তন করে নি। বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে পর্তুগীজ লেখক নুনিজ লিখেছেন, "গোটা ছাউনী নির্দিষ্ট ও নিয়মিত বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হোত; প্রশস্ত রাস্তার দুপাশে তাঁবু পড়তো। প্রত্যেক অংশের জন্য বাজার ছিল, দোকানে ভেড়া ছাগল শুয়োর মুরগী ও পাখী সব রকম মাংসই পাওয়া যেত।" (নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী : এ হিষ্ট্রী অব্ সাউথ ইণ্ডিয়া, ১৯৬৬ পৃঃ ৩১৭)।

পরেই সম্রাট পশু শিকারে ব্যস্ত হলেন। অভিযানের যাত্রা পথে যাতে কেউ রাস্তা পারাপার না করে সে বিষয়ে কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল। সম্রাটকে এবং তাঁর পরিবারস্থ ও অন্যান্য সবাইকে দেখার জন্য পথিমধ্যস্থ গ্রাম ও নগরের লোকজন যাতে ভিড় জমিয়ে চলার পথে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে, সেই জন্যই এই সতর্কতামূলক আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বন্য পশু অধিকাংশই ইয়োরোপের মতোই। একটি বিশেষ ধরনের পশুকে বলা হয় 'নীল গাই'। দেখতে অনেকটা লাল হরিণের অনুরূপ। আমাদের দেশের মতো এখানে শিকারী কুকুর নেই। সম্রাটের বেশ কিছু সংখ্যক বন্দী পোষা নেকড়ে ছিল। এদের সর্বদা চোখ বাঁধা অবস্থায় রাখা হোত। উপযুক্ত অভিজ্ঞ প্রহরায় এদের শিকারের জায়গায় নিয়ে গিয়ে চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হোত। ক্ষুধার্থ এই নেকড়েগুলি তখন শিকারের পশুদের খুঁজে বের করে' ঝাপিয়ে পড়তো।

শিকারের পর সম্রাট পুনরায় অগ্রসর হলেন। বাদশাহর দেহরক্ষী বাহিনীর অশ্বারোহীরা অর্ধচন্দ্রাকারে সম্রাটের তিন পাশ ঘিরে চলতে লাগলো। সম্রাট থেমে গেলে এরাও থেমে যেতো; সম্রাটের সঙ্গে এদের দূরত্ব কখনোই বাড়তো বা কমতো না। বাদ্‌-শাহ্‌ যখন তাঁর তাঁবুতে থাকতেন, তখন এরা তাঁবুর দুই পাশে সারিবদ্ধ ভাবে অশ্বপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে থাকতো। সম্রাটের তাঁবুর দিকে মুখ করে মাঠের ওপাশে সু-আচ্ছাদিত হস্তি বাহিনী থাকতো; এদের মুখোমুখী লাইন করে' তীরন্দাজ, বল্লমধারী ও বন্দুকধারী অশ্বারোহীরা মোতায়েন থাকতো। সম্রাট যখন তা'দের সামনে দিয়ে যেতেন, প্রত্যেকে তাঁ'কে সেলাম দিত। মুঘলরা খুব হাল্‌কা

কামানের ব্যবহার জানে না (*)।

সমগ্র বাহিনীর অগ্রভাগে হাতীর পিঠে চেপে ঢাক ও ভেরী বাজিয়ে ঘোষকরা বাদ্‌শাহী অভিযানের বার্তা ঘোষণা করতে করতে এগোতো। অন্য সকলে নিঃশব্দে চলতো; শুধু একটি লোক প্রতি দশ পা চলার পর ঢাকে কাঠি দিয়ে খুব মৃদু একটা শব্দ করতো। এই শব্দ শুনে সবাই একতালে পা ফেলতো। পূর্বোক্ত ঘোষকদের পরে বাহিনীর আগে আগে একদল অশ্বারোহী সৈন্য চল্‌তো,—সম্রাটের যাত্রা পথে যাতে ভিড় না হয়, যেন কোন উৎপাতের সম্ভাবনা না থাকে, এই অগ্রগামী দল তদ্বিষয়ে নজর রাখতো। সম্রাটের বেগমরা পর্দানশীন হয়ে মাদী হাতীরপিঠে সুসজ্জিত হাওদায় আরামে বসে যেতেন। পাঁচ শ' প্রবীন ও ভারিক্কী চেহারার প্রহরী এঁদের প্রহরায় নিযুক্ত থাকতো। শাদা চাঁদোয়ার নীচে উটের পিঠে চেপে বেগমদের পরিচারিকারা চলতো। হাতি ও উটের পিঠে পেটরায় সুরক্ষিত থাকতো বাধশাহী ধনরত্ন। অন্যান্য জিনিস পত্র, পানীয় ও খাদ্য দ্রব্য, আসবাবপত্র প্রভৃতি খচ্চরের পিঠে ও ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে থাকতো (†)।

* হাতী ও উটের পিঠে চাপিয়ে হাল্‌কা কামানের ব্যবহার পরবর্তী কালে হয়েছিল।

† পানীয় জল সম্পর্কে মুঘল বাধশাহদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আবুল ফজল 'আবদারখানা'র উল্লেখ করেছেন। আবদারখানার কর্মচারীদের কাজ ছিল উত্তম জল সংগ্রহ করা এবং তা' ঠাণ্ডা রাখা। হিমালয় থেকে বরফ আসতো। গঙ্গা, যমুনা ও চেনার নদী থেকে সীল করা জালায় পানীয় জল আনা হোত। বৃষ্টির জল জমিয়ে রেখে নদীর জলের সঙ্গে মিশিয়ে রান্নায় ব্যবহার্য জল পাওয়া

সম্রাট পরিবারভুক্ত লোকজন ছাড়া সকলকেই উর্দু বাজার থেকে খাদ্য দ্রব্য কিনতে হোত। খাদ্যদ্রব্যের দামও সস্তা। যে সব ব্যবসায়ী শস্তা মূল্যে সৈন্যদের নিকট খাদ্য শস্য বিক্রয় করতো সম্রাট তা'দের শুল্ক বা কর দেওয়া থেকে রেহাই দিতেন। এর ফলে শস্তা দরে খাদ্য দ্রব্য সর্বদাই পাওয়া যেত। কেউ যদি ন্যায্য-মূল্য অপেক্ষা বেশি দর চাইতো, তবে তা'র দণ্ড হোত।

প্রথম কয়েকদিন অভিযান বাহিনীর বিরাটত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। ক্রমশঃই এর আকার বৃদ্ধি পেলো। শেষটায় মনে হোত যে গোটা দুনিয়াই বুঝি মুঘল বাহিনীতে ছেয়ে গিয়েছে? দেড় মাইলেরও বেশি চওড়া জায়গা জুড়ে সম্রাট বাহিনীর চলার পথ বিস্তৃত ছিল।

আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা দেখে পাদ্রীরা আশ্চর্য হয়েছিলেন। এত লোকের জন্য এত শস্তায় বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য যে কিভাবে সংগৃহীত হতে পারে তা' কল্পনা করা যায় না। অভিজ্ঞ এবং কুশলী লোকদের যাত্রাপথের আশে পাশের শহর গঞ্জ ও ব্যবসায় কেন্দ্রগুলিতে আগে থাকতেই পাঠিয়ে দেওয়া হোত। পাইকারী ব্যবসায়ীরা যে সব খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসতো, যেমন গম ভুট্টা ডাল প্রভৃতি, সেই সব দ্রব্যের উপর কোনও কর আরোপিত হোত না।

এক একটি অঞ্চল অতিক্রম করার আগেই ঘোষক পাঠিয়ে পরবর্তী অঞ্চলে প্রচার করে দেওয়া হোত যে বাদশাহী ফৌজ দেখে

যেত। আকবর নিজে বেশি পরিমাণ জল খেতেন না, কিন্তু জল সম্পর্কে খুব সতর্ক ছিলেন।

জনসাধারণ যেন সন্ত্রস্ত না হয়। সৈন্যেরা জনসাধারণের কোনও ক্ষতি করবে না, জনসাধারণও যেন সম্রাট ও তাঁ'র বাহিনীর ক্ষতি হতে পারে এমন কোনও কাজ না করে। যাত্রাপথে যে সব দেশের সীমানা বা যে সব রাজ্য অতিক্রম করতে হোত, সেই সব অঞ্চলের অধিপতি ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ ক'রে সম্রাট আকবর খুব সখ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। পথের কোথাও যাতে জলের অভাব না হয়, সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হোত। বাহিনীর যাত্রাপথ নদীর নিকট দিয়েই, অথবা পর্বতের সানুদেশ বরাবর হোত। পার্বত্য পথ এবং অসমতল, জলা ও জংলী জমীকে বাহিনী চলার উপযোগী করার জন্য আগে থাকতেই কারিগর (*) ও পূর্ত বিভাগের লোকদের প্রেরণ করা হোত। আগ্রার শাসক যিনি ছিলেন, তাঁ'কেই এই যন্ত্রী বাহিনীর অধিনায়ক করা হয় (†)।

বড়ো বড়ো নদী পার হওয়ার ব্যাপারে সম্রাট একটি নিয়ম

---

* Sappers, Miners and engineers.

† এঁর নাম মহম্মদ কাসিম খাঁ। ইনি ছিলেন আকবরের শ্রেষ্ঠ মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার। আগ্রা দুর্গের নক্শা তৈরী ও নির্মাণ কার্য এঁরই তত্ত্বাবধানে হয়। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ইনি আগ্রার গভর্ণর হ'ন। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের গভর্ণর হন; সেই সময় ইনি সেখানে অনেক সামরিক রাস্তা নির্মান করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে এঁকে কাবুলের গভর্ণর করা হয়। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারা'ন। আগ্রার স্টেডিয়াম বা amphitheatre, যেখানে দর্শকরা বসে হাতীর পায়ের চাপে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর মৃত্যু দেখতো, তা'র পরিকল্পনা ও নির্মাণের কৃতিত্বও কাসিম খাঁনের।

জারী করেছিলেন। বড়ো নদীতে সেতু নির্মান করা সময় সাপেক্ষ এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা' বিপজ্জনকও বটে। সেই জন্য বড়ো নদী পার হওয়ার জন্য নৌকার ভাসমান সেতু নির্মিত হোত। পর পর নৌকা সাজিয়ে তার উপর কাঠের পাটাতন দিয়ে খড় ও শুকনো ঘাস বিছিয়ে রাস্তা তৈরী হোত। পাশাপাশি দুইটি উট বা ঘোড়াকে যেতে দেওয়া হোত না। এ ছাড়া আরও কড়াকড়ি ছিল। খুব ভারী বোঝা নিয়ে বা অনেক লোককে ভিড় ক'রে সেতুর উপর দিয়ে যেতে দেওয়া হোত না। হাতীগুলি সাঁতার কেটে পার হোত। সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধ ভাবেই অল্প মোট ঘাট নিয়ে মানুষ ও পশুকে সেতু পথে নদী পার হতে দেওয়া হোত।

এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রবেশ করার সময় যা'তে কোনও গুপ্ত অতর্কিত আক্রমণ করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে ছাউনী থেকে চারদিকেই আঠারো মাইল দূর অবধি পর্যবেক্ষক বাহিনীকে টহলদারীর জন্য পাঠানো হোত। বাহিনী গিরিপথে বা পর্বতের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময়ও পর্যবেক্ষক দল পাহাড়ের অনেকটা উপরে উঠে চারদিকে নজর রাখতো।

নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে আকবরের সমতুল্য মানুষ দেখা যায় না। সিন্ধু নদের তীরে যখন সম্রাটের ছাউনী পড়ে, তখন নদী পার হওয়ার উপযোগী অপেক্ষাকৃত অগভীর স্থান খুঁজে দেখার জন্য নদীর উজানে পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়। সম্রাট খবর পেয়েছিলেন যে অনেকটা উজানে এক জায়গায় নদী বেশ অগভীর। একটি লোককে সেই অগভীর জায়গা খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। লোকটি পঁচিশ মাইল এগিয়ে গিয়েও অগভীর জায়গা দেখতে পেলো না। আরও না এগিয়ে সে ফিরে এসে

জানালো যে নদী অনেক দূর উজানেও গভীর, সুতরাং সেতু নির্মান করতে হবে। ঘোড়া ও অন্যান্য পশু সাঁতার কেটে পার হতে পারবে ব'লে যা' ভাবা গিয়েছিল, লোকটার কথা শুনে বোঝা গেল যে সে রকম হবে না। সম্রাট তখন লোকটিকে সামনে ডাকিয়ে এনে নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি যে জায়গার কথা বলেছিলেন সে ততদূর গিয়েছিল কিনা। সম্রাটকে সে মিথ্যা কথা বলতে পারলে না, স্বীকার করলো যে সে ততটা দূর যায়নি। সম্রাট তখন লোকটিকে একটি মশকের (*) সঙ্গে বেঁধে জলে ভাসিয়ে দিতে হুকুম করলেন। লোকটাকে হাওয়া ভর্তি মশকের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হল। ছাউনীর লোকজন নদীর পারে ভিড় ক'রে এই মজার দৃশ্য দেখতে লাগলো; ওদিকে লোকটা প্রাণ রক্ষার জন্য চেঁচিয়ে কেঁদে সম্রাটের দয়া ভিক্ষা করতে করতে স্রোতের টানে ভাটির দিকে হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে চল্‌লো। লোকটাকে যখন সম্রাটের সোজাসুজি মাঝ দরিয়ায় দেখা গেল, সম্রাট তখন লোকটাকে তুলে আনার আদেশ দিলেন। তাকে মশকবন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া হোল বটে, কিন্তু সরকারী খাতায় তা'কে জল থেকে পাওয়া সম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (†) ব'লে চিহ্নিত করা হোল। ঐ লোকটাকে পরে কোনও এক সীমান্ত শহরে ক্রীতদাস হিসাবে

---

* রাস্তায় জল ছিটানোর জন্য ভিস্তিওয়ালার ব্যবহৃত চামড়ার থলি।

† জল থেকে পাওয়া, লুণ্ঠনে পাওয়া, বন্দী শত্রু, খনিজ দ্রব্যাদি, —সম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই নিয়ম সর্বদেশেই সর্বকালে প্রচলিত ছিল।

বিক্রয় ক'রে দেওয়া হয়। অবাধ্যতা ও গাফিলতীর জন্য আকবর এইরূপ কঠোর শাস্তিই দিতেন।

কাবুল অভিযানের জন্য আকবর পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী, পাঁচশ' হাতী (শুধু লড়াই করার জন্যই পাঁচশ, তা' ছাড়া মানুষ ও মাল বহনের জন্য আরও অনেক), বিস্তর উট এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য নিয়ে বাহিনী গঠন করেন। ঘোরসওয়ারদের বাহিনীতে মঙ্গোল, পারসিক, তুর্কমেনি, চাঘ্‌তাই, উজবেগ, কান্দাহারী, বালুচ, পাঠান এবং হিন্দু, —অর্থাৎ নানা ভাষা, নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আকবর হিন্দুদের সততা ও দক্ষতায় বিশেষ আস্থা পোষণ করতেন। কাবুল উপত্যকা ও হিরাটের অধিবাসী এমন অনেক লোকও সম্রাটের বাহিনীতে ছিল। সম্রাটের বডিগার্ড বা নিরাপত্তা বাহিনীতেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী লোক ছিল। এরা সর্বদাই আকবরকে ঘিরে' থাকতো। গোঁড়া মুসলমানরা সম্রাটের প্রতি মনে মনে বিরূপ হলেও প্রকাশ্যে কেউ তাঁ'র বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে সাহস পেতো না। তিনি ধর্মে ভ্রষ্টাচারী—এই দুর্নাম সত্ত্বেও ধর্মান্ধ মুসলমান কেউ তাঁ'র প্রাণনাশের চেষ্টা করে নি।

যুদ্ধের কৌশল বা রণনীতিও এক এক জাতির এক এক রকম ছিল। মঙ্গোল, পারসিক ও চাঘ্‌তাইদের রণনীতি গুজ্‌রাটি ও রাজপুতদের অনুসৃত রীতি নীতি থেকে পৃথক ছিল। গেড্রোসিয়ার (*) অশ্বারোহীদের বলা হয় রাজপুত; এরা এবং রাটি (†)

---

* প্রাচীন গ্রীক ভাষায় গুজরাটকে গেড্রোসিয়া বলা হোত।

† মোনসারেট লিখেছেন 'রাটি' সম্প্রদায়। প্রাচীন অভিধানে 'রাটি' শব্দে 'যুদ্ধ' লেখা হয়েছে। (হেমচন্দ্র)। অশোক অনুশাসনে রাঠিক (সংস্কৃত —রাষ্ট্রিক) শব্দের দ্বারা মারাঠা জাতিকে বোঝানো হয়েছে

অশ্বারোহিরা গাধার সাইজের ছোট ছোট ঘোড়ায় চড়ে' যুদ্ধে যায়। যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ছোট বল্লম হাতে নিয়ে শত্রুর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করে। ছোট আকারের ঢালও এদের হাতে থাকে। মুসলমানরা বলে যে রাজপুত ও রাটি যোদ্ধারা মরতে জানে, মারতে জানে না। বালুচ সৈন্যেরা উটের পিঠে চড়ে' তীর ধনুক নিয়ে লড়াই করে। হিন্দুরা শিক্ষিত হাতি নিয়ে আক্রমণ করে। ভারতের প্রত্যেক শহরে এবং সামরিক বাহিনীতে যুদ্ধার্থে শিক্ষিত হাতী প্রচুর দেখা যায়। মাল-বহন ও শত্রু-আক্রমণ,—দুই বিষয়েই হাতীকে দক্ষ ক'রে তোলা হয়। অবশ্য, স্ত্রীহাতী দিয়েই মাল বহনের কাজ করানোই সাধারণ রীতি; পুরুষ হাতীদেরই যুদ্ধের জন্য তৈরী করা হয়। যুদ্ধার্থে নিয়োজিত হাতীদের গায়ে বর্মের মতো আবরণ থাকে। বর্ম্ম থাকুক বা নাই থাকুক, একবার লড়াইএর স্বাদ পেলে এরা হিংস্র হয়ে উঠে। শত্রুকে পদতলে পিষ্ট ক'রে নিষ্প্রাণ না ক'রে এরা নিরস্ত হয় না। শুঁড় দিয়ে শত্রু সৈন্যের এক পা জড়িয়ে ধ'রে অন্য পায়ের উপর চাপ দিয়ে রেখে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরা পা শরীর থেকে ছিঁড়ে ফেলে। এই নৃশংস দৃশ্য যে একবার দেখেছে, সারা জীবনেও সেই দৃশ্য সে ভুলতে পারে না। পুরুষ হাতী বছরে তিন মাস পাগ্‌লা হয়। এই সময়ই এদের যুদ্ধে

বলে' অনেক মনে করেন। মোনসারেটের ভাষ্যকার ব্যানার্জী মনে করেন 'রাটি' 'রাঠোর' শব্দেরই রূপান্তর; কারণ রাঠোর ও রাজপুতদের (এবং প্রাচীন গুজরাটিদের) রণকৌশল অনেকটা একই রকম ছিল, মারাঠা অশ্বারোহীদের রণকৌশল থেকে তা'র ধরন অন্যরকম।

নিয়ে যাওয়া হয়। তিন মাস পাগ্‌লা থাকার পর ক্রমশঃ এরা শান্ত হয়ে আসে। যুদ্ধে নামাবার আগে এদের খাদ্যের সঙ্গে বেড়ালের মাংস মিশিয়ে দেওয়া হয়। কামানের বারুদে অগ্নি-সংযোগ করলে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও আওয়াজ হয়, যুদ্ধের হাতী তা'তে ভয় পায় না। সম্রাটের এই অভিযান বাহিনীতে এরূপ হাতীর সংখ্যা পঞ্চাশ। অগ্রগামী সৈন্যবাহিনীর ঠিক পিছনে এদের রাখা হয়। হস্তী-বাহিনীর শিক্ষণ ও পরিচালনে হিন্দুদের নিয়োগ করা হয়। দড়ির গিঁট ও জট এরা শুঁড় দিয়ে খুলতে পারে, এক জায়গা থেকে শুঁড়ে জড়িয়ে নিয়ে মোটঘাট অন্যত্র নিয়ে যেতে পারে, ভারী ও বৃহদাকার দ্রব্য ঠেলে ঠেলে অনেক দূর অবধি নিয়ে যায়। এমন কি, দুপায়ে ভর ক'রে এদের নাচতেও শেখানো হয়। শিক্ষক ও মাহুতের নির্দেশে এরা হরেক রকম কাজ করতে শেখে। রাটি যোদ্ধাদের কথা আগেই লিখেছি। মঙ্গোল, পারসিক, পার্থিয়ান প্রভৃতি জাতির রণকৌশল প্রধানতঃ ভীতির সঞ্চার করে। দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে এরা শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পরে বিকট চিৎকার ক'রে আক্রমণ করে। অব্যর্থ এদের লক্ষ্য সন্ধান; অনেক দূর থেকে দ্রুতবেগে এসেও এরা শত্রুর চোখে, এমন কি দুই ভ্রুর মাঝখানে বল্লম চালিয়ে দিতে পারে।

অন্যান্য বাহিনীর তুলনায় অশ্বারোহী বাহিনীই শ্রেষ্ঠ ছিল। অশ্ব এবং অশ্বারোহী, দুইই যাতে সুস্থ ও সতেজ থাকে সে দিকে সম্রাটের তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কোন ত্রুটিই তিনি এ বিষয়ে সহ্য করতেন না। অশ্বারোহী বাহিনীই যে মুঘল সম্রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ উপদ্রব দমনে সবিশেষ কার্যকরী ছিল,

এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। রাজকোষ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার অশ্বারোহী, পাঁচ হাজার হাতী এবং বহু সহস্র পদাতিক সৈন্যের বেতন ও ভরণ পোষণের ভাতা দেওয়া হোত। এছাড়া সামন্তপ্রথানুসারে বিশিষ্ট ওম্‌রাহ্‌দেরও প্রত্যেককেই এক একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য রাখতে হোত এবং সম্রাটের প্রয়োজনে তা'দের নিয়োজিত করা হোত। যুদ্ধে বিজিত অঞ্চলের শাসন ও কর সংগ্রহের ভার দেওযা হোত ওমরাহদের; বিনিময়ে তা'রা সম্রাটকে নির্দিষ্ট হারে নজরাণা ও সংগ্রহীত করের অংশ দিত। এই অধিকার বংশানুক্রমিক ছিল না; সম্রাটের মর্জিমাফিক তা' নিয়ন্ত্রিত হোত। এই সব আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের বলা হয় 'সুবাহ্‌দার'। যাতে এরা শাসন ব্যাপারে যথাযথ কর্তব্য পালন করে, সম্রাটের সম্মান প্রতিপত্তি ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ও তা' বজায় রাখে, সে দিকে আকবর সতর্ক ছিলেন। সাম্রাজ্যের যাবতীয় অঞ্চলের বিভিন্ন সেনাবাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব সম্রাটের হাতে থাকলেও মুঘল সামরিক নীতি অনুযায়ী তা' বিভিন্ন আঞ্চলিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক আঞ্চলিক গোষ্ঠী এক একজন সেনাপতির অধীনে ছিল। কোন আঞ্চলিক সেনাপতির মৃত্যু হ'লে তা'র পুত্রই পিতার পদাধিকারী হোত। কিন্তু, সুবাহদারকে একই অঞ্চলে দীর্ঘকাল রাখা হোত না। এর কারণ হচ্ছে যেন তা'রা একই অঞ্চলে দীর্ঘকাল থেকে স্থানীয় বর্ধিষ্ণু লোকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সম্রাটের ক্ষতি সাধন করতে না পারে।

মথুরা

ফতেপুর সিক্রি ছেড়ে আসার পরে সম্রাট বাহিনী মথুরায় পৌঁছল। কুসংস্কারপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মচেতনার প্রারম্ভকাল থেকেই মথুরা হিন্দুদের নিকট একটি বিশিষ্ট নগরীরূপে পরিগণিত। কথিত আছে যে কৃষ্ণ এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করে। কৃষ্ণকে বিষ্ণু নামেও অভিহিত করা হয়। এই নগরীতে এবং এর আশে পাশে অনেক মন্দির আছে। এই সব মন্দির যে সব স্থানে অবস্থিত, সেই সব স্থানে কৃষ্ণ কোনও না কোনও অলৌকিক কাজ করেছিল, এই রকম বিস্তর ছেলে-ভুলানো গল্প প্রচলিত আছে। এই সব মন্দিরের আকৃতি পিরামিডের মতো, প্রশস্ত ভিত্তির উপর ক্রমশঃ হ্রস্বায়তন হয়ে সূক্ষ্মাগ্র শীর্ষদেশে পর্যবসিত। মন্দিরগুলির গড়ন খুব মার্জিত। সব মন্দিরই পূবদুয়ারী, সূর্যের আলোয় বিগ্রহের মুখমণ্ডল উদ্‌ভাসিত হয়ে থাকে।

সমগ্র ভারতেই হিন্দুরা কৃষ্ণকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে এবং পরমেশ্বর বলে। এই দেবতার দুই ভাই : মহেশ্বর ও ব্রহ্মা। এদের এক ভগিনী আছে, তাঁর নাম সতী। সতীর জন্ম হয় পরমেশ্বরের কপাল থেকে, —মাতৃগর্ভ থেকে নয়। মহেশ্বরের সঙ্গে সতীর বিবাহ হয়। ইয়োরোপেও এই ধরনের গল্প প্রচলিত আছে; কিন্তু ইয়োরোপের মহাকাব্যে ও শাস্ত্রে জুপিটার নেপচুন মিনার্ভা প্রভৃতি দেবদেবীকে আকাশ বিহারী অশরীরি রূপে কল্পনা করেছে, পরন্তু সৃষ্টির মূল উপাদান রূপেই এদের বর্ণনা করেছিল। ভারতীয়রা বলে যে এসব অলীক কল্পনা, অপরিণত জ্ঞানই ইয়োরোপীয় অলীক কল্পনার কারণ। প্রাচীন এথিনিয়ানরাও মনে করতো রেসারেকশন্ —খৃষ্টের পুনরাবির্ভাব—কোনও এক নতুন দেবী! সাধু পল্ এই নতুন দেবীর প্রচার করছেন!

ব্যাবিলনে তৃতীয় শতাব্দীতে মনি সম্প্রদায়ও ভারতীয়দের মতো·· বিশ্বাস করতো যে প্রকৃতির শক্তির প্রকাশকেই দেব দেবী রূপে কল্পনা করা হয়।

ব্রাহ্মণ্য মতবাদীরা বিশ্বাস করে যে কৃষ্ণ নয়বার জন্ম গ্রহণ করেছিল। প্রথম বার বীভৎস সামুদ্রিক দানব রূপে, দ্বিতীয় বার কচ্ছপ রূপে, তৃতীয় বার নোংরা শূকর, চতুর্থবার ছিল শরীরের উপরাংশ মানুষের মতো এবং নিম্নাংশ সিংহের মতো। পঞ্চমবার সে জন্মেছিল বেঁটে বামন হয়ে, ভিখারীর মত ভিক্ষা করতো। ষষ্ঠ জন্মে যোদ্ধারূপে দেখা দিয়েই স্বর্গে অদৃশ্য হয়ে গেলো। সপ্তম জন্মে সে গোপালকের পেটে লুকিয়ে ছিল, জন্মের পর চুড়ি ও আংটি বিক্রেতার ছদ্মবেশে তা'র মাতুলকে বধ করেছিল। অষ্টম জন্মে সে রাজা হয়ে জন্মেছিল এবং ৪৬৭৩ বৎসর রাজত্ব করেছিল। নবম বার জন্ম গ্রহণ করেছিল কৃষক হয়ে; অবিশ্বাসীদের তরবারি দিয়ে হত্যা করেছিল। বাল্যকালে কৃষ্ণ অতিশয় চঞ্চল, ছিঁচকে চোর ও মিথ্যেবাদী ছিল। এক পশুপালকের বাড়ী থাকতো এবং দুধ, ঘি ও পনীর চুরি করতো। ধরা পড়লে সে চুরীর কথা অস্বীকার করতো। মেয়েরা যখন নদীতে স্নান করতো কৃষ্ণ তখন তাদের জামা কাপড় চুরি করতো। প্রতিবেশীদের বাসন ও তৈজসদ্রব্য চুরি করতো। বাছুরের বাঁধন খুলে নিত এবং তা'রা এদিক ওদিক দৌড়ে পালাতে থাকলে গৃহস্বামীরা যে অসুবিধায় পড়তো তা'তে সে খুব মজা পেতো। এটা ওটা চুরি করে' হাত পাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সে আটটি বিবাহিতা স্ত্রীলোককে স্বামীদের হেফাজত থেকে চুরি করেছিল, এবং শঠতা করে' আরও ষোল হাজার স্ত্রীলোককে ভুলিয়ে স্ববশে এনেছিল। পূর্বোক্ত মন্দিরগুলি এই রকম সব ঘটনার স্মারক রূপেই নির্মিত হয়েছে। ব্রাহ্মন

ও সাধারণ ভারতীয়রা যে কতো নির্লজ্জ তা'র প্রমাণ পাওয়া যায় কৃষ্ণ উপাখ্যানে। বিখ্যাত বাগ্মী সিসেরো একবার বলেছিলেন, 'ভারত অপেক্ষা বর্বর দেশ কি কোথায়ও আছে?'

ভারতের অলীক দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ হওয়ার দরুন মথুরাও ভারতের যাবতীয় শহরের মধ্যে প্রধান। ইয়োরোপে যেমন রোম, ভারতেও তেমনই মথুরা। এক কালে এই সুবিস্তীর্ণ শহরে অতি সুন্দর বড়ো বড়ো বাড়ী ছিল, চওড়া ও উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল সেই সব বাড়ী। এখনকার ধ্বংসাবশেষ সেই গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে। ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে অতীব সুন্দর প্রস্তরে খোদিত মূর্তি ভাস্কর্য। অসংখ্য হিন্দুমন্দিরের মাত্র একটিই মুসলমানদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছে। মন্দিরের পিরামিড্‌সদৃশ শিখর খুবই মনোরম। যমুনার তীরবর্তী এই মন্দিরে ভারতের সবপ্রান্ত থেকে অসংখ্য তীর্থযাত্রী এসে থাকে। প্রত্যেক পুরুষ মানুষকে চুল ও দাড়ি কামিয়ে এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোককে চুল ও ভ্রূ কামিয়ে তবে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়, এরকম কেশ মুণ্ডন না করলে ব্রাহ্মণরা কাউকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয় না। নদীতে ডুব দিয়ে পাপ স্খালন করতে হয়। সে এক অসাধারণ দৃশ্য। তিন শতেরও অধিক সংখ্যক নাপিত অতিশয় ক্ষিপ্রগতিতে অথচ বেশ শালীনতাব সহিত অগনিত নরনারীর মাথা কামিয়ে দিচ্ছে। পুণ্যার্থী নরনারী এক কোমর জলে ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে ক্ষৌরকর্মের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। নারী পুরুষ সকলেই একই ঘাটে স্নান করে, কিন্তু কোথায়ও কোনও অশালীনতা দেখা যায় না। শয়তানই এদের বিবেক নিয়ন্ত্রিত করে সন্দেহ নেই। ধর্মস্থানে একবার ডুব দেওয়ার পর এই সব নরনারী জীবনের বাকী সময় পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু হায়!

প্রকৃত পাপ যে কী তা'এরা জানে না।

মথুরা থেকে মাইল ছয়েক দূরে একটি মন্দির আছে, এর নাম 'হনুমানের মন্দির'। তিন শতাধিক বানর এখানে আছে। ব্রাহ্মণ পূজারীরা ঘণ্টাধ্বনি করলে এরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে লাঠি হাতে নিয়ে যুদ্ধের অভিনয় করে। পুনরায় ঘণ্টার আওয়াজ শুনে যুদ্ধ বন্ধ করে। ঘণ্টার শব্দ শুনে বানরেরা খেতে আসে। পূজারীরা বলে যে এই সব বানর হনুমানের শিষ্য। অনেকদিন ধরে' যে এদের শেখানো হয়েছে সে কথা স্বীকার করে না। হনুমান হচ্ছে ব্রাহ্মণদের দেবতা,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ভাই। হনুমানের জন্মের আগে এর মা পাহাড়ে বসে তপস্যা করছিল, তখন পরমেশ্বরের ঔরসে এর জন্ম হয়। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করলো এই শিশুর পিতা কে? -ওর মা বল্লো বায়ু এর পিতা। বায়ু কিন্তু তা' স্বীকার করলো না। ঝড়বৃষ্টি নিয়েই বায়ু মেতে থাকে, পর্বতের গুহায় এক এক সময় শ্রান্ত হয়ে চুপ করে' থাকে, সন্তানের দায়িত্ব নিতে সে রাজী নয়। বায়ু জানালো যে মহেশ্বরই এই শিশুর জনক। মহেশ্বর বললেন যে এই শিশু যা'র বাড়ীতে যাবে সেই গৃহস্থের কোন অমঙ্গল হবে না। কিম্বদন্তী এই যে দেবতা ও দানবদের যুদ্ধের সময় হনুমান দেবতাদের সাহায্য করেছিল। আকবরও এই গাঁজাখুরি গল্পে বিশ্বাস করতেন। একজন বুজরুগের পরামর্শক্রমে দেবতাদের নামের তালিকায় হনুমানের নামও তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

দিল্লী

মথুরার ছয়দিন পরে সম্রাটের বাহিনী দিল্লী পৌঁছল। যমুনার তীরবর্তী এই শহর খুব প্রাচীন বিরাট, ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকে

পরিপূর্ণ। এককালে এখানে খৃষ্টান সম্রাটরা ভারতের রাজধানী স্থাপন করেছিল। খৃষ্টান সাম্রাজ্যের পতনের পর এখানে পাঠানরা তা'দের রাজধানী স্থাপন করেছিল। আকবরের পিতা হুমায়ুন এই শহরটি পছন্দ করতেন। তিনি এই শহরেই সারাজীবন কাটিয়েছিলেন এবং এখানেই তা'র মৃত্যু হয়। পিতার সমাধীর উপর আকবর একটি হর্ম্য নির্মাণ করেছিলেন। কাবুলের গভর্ণর মীর্জা হাকিমের মা যুজক বেগম এই সমাধি দেখাশুনা করতেন। সমাধি হর্ম্যের চারপাশে সুন্দর ফুলের বাগান আছে (*)।

দিল্লীতে অনেক সরকারী বাড়ীঘর আছে। হুমায়ুনের সময় নির্মিত অনেক মস্‌জিদ আছে; এর একটি তৈরী হয়েছিল ফিরোজ শাহ্ তুঘলক নামক পাঠান সম্রাটের রাজত্বকালে। শাদা মার্বেল পাথরে তৈরী, মস্‌জিদের ভিতরে সর্বত্র উৎকৃষ্ট পালিশের কাজ। শোনা যায় যে চুনের সঙ্গে জলের বদলে দুধ মিশিয়ে মস্‌জিদের চুনকাম হয়েছিল। মেঝে ও দেওয়াল আয়নার মতো চক্‌চক্ করছে। এতো বাড়া ইমারত, অথচ কোথায়ও

---

* এ তথ্য ঠিক নয়। মীর্জা হাকিমের মা নয়, হুমায়ুনের অন্য এক স্ত্রী হাজি বেগমই হুমায়ুনের সমাধি দেখা শুনা করতেন। কবরের অদূরে তাঁ'র জন্য একটি বাড়ী তৈরী হয়েছিল; হাজি বেগম সেখানে আমরণ ছিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় সুগন্ধি প্রদীপ জ্বালিয়ে ও কবরের উপর ফুল ছড়িয়ে এই বেগম সারাজীবন স্বামীর স্মৃতি অমলিন রেখেছিলেন। পাদ্রী তাঁর প্রসংসা করেছেন। বেগম সাহেবা যদি খৃষ্টান হতেন, তবে হয়তো পাদ্রী তাঁ'র এই কাহিনীকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেমের কাহিনী রূপে আখ্যাত করতেন।

একটি চিড় বা দাগ দেখা যায় না। এমন নিখুঁত এর নির্মাণ কাজ। ফিরোজ শাহ তুঘ্‌লক দানশীল ও জনহিতকামী নরপতি ছিলেন। রাজপথের দুইপাশে বৃক্ষরোপণ, এক ক্রোশ অন্তর কূপ খনন, মস্‌জিদ ও সরাইখানা স্থাপন প্রভৃতি সৎকর্মের জন্য তিনি বিখ্যাত। নদী ও খালের উপর সেতু নির্মাণ ক'রে যাতায়াতের পথের উন্নতি সাধন করেন। দিল্লী থেকে তিন মাইল দূরে একটি সুন্দর প্রসাদ তৈরী ক'রে তা'র সামনে একটি স্তম্ভ স্থাপন করেন (*)। একটি অখণ্ড মার্বেল পাথরে তৈরী এই স্তম্ভটি উচ্চতায় ত্রিশ ফুট, এবং এর ব্যাস পাঁচ ফুট। পুরানো দিল্লীতে ইনি একটি সুড়ঙ্গ নির্মাণ করেন, যা'র দৈর্ঘ্য হচ্ছে চল্লিশ ষ্টাডিয়া (†)। এই সুড়ঙ্গটি পুরানো দিল্লীর একটি প্রাসাদের সঙ্গে সম্বন্ধ। অতীতকালে খৃষ্টান সম্রাটরা এই প্রসাদে বাস করতেন (‡)।

---

* সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত অন্যতম 'অশোক লাট'।

† ইংরেজী মাপে ৬০৬ ফুট ৯ ইঞ্চি।

‡ মোন্‌সারেট তাঁ'র ডায়েরীতে অনেক বার ভারতে খৃষ্টান রাজত্বের কথা বলেছেন। তিনি যে সব কাহিনী কিম্বদন্তী প্রভৃতি শুনেছিলেন তাতে মনে হয় যে বহিরাগত কোনও গোষ্ঠি নয়, তাতার, পাঠান বা হিন্দুও নয়, এমন কোনও ধর্মাবলম্বী রাজবংশ ভারতে প্রাক্‌ মুস্‌লিম আমলে রাজত্ব করতো। আকবরের পূর্বপুরুষদের তথাকথিত এক ইতিবৃত্ত লিখতে গিয়ে (এই অংশটি বর্তমান অনুবাদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে) মোন্‌সারেট্‌ বলেছেন যে চেঙ্গিস্‌ খাঁর আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে ভারতের খৃষ্টান রাজা ডেভিড্‌ কারাকোরাম অঞ্চলে পলায়ন ক'রে সেখানেই নতুন ক'রে রাজ্যপত্তন করেন। কাশ্মীর, লাদক, বাল্‌খ্‌ প্রভৃতি অঞ্চলে এমন কয়েকটি দেবায়তনের

দিল্লীতে অনেক বিত্তবান ব্রাহ্মণ বাস করে। মুঘলদের একটি বড়ো সৈনিক আবাসও এখানে আছে। বিশিষ্ট নাগরিকদের সুরম্য ও সুসজ্জিত বাসভবন নগরীর শোভা বর্ধন করছে। প্রত্যেকটি বাড়ীর দেওয়াল সুরঞ্জিত ও ঘরের ভিতর ফ্রেস্কো ও চিত্রে শোভিত। শহরের নিকটেই পাথর ও চুন অপর্যাপ্ত পাওয়া যায়, তাই দিল্লীতে সুনির্মিত বিরাট ও বহুতল বিশিষ্ট প্রাসাদ ও বাসগৃহের অভাব নেই। হুমায়ুন স্থাপত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাই মুসলমান্ অধ্যুষিত অন্যান্য শহরের তুলনায় দিল্লীতে স্থাপত্যের সমারোহ ও প্রাচুর্য বেশী। বড়ো রাস্তার মাঝখানে সারি সারি গাছ, দুপাশের চলার পথ ছায়াচ্ছাদিত। যমুনার দুই পারেই নয়নাভিরাম উদ্যান, তৃণাচ্ছাদিত মাঠ ও বাগান-ঘেরা বাড়ী। দিল্লীর জলবায়ু ভালো পুরানো দিল্লীতে অনেক ভগ্ন প্রাসাদ দেখা যায়। এককালে* শহর আরও উন্নত ছিল মনে হয়।

দিল্লী ছাড়িয়ে

দিল্লী ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে আঠাশ মাইল পরে রাজকীয় বাহিনী শোনপেট পৌছল। এটি একটি ছোট শহর; কিন্তু তরোয়াল, বল্লম প্রভৃতি শানিতাস্ত্র তৈরীর জন্য প্রসিদ্ধ।

---

* ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে যা' খৃষ্টীয় আদলে তৈরী। এই সব দেবায়তন আদি খৃষ্টানদের গীর্জা, না বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহার তা' সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি। পাদ্রীর ডায়েরীতে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের উল্লেখ নেই। মোন্সারেট কি খৃষ্টান রাজা বলতে কোনও অতীত ও অজ্ঞাত বৌদ্ধ রাজত্বের কথাই বলেছেন ?

হিমালয় পর্বত এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়, সেখানে কোনও কোনও জায়গায় লোহের খনি আছে। আকর লৌহপিণ্ড গালিয়ে উৎকৃষ্ট ইস্পাতে পরিণত করার উপযুক্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগর শোনপেটে অনেক আছে (*)।

শোনপেটে পৌঁছবার পরের দিন মীর্জা হাকিমের উদ্দেশ্যে লিখিত শাহ্ মনসুরের এক চিঠি আকবরের হাতে পড়ে। এই নিয়ে তিনবার শাহ্ মনসুরের অপকর্মের নিদর্শন পাওয়া গেল। সম্রাট অবিলম্বে শাহ্ মনসুরকে বন্দী করতে আদেশ দিলেন।

শোনপেটের পঁচিশ মাইল পরে পাণিপথ। এখানে বাহিনীর যাত্রা স্থগিত রাখা হোল না। পথের দুই পাশের বাড়ীর ছাদ বারান্দা ও জানালা থেকে উৎসুক মহিলারা সম্রাটের গায়ে রাশি রাশি ফুল ছুঁড়ে অভিনন্দন জানালো। পাণিপথের পর কার্ণাল তা'র পর যমুনার একটি উপনদী পার হয়ে তিন দিন পর থানেশ্বর। নদীটির উপর পাথরে তৈরী সেতু ছিল। থানেশ্বরে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করে। এর পর শাহ্‌বাদ। শাহ্‌বাদে সম্রাট তাঁ'র দেহরক্ষী বাহিনী, জনাকয়েক বিশিষ্ট সেনানায়ক এবং ফাঁসী দেওয়ার কাজে অভিজ্ঞ লোকদের থামতে বললেন। সমগ্র বাহিনীই চলা বন্ধ করলো। তারপর সম্রাটের নির্দেশক্রমে আবুল ফজল উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট শাহ্ মনসুরকে

---

* মধ্যযুগের ইয়োরোপে বিখ্যাত 'দামাস্কস্ ইস্পাত' ভারতেই উৎপাদিত হোত। প্রাগৈতিহাসিক ইয়োরোপীয় বন্য ও যাযাবর মনুষ্য গোষ্ঠি যখন সমাজ গঠন করতে শেখেনি, মালাবারে তখন উৎকৃষ্ট লোহার করাত দিয়ে শাঁখ কাটা হোত, সমুদ্রগামী জলপোতে লোহার কীলক ও ধাতুনির্মিত গজুই লাগানো হোত।

শৈশব কাল থেকে সম্রাট আকবর কি পরিমাণ সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন, জীবনে উন্নতির পথে কতোটা এগিয়ে দিয়েছেন তা'র সবিস্তার বর্ণনা দিলেন। তার পর শাহ্ মনসুরকে বিশ্বাসঘাতকতা, রাজদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্রের প্রমাণগুলো প'ড়ে শোনানো হোল এবং পূর্বোক্ত চিঠিগুলি দেখানো হোল। শাহ্ মনসুর আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না। তখন তাঁ'র অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ফাঁসীর আদেশ দেওয়া হয়। শাহ্ মনসুরের গলায় দড়ি বেঁধে ফাঁসী কাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হোল। সমস্ত ব্যাপারটা এমন যুক্তিপূর্ণ ভাবে হোল যে কারোই মনে সন্দেহের ছায়াপাত হয় নি। সকলেই স্বীকার করলো যে রাজদ্রোহীর শাস্তি ন্যায় সঙ্গতই হয়েছে। ফাঁসী দেওয়ার পর যে যা'র নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলো। সম্রাটের গম্ভীর ও বিষাদপূর্ণ মুখের চেহারা দেখে কারোই বুঝ্তে বাকী রইল না যে তিনি নিতান্ত কর্তব্যবশেই শাহ্ মনসুরের প্রাণ দণ্ডাদেশ দিয়েছেন। এই ফাঁসীর ফলে সম্রাটের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটলো। শাহ্ মনসুরের ফাঁসীর খবর পেয়ে মীর্জা হাকিম খুব মুষ্ড়ে পড়েন এবং কি উপায়ে আকবরের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পারেন তা' চিন্তা করতে লাগলেন।

সম্রাট বাহিনী শাহ্বাদ ছাড়িয়ে ক্রমাগত উত্তর দিকে চলে' কুমায়ুন গিরিমালার নিকটবর্তী হোল। পথিমধ্যে ঝড় বৃষ্টির জন্য দুই দিন অভিযান স্থগিত রাখা হয়। ঝড় থেমে সূর্য উঠলে উত্তর পূর্ব দিকে হিমালয়ের তুষার মণ্ডিত শিখরদেশ দৃষ্টি গোচর হোল। বাহিনী বাঁয়ে মোড় নিয়ে আম্বালা শহরে প্রবেশ করলো। এই শহরের নিকটে এক সমতল মাঠে আকবরের পিতা হুমায়ুন পাঠানদের পরাজিত করেছিল। দুইটি খাড়া পাহাড়ের

সংকীর্ণ অগ্নিভ্যকায় তাঁ'দের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বচুকাটা করা হয়।

বাহিনীর সঙ্গে যে পাদ্রীটি ছিলেন তিনি মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গেই মিশতেন, এবং যথাসাধ্য তা'দের সেবা করতেন। এইটাই তিনি যাজক রূপে এবং যেশুইট্ সঙ্ঘের সদস্যরূপে তাঁ'র কর্তব্য ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। আকবরের এক প্রিয় বৃদ্ধ মুসলমান গণৎকার ছিল। তিনি স্বীকার করতেন যে মহম্মদ-প্রবর্তিত নীতি অনুশাসন প্রভৃতি অপেক্ষা খৃষ্টের অনুশাসন শ্রেয়ঃ। মুসলমানরা একথা মানতে রাজী নয়, কিন্তু সম্রাট তাঁ'র সৎসাহসের জন্য জন্য খুব প্রীত হ'ন। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে এই বৃদ্ধ জ্যোতিষী বলেন যে জাহান্নমে যে সব শয়তান আছে, তা'দের অনেকে মহম্মদের অনুশাসন মেনে চলে, কিন্তু বাকী অন্যরা তা' মানে না। পাদ্রী জানতে চাইলেন জাহান্নমে খৃষ্টান শয়তান আছে কি না। বৃদ্ধ বললেন, 'না, জাহান্নমে কোনও খৃষ্টান শয়-তান নেই। ওখানকার সকলেই ঘোরতর খৃষ্ট-বিরোধী। ওদের অনেকেই মহম্মদের প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করে, কেননা মহম্মদ মূর্ত্তি-পূজার অবসান ঘটিয়েছিলেন। অন্য যা'রা মহম্মদের পক্ষপাতি, তাঁরা মহম্মদকে অনুসরণ করে এই কারণে যে তিনি বাধাহীন কামপ্রবৃত্তি ও অন্যান্য অপরাধ অনুমোদন করেছেন। সকলেই খৃষ্টবিরোধী এই জন্য যে খৃষ্ট মূর্তি পূজা ও কামপ্রবৃত্তি তুইই নিষিদ্ধ করেছিলেন।

কৌতূহলপরবশ হয়ে অনেক হিন্দুও পাদ্রীকে দেখতে আসতো। এরা পাদ্রীদের ধর্মমত বিশ্বাস করতো না, ট্রিনিটি ও মুক্তির খৃষ্টিয় তত্ব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতো,—যদিচ এরা নিজেরাই ধর্ম সম্পর্কে ঠাকুরমার উপকথার মতো আজগুবি বিষয়ে আস্থা পোষণ করতো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা

যায় যে এরা বিশ্বাস করতো যে মানুষ ফুল থেকে জন্ম নিতে পারে। এই সব ফুল শুধু সুন্দর ও শ্বেতবর্ণই নয়, পরন্তু রক্তবর্ণের গাল প্রভৃত জ্ঞান ও বহুবিধ গুণও এই সব ফুলে পাওয়া যায়। এরা বলে যে ইয়োরোপে এইভাবে জন্মেছে এ রকম অনেক মানুষ আছে; তা'দের পিতা মাতা নেই, এবং তা'দের উৎপত্তি সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না।

আম্বালার দুইদিন পর সিরহিন্দ শহর (*)। শহরের পূর্ব প্রান্তে সম্রাটের ছাউনী পাতা হোল। কথিত আছে যে এখানে এক রাজা সিংহের সঙ্গে লড়াই ক'রে জয়ী হয়েছিলেন। ভারত ও লাহোর রাজ্যের সীমানায় এই শহর অবস্থিত। শহরটি বেশ বড়ো, এবং বিভিন্ন মহল্লায় বিভক্ত। এখানে একটি বড়ো চিকিৎসা-শিক্ষণ কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্নাতকরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিয়োজিত আছেন। সিরহিন্দে প্রস্তুত তীর, ধনুক, জুতা ও চপ্পলেরও খুব চাহিদা। শহরের পাশেই

---

* সিরহিন্দ বা হিন্দুস্থানের সীমানার শহর সম্পর্কে কানিংহাম তাঁ'র Ancient Geography of India গ্রন্থে লিখেছেন যে গজনীতে মুস্লিম রাজত্ব শুরু হওয়ার সময় থেকেই গজ্নীর মুস্লিম্ রাজা ও লাহোরের হিন্দু রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত ব'লেই এই শহরের নাম দেওয়া হয় 'শহর হিন্দ্'। মোন্সারেটের ভাষ্যকার ব্যানার্জী লিখেছেন যে কানিংহামের এই সিদ্ধান্ত হয়তো ঠিক নয়। বরাহ-মিহির এই নগরের অধিবাসীদের 'সৈরিন্ধ' বা সিরিন্ধের অধিবাসী ব'লে উল্লেখ করেছেন। বরাহমিহির কুলু উপত্যকার লোকদের 'কুলুট' অভিধা দিয়েছেন। পরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙ্ লিখেছেন, 'কুলু উপত্যকার একপাশে ব্রহ্মপুর (হরিদ্বারের উত্তরে), অন্য পাশে সিরিন্ধ্ নগর'।

বেশ বড়ো একটি দীঘি আছে; বর্ষার সময় তা'তে জল ধ'রে রাখা হয়। শহরের সম্বৎসরের জলের চাহিদা সেখান থেকেই মেটানো হয়। এই দীঘির মাঝখানে একটি পাথরে তৈরী স্তম্ভ আছে, নৌকা চ'ড়ে সেখানে যাওয়া চলে। ইজিপ্টের মেম্‌ফিস্ শহরের কথা সিরহিন্দে এলে মনে পড়ে। উন্মুক্ত সমতল ভূমিতে সিরহিন্দ, অনেক গাছ ও বাগিচা এই শহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে।

সিরহিন্দ থেকে বেড়িয়ে সম্রাট এই শহরেরই উপকণ্ঠে পৌঁছলে খবর পেলেন যে মীর্জা হাকিম পশ্চাদপসারণ করছে। এই সংবাদ পেয়ে সম্রাট এত উৎফুল্ল হলেন যে পাদ্রীদের ডেকে এনে তা' না শুনিয়ে পারলেন না। এতদিন তিনি কেবলই যুদ্ধের চিন্তা করছিলেন, সর্বদাই তাঁর মুখে চোখে চিন্তার ছাপ দেখা যেতো। হাকিমের পিছু হটবার সংবাদ পাওয়া ইস্তক তাঁ'র খুশীর আর সীমা রইলো না। দুই ঘোড়ায় টানা গাড়ী হাঁকিয়ে তিনি প্রায়ই প্রমোদ ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়তেন।

মচ্ছিওয়ারা গ্রাম (*) অতিক্রম ক'রে সাত্‌লেজ্ নদীর তীরে সম্রাট বাহিনীর শিবির পাতা হোল। নদী পার হওয়ার জন্য কাঠের সেতু নির্মিত হোল; এই জন্য বাহিনীকে কিছুটা অপেক্ষা করতে হয়। নদী পার হয়ে সম্রাট পশ্চিম দিকে শতদ্রু ও সিন্ধু নদের সঙ্গমের অভিমুখে চলার হুকুম দিলেন। নদী এখানে পশ্চিম-প্রবাহিনী। নদীতে অনেক কুমীর আছে, একটা

* লুধিয়ানা জেলায় অবস্থিত ও শতদ্রু নদীর তীরের এই গ্রাম মাছ ধরার জন্য বিখ্যাত। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে এখানে হুমায়ুন আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বিজয়ী হন। মাছ থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে মচ্ছিওয়ারা।

পিপের মতো মোটা ও গোলাকার এদের শরীর। এই জন্তুদের ছয়টি পা। মানুষ, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল জলে নামলেই এরা পা কামড়ে ধ'রে জলে টেনে নেয়।

সাতলেজ্ পার হয়ে পঞ্চম দিনে ডুঙ্গারি নামে ছোট একটি গ্রামে পৌছনো গেলো। এটি পাঠানদের শহর। এখানে পৌঁছে সম্রাট পাদ্রীদের পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন যাতে তাঁরা ঐ অর্থ খৃষ্টানদের মধ্যে বিতরণ করতে পারেন। সম্রাটের এই হঠাৎ বদান্যতার কারণ হোল এই যে পূর্বদিন তিনি হাকিমের কাছ থেকে একটি অনুনয়পূর্ণ চিঠি পেয়েছিলেন। আকবরকে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার অনুরোধ ছিল এই চিঠিতে। অন্য অনেককেই সম্রাট যেরূপ সুবাহ্ জায়গীর প্রভৃতি ভোগ করতে দিয়েছেন, তাঁর প্রতিও যেন অনুরূপ কৃপা বর্ষিত হয়। এই প্রার্থনার সঙ্গে কিন্তু হাকিম আত্মদোষ স্বীকার ক'রে সম্রাটের মার্জনা ভিক্ষা করে নি। বাদশাহ্ চিঠির উত্তর তো দিলেনই না, পরন্তু বিদ্রোহীর শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। বিপাশা নদীর তীর বরাবর চলে একটি জায়গা পাওয়া গেল যেখানে নদী অপ্রশস্ত এব অগভীর। হাতীগুলি সহজেই নদী পার হোল। কাঠের একটি সেতুও তৈরী হয়েছিল। সবাই সেতু পার হয়ে এলে সম্রাট তাঁবু সাজাবার আদেশ দিলেন। এই স্থানটির কাছেই নগরকোট। নগরকোটের জলবায়ু স্পেন ও ইতালীর অনুরূপ। স্পেন ও ইতালীতে যে সব জাতের ফল ও শস্য উৎপাদিত হয়, নগরকোটেও সেই রকম হয়। এই সব ফল ও শস্য ভারতের অন্য কোথাও হয় না। হিমালয় এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে।

বিপাশা পার হওয়ার দশ মাইল পরে পছানগড়। প্রধান অধিবাসীর নাম বীরবল (২১)। ইনি হলেন সম্রাট আকবরের

প্রধান ব্যক্তিগত কর্মচারী লর্ড চেম্বারলেন। সম্রাটকে সদলবলে ইনি একটি বিরাট ভোজে আপ্যায়িত করেন।

নগরকোট থেকে আঠারো মাইল দূরে কালানূর দুর্গ (*)। সম্রাট আকবর এখানে পাঠানদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন। সেই যুদ্ধের ফলে লাহোর রাজ্য তাঁ'র অধিকারে আসে। স্ট্রাবো লিখেছেন যে কালানূরে একটি ছোট নদীর পশ্চিম পার পর্যন্ত গ্রীক দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার এসেছিলেন; এই ছোট নদীটি বিপাশার সঙ্গে মিশেছে। আলেকজাণ্ডার ভারতের অভ্যন্তরে আর বেশি দূর এগোতে সাহস পান নি। রোমান লেখকদের বর্ণনায় জানা যায় যে কালানূর সেকালে খুব বড়ো এক শহর ছিল। ইতস্ততঃ ভগ্ন দশাপ্রাপ্ত অট্টালিকাগুলি অতীত দিনের সাক্ষ্য বহন করছে। বর্তমানে এটি একটি ছোট গ্রাম মাত্র; এখনকার অবস্থা দেখে এর প্রাচীন দিনের গৌরবের কাহিনী বিশ্বাসই করা যায় না।

কালানূর দুর্গের পূব দিকে একটি উপত্যকা পার হ'লে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চল শুরু হয়। সেই অঞ্চলে গোষ্ঠিবদ্ধ ও হিংস্র প্রকৃতির ভোটিয়ারা (†) বাস করে। শোলায় অনুরূপ একপ্রকার

* পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় কালানূর দুর্গ। কালানূর হচ্ছে সংস্কৃত 'কল্যাণপুর' শব্দের অপভ্রংশ। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর কালানূর দুর্গে থেকেই সিকান্দার শাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি করছিলেন। এই কালানূরেই একটি বাগানে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আকবরের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

† পাদ্রী মোন্‌সরেট যা'রে 'ভোটিয়া' বলেছেন তা'রা হচ্ছে পশ্চিম তিব্বতের বাসিন্দা। প্রতি বছর শীত শুরু হলে এরা বরফ পড়ার

দ্রব্য সেলাই ক'রে এদের অঙ্গ বাস তৈরী হয় ; সেটা আঁটো সাঁটো ক'রে পরিধান করে। পুরানো হ'য়ে ছিঁড়ে গিয়ে যতদিন না অব্যবহার্য হয়ে পড়ছে, ততদিন এরা সেই শোলায় তৈরী জামা কাপড় পরিবর্তন করে না। স্নান করা কিংবা হাত মুখ ধোওয়া এদের অভ্যাস নয়। এরা বলে যে জল অতিশয় পবিত্র, হাত মুখ ধুয়ে ফেললে বা স্নান করলে শরীরের ময়লা লেগে জল অপবিত্র হবে। হিমালয়ে যখন বরফপাত শুরু হয়, তখন এরা দলে দলে গিরিবর্ত্ম পার হয়ে কালানুরে আসে এবং সারা শীতকাল এখানে কাটিয়ে বরফগলা আরম্ভ হলে দেশে ফিরে যায়। পশম, পশমে তৈরী জামা পোষাক এবং নানা রকম রঙীন পাথর এরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে। ভোটিয়া স্ত্রীলোকরা একটি স্বামী পেয়েই সন্তুষ্ট ; পুরুষরাও এক পত্নী থাকতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে না। তিনটি সন্তান হলেই পুরুষ ভোটিয়া তা'র স্ত্রী ও সন্তান ত্যাগ ক'রে পুনরায় অবিবাহিত অবস্থায় ফিরে যায়। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী, এবং স্ত্রীর মৃত্যু হ'লে স্বামী, —পুনরায় বিবাহ করে না। এরা মূর্তিপূজা করে না, কিন্তু গণৎকার ও তুক্‌তাকে বিশ্বাস করে। কা'রও মৃত্যু হ'লে গণৎকার এবং তুক্‌তাক্ বিশারদকে ডাকা হয়, এবং তার অনুমতি পাওয়ার পরে শব সৎকার করা হয়। যদি এই বিশারদ গণনা ক'রে বলে যে মৃতদেহ কেটে খেয়ে ফেলাই বিধেয়, বা পশুপাখীকে খেতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাইরে ফেলে দাও, কিংবা নদীর জলে ভাসিয়ে দাও, অথবা পুড়িয়ে ফেলো,—এরা বিনা তর্কে তাই করে। মানুষের হাড় দিয়ে এরা বহুবিধ নিত্য ব্যবহার্য্য

আগেই সমতল ভূমিতে নেমে আসতো, —এখনও আসে। সে কালে কালানুর দুর্গের আশে পাশেই শীতকালটা কাটিয়ে যেতো।

দ্রব্য তৈরী করতে পারে ; যেমন হাতের হাড় দিয়ে ছোরা রাখার খাপ, মাথার খুলিতে পানীয় রাখার পাত্র, ইত্যাদি। ভেটিয়াদের দেশে গম, মদ ও ইয়োরোপের অনুরূপ অনেক রকম ফল উৎপাদিত হয়। এদের দেশে ভেড়া, উট, ছাগল ও পাহাড়ী গাধা প্রচুর পাওয়া যায়। এক রকম বড় জাতের ছাগল পাওয়া যায়, যা'দের পায়ের হাড় ও গ্রন্থী শক্ত নয় ; সুতরাং এদের অল্প আয়াসেই ধরতে পারা যায়। এই সব ছাগল ধ'রে এরা পোষ মানায় রেশমের চেয়েও মসৃন ও উজ্জ্বল এদের গায়ের লোম। এই লোম দিয়ে অতি সুন্দর শাল বানানো হয়। নগরকোট থেকে সোজা উত্তরে কাশ্মীর এবং কাশ্মীরের পূব দিকে ভেটিয়াদের দেশ। প্লিনী এদের 'কশিরী' জাতি বলে উল্লেখ করেছেন (*)। ভেটিয়ারা নরমাংস খায়।

কালানূরের পর রাভি নদী পার হতে হোল। তা'রপর পার হলাম রাভির একটি উপনদী—সরঙ্গ তা'র নাম। হিমালয় থেকে নেমে রাভিতে পড়েছে। এরপর পেলাম বন্ধুর পার্বত্য পথ, উঁচু নিচু রাস্তার অনেক জায়গাই বিপদসঙ্কুল। অনেকটা দূর এইভাবে চলে চাম্বা শহরে পৌঁছলাম। হিমালয়ের সানুদেশে ঢালু জমির উপর শহরটি তৈরী হয়েছে। প্রাকৃতিক দিক্ দিয়ে বেশ সুরক্ষিত। এখানকার জলবায়ু, শব্‌জি ও ফসল নগরকোটেরই মতো। অধিবাসীরা দীর্ঘকায়, শরীরের রঙ হাল্‌কা বাদামী, চুল ও দাড়ি বেশ দীর্ঘ। স্থানটি বিশেষ মনোরম।

---

* 'কাশ্মীর' শব্দ এসেছে সংস্কৃত 'কাশ্যপ' থেকে। টলেমির বর্ণনায় কাশ্যপ ও কাশ্যপপুরের বর্ণনা আছে।

অভিযাত্রী বাহিনীকে চেনাব নদী অতিক্রম করতে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। মীর্জা হাকিম পশ্চাদপসারণ করার সময় স্থানীয় যাবতীয় নৌকা ভেঙ্গে পুড়িয়ে দিয়েছিল, যেন আকবর নদী পার হতে না পারেন। আকবর নিজে অবশ্য নৌকায় নদী পার হলেন, কিন্তু নৌকার স্বল্পতার দরুণ সমগ্র বাহিনীকে নদী অতিক্রম করতে তিন দিন সময় লেগেছিল। এই নদী পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনায় তিনশ সৈন্য জলে ডুবে মারা যায়।

সৈন্যদের সুখ সাচ্ছন্দ্যের দিকে আকবর খুব কড়া নজর দিতেন। যাতে পানীয় জলের অভাব না ঘটে সে জন্য যথাসম্ভব নদীর তীর ঘেঁসেই যাত্রাপথ নির্ধারিত হোত। তথাপি, চেনাব পার হওয়ার পরের দিনই পানীয় জলের অভাব দেখা দেয়। সেদিন সাত মাইল পথ অগ্রসর হওয়া গিয়েছিল। পরের দিন পনের মাইল চলার জন্য সম্রাট হুকুম দিলেন। পনেরো মাইল পরে, বিপাশা নদীর পারে শিবির পাতা হোল। আট দিন এখানে বিশ্রাম করা হোল। বিপাশা খুব চওড়া ও গভীর নদী। হাতী, ঘোড়া ও এতগুলো মানুষের পক্ষে সাঁতার কেটে নদী পার হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই একটি শক্ত মজবুত সেতু নির্মিত হোল। এই নদী হচ্ছে লাহোর রাজ্যের প্রান্তসীমা। এর ওপারে জাঠদের দেশ। চুল ও দাড়ি ছাঁটাকে এরা পাপ বলে মনে করে। বিপাশা পার হয়ে কাশ্মীর। স্থানীয় ভাষায় 'কাশ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'পর্বত', এবং 'মীর' শব্দের অর্থ হচ্ছে শাসনকর্তা। এই দুই শব্দের সংযোগ ঘটিয়ে দেশের নামকরণ হয়েছে 'কাশ্মীর'। এ দেশের বাসিন্দারা পূর্বে ইহুদী ছিল, মুসলমান রাজত্বের সময় এরা ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করে। আলেকজাণ্ডার গ্রীস দেশ থেকে ইহুদীদের বিতাড়িত করেছিল, তা'রাই এখানে এসে কাশ্মীরি হয়েছে।

কাশ্মীরের উপত্যকা ও সমতল ভূমিতে গক্কর জাতীয় লোকেরা বাস করে। এরা ধর্মে মুসলমান। শক্ত পেশীবহুল অবয়ব, মাঝারি গঠন এবং লড়াই, ডাকাতি ও লুটতরাজে অভ্যস্ত। এরা রাস্তার ধারে লুকিয়ে ওৎ পেতে বসে থাকে, সুবিধা পেলেই পথিকদের সর্বস্বান্ত ক'রে বন্দী করে। পরে এই সব বন্দীদের মাথা কামিয়ে দিয়ে পারস্যে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে দেয়। এরা যে অঞ্চলে থাকে সেখানে একটি পাহাড় আছে। তা'র নাম 'বালনাথ টিলা'। খাড়া পাহাড়ের শীর্ষদেশ বেশ সমতল। সেখানে অনেক ছোট ছোট বসত বাড়ী আছে। একটি বাড়ীতে বালনাথ ও তাঁর ভগ্নী থাকতো। বালনাথ একটি ধর্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিল। বালনাথ প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের রীতি নীতি এইরূপ : দুই বছর শিক্ষানবীশ থাকার পর দীক্ষা দেওয়া হয়। এই দুই বৎসর শিক্ষার্থীকে আশ্রমের বাসিন্দাদের পরিচর্যা করা, রান্নায় সহায়তা করা, কাঠ কাটা, গৃহপালিত পশুদের মাঠে চড়িয়ে আনা, জল তোলা প্রভৃতি কাজ করতে হয়। আশ্রমের পূর্ণ সদস্যদের সংখ্যা কোন সময়ই তিনশর কম হয় না। দুই বছর যদি একাগ্রভাবে এবং সতর্ক হয়ে শিক্ষানবীশ এই সব কাজে যোগ্যতা দেখাতে পারে, তা'হলে তা'দের দীক্ষা দেওয়া হয় ; তখন তা'রা আশ্রমবাসী পূর্ণসদস্যদের মতো বালনাথ সম্প্রদায়ের নিজস্ব ও বিশিষ্ট পোষাক পড়তে পারে। সারাজীবন পবিত্র ও সদ্ভাবে অতিবাহিত করবে এই প্রতিজ্ঞা তা'দের করতে হয়। সম্প্রদায়ের মান সম্ভ্রম কোন মতেই যেন ক্ষুন্ন না হয়, সেদিকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। যে পোষাকের কথা এই কিছু আগে বলা হোল, তা' হচ্ছে : আজানুলম্বিত এবং এক রকম লাল রঙে এই পোষাক রঞ্জিত হয়। এই পোষাক পরার অধিকার লাভ করলে যথা ইচ্ছা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে

যাওয়া চলে। এদের একজনকে নেতা নির্বাচিত করা হয়। আশ্রম ছেড়ে নেতা কখনও কোথাও যেতে পারে না। আশ্রম পরিচালনায় ও ধর্মসংক্রান্ত অন্যান্য কাজে সাহায্য করার জন্য নেতা কয়েকজন বর্ষীয়ান্ আশ্রমবাসীকে বেছে নেয়। নেতার মৃত্যু হলে এই বর্ষীয়ান্ অনুচরেরা নতুন একজন নেতা নির্বাচন করে। এই নেতার একটি মালা থাকে, তা'তে রেশমের টুক্রো জড়ানো হয়। সিল্কে জড়ানো এইরূপ তিন চারটি লহরও মালায় গ্রথিত আছে দেখা যায়। নেতা বা মোহান্তের পদমর্যাদা এই মালা থেকেই বোঝা যায়; এ একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। প্রকৃত সত্যের আলো যা'র হৃদয়ে কণামাত্রও পড়েছে, এই অর্থহীন আত্মগরিমার কুসংস্কার তা'র কাছে ধরা পড়বেই। যদিও মুসলমান ও হিন্দু কোন সম্প্রদায়েরই কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মীয় মনোভাব এদের নেই, তথাপি দেখা যায় যে এদের ধর্মবিশ্বাসও বহু অন্ধ-বিশ্বাস ও অজ্ঞতায় পূর্ণ। এরা জনৈক বাল-নাথকে শ্রদ্ধা করে, বলে যে তিনি অবতার এবং ঈশ্বরের দাস ছিলেন। প্রবাদ এই যে, শ' তিনেক বছর আগে তিনি এই পাহাড়ে সন্ন্যাসী-জীবন যাপন করতেন; তাঁর এক ভগ্নীও তাঁ'র কাছে থাকতো। তা'রপর থেকে তাঁ'কে আর দেখা যায়নি। এখনও তাঁ'কে সবাই শ্রদ্ধা করে। প্রবাদ এই যে তিনি মারা যা'ননি, বিভিন্ন জায়-গায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও আকৃতিতে তাঁকে দেখা যায়। তিনি যেন প্রাচীন গ্রীসের দেবতা প্রমিথিউসের মতো। গাছের ডালে সকলের অগোচরে তিনি কাপড়ের টুকরো বেঁধে দিয়ে যান, এতেই তাঁ'র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে থাকে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা বলে যে বালনাথই প্রকৃত ঈশ্বর আরাধনার পদ্ধতি প্রদর্শন করেছেন। প্রত্যুষে পূব দিকে তাকিয়ে নবোদিত সূর্যকে অভিনন্দন জানানোই হচ্ছে এদের সেই গুরুপ্রবর্তিত ঈশ্বর-আরাধনার পদ্ধতি। সেই সঙ্গে বাজতে থাকে শাঁখ ও বাঁশী। সূর্যাস্তের সময়ও এরা অনুরূপ

প্রকৃতির পুনরাবৃত্তি করে ; তখন এদের মুখ থাকে পশ্চিম দিকে। আহারের সময় এরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়। খাদ্য এবং সামাজিক ক্রিয়া কর্মে বালনাথ তাঁ'র শিষ্য শিষ্যাদের প্রতি কোনও বিধি নিষেধ দিয়ে যা'ন নি। এই উপাসক সম্প্রদায় অতি সামান্য সাধাসিধা খাদ্য গ্রহণ করে : সিদ্ধ শাক সব্জি ও ঘি। এদের দু'টি শ্রেণী আছে : এক হচ্ছে বিবাহিত গৃহী, অন্য শ্রেণী হচ্ছে সন্ন্যাসী। প্রথমোক্ত শ্রেণীর পরিধেয় বস্ত্রাদির স্বল্পতা লক্ষণীয়। শেষোক্ত শ্রেণী, অর্থাৎ যাঁ'রা সন্ন্যাসী, তাদেরও পরিধানে সামান্য বস্ত্র ; পবিত্রতা, চরিত্র দৃঢ়তা এবং মানুষকে শিক্ষাদান বিষয়ে এদের কর্তব্যপরায়ণতা এদের সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা ক'রে রেখেছে। পাদ্রীরা মনে করেন যে বালনাথ একটি সাক্ষাৎ শয়তান ছিল ; ম্যাজিক ও বুজরুগি দিয়ে লোকজনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখতো, এখনও তাই করে। মূর্খ হিন্দুদের এই শয়তানই ভুলিয়ে রেখেছে। 'নাথ'—অন্ত নানাবিধ নামে হিন্দুরা সেই শয়তানকেই পূজা করে। এই সব নাথ হচ্ছে মানিকনাথ, সপ্তনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি। বালনাথকে শ্রদ্ধা দেখানোর উদ্দেশ্যে রাস্তার দু' পাশের গাছে কাপড়ের টুক্‌রো টানিয়ে রাখা হয় (২২)।

সম্রাট জালালুদ্দীন আকবর এই আশ্রম পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে যখন পাহাড়ে উঠলেন, তখন তাঁ'কে দেখার জন্য আশ্রমের সবাই ভীড় ক'রে দাঁড়ালো। বৃদ্ধ মোহান্ত সম্রাটকে অভ্যর্থনা করলো। এরা জানালো যে তাঁ'র বয়স দু'শ বছর হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তাঁ'র বয়স আশী বছরও হয়েছে কিনা সন্দেহ। নিজের সাধুতা এবং সন্ন্যাসীর পবিত্রতা প্রচারের উদ্দেশ্যেই এরা বয়স বাড়িয়ে বলে, —যেন দীর্ঘ কাল বেঁচে থাকলেই সাধুতা ও পবিত্রতা বাড়ে। সম্রাটকে তাঁদের ব্যক্তিগত পবিত্রতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অনেকেই

জামা কাপড় খুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। এরা ভয়ানক অর্থলোভী ; এদের যাবতীয় কলা কৌশল, সবই হচ্ছে অর্থপ্রাপ্তির জন্য। সম্রাট সর্বপ্রকার কুসংস্কার বিশ্বাস করতেন। সম্রাট বালনাথের সামনে উপস্থিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। প্রণাম করার আগে নগ্নপদে উষ্ণীস খুলে সম্রাট তাঁ'র দীর্ঘ কেশের গোছা ছড়িয়ে নিয়েছিলেন।

বালনাথের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় সম্রাট চারদিন অতিবাহিত করলেন। এই কয়দিন অভিযাত্রী বাহিনীর সবাই পাহাড়ের নীচে সমতল ভূমিতে শিবিরে অপেক্ষা করলো। তা'র পর সম্রাট বাহিনী সমেত দুই দিন চলার পর রোহ্‌টাস পৌঁছলেন, এবং নদীর পারে দুর্গের নিকটে শিবির পাতা হোল (*)। এই দুর্গের

---

* ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ্‌ তাঁর বিহারের রোটাস্‌ দুর্গের নামেই এই দুর্গেরনাম ক'রে নির্মাণ শুরু করেন। 'যোগী টিলা' নামক একটি জায়গার কাছে ঝিলামের কহন নামের এক উপনদীর পারে এই দুর্গ। কহন নদী দুর্গকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করে আছে। স্থানীয় অধিবাসী গক্ষর সম্প্রদায় মুঘল আফগান যুদ্ধে মুঘলদের পক্ষ নিয়েছিল। তা'দের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যেই শেরশাহ্‌ এই দুর্গ নির্মান করেন। গক্ষররা কেউই নির্মানের কাজে এগিয়ে আসেনি। মজুরীর রেট্‌ একচাক পাথর বসানোর জন্য এক আশ্‌রফি নির্ধারিত করতে হয়। সোনার লোভে গক্ষররা কাজে যোগে দেয়। ক্রমশ: মজুরীর রেট্‌ কমে চাক প্রতি পাঁচ টঙ্কায় (২০ টঙ্কায় ১ টাকা) নেমে আসে। ১৫৪২ সালে দুর্গ নির্মান সমাপ্ত হয়। কাবুল থেকে দিল্লী আসা যাওয়ার পথের উপর এই দুর্গটি সামরিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শাহ্‌জাহানের সময় থেকেই এর সামরিক গুরুত্ব কমতে থাকে।

অধিনায়ক সম্রাটকে ভোজে আপ্যায়িত করে। নদীটি বেশ চওড়া, কিন্তু জল খুব কম। সর্বত্রই বালি, এবং অনেক স্থানেই চোরাবালি। হাতী ও উট বাহিনীর অনেকে বোকামী ক'রে পথ পরীক্ষা না ক'রে নদী পার হ'তে গিয়ে পশু সমেত ডুবে যেতে থাকে, অনেক কষ্টে তাদের প্রাণ বাঁচানো হয়। চোরাবালি চারিদিক থেকে চেপে আসতে থাকে, এবং মজ্জমান প্রাণী ক্রমশঃই নরম বালিতে তলিয়ে যেতে থাকে ; সম্পূর্ণ তলিয়ে যাওয়ার পর উপরের বালিতে তা'র চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না।

ছয়দিন চলার পর সঙ্কীর্ণ গিরিপথ, এব্‌ড়ো থেব্‌ড়ো পথ ও খাদ পেরিয়ে একটি সমতল ভূমি পাওয়া গেল। পথে ঝড় বৃষ্টি ও ঘুর্ণি বায়ুর ঝাপ্‌টা সহ্য করতে হয়েছিল। অনেক ছোট ছোট পাহাড়িয়া নদী অতিক্রম করার পর এই সমতল ভূমি। প্রান্তরের মধ্যস্থলে একটি স্তূপ। বিরাট এর আকার (*) স্তূপের অনেকটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যেটুকু অক্ষত আছে তা'র গায়ে সুন্দর শিল্প-কর্ম দেখা যায়। অতি প্রাচীন এই স্তূপ। সাত ফুট উঁচু চতুষ্কোণ ভিতের উপর স্তূপটি স্থাপিত। স্তূপকে বেষ্টন ক'রে এর গায়ে নির্মিত দশ ফুট প্রশস্ত উন্মুক্ত প্রদক্ষিণ পথ। এখানে ওঠার জন্য সিঁড়ি আছে। চারদিকে প্রাচীর। বিশ ফুট উঁচু এবং ভিতের কাছে এর ব্যাস হচ্ছে দশ ফুট। সাত ফুট অবধি সরলভাবে উঠে গিয়েছে। এর উপরের অংশ ক্রমশঃ সরু হয়েছে এবং বিরাট গোলাকৃতি। খুব বড়ো পাথরে খোদাই করা চাক দিয়ে এটি তৈরী। কোথাও সিমেন্ট অথবা বিটুমেন ব্যবহার করা হয়

---

* রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় অবস্থিত 'মানিক্যালয়' বৌদ্ধ স্তূপ।

নি। কিম্বদন্তী এই যে রামচন্দ্র নামে জনৈক হিন্দু রাজা এই স্তূপ নির্মান করিয়েছিল।

এর পরে সম্রাট বাহিনী রিওয়াট শহরে পৌছয়। এই শহরও আশে পাশের অঞ্চলের মতোই গক্করদের বাসভূমি। ইন্দো-সিথিয়ার যতোই নিকটবর্তী হওয়া যায়, অধিবাসীদের ক্রমাগত বেশি দুর্বৃত্ত বলে' প্রতীত হবে। প্রবাদ আছে, 'ভারত থেকে দাসদাসী, পার্থিয়া থেকে ঘোড়া'। রোহ্‌টাস্ থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল শুষ্ক এবং বন্ধ্যা। আবহাওয়াও স্থানীয় অধিবাসীদের মতোই কঠোর এবং ভয়ানক। প্রকৃত ভারতীয়দের থেকে এখানকার লোকজন একেবারেই অন্যরকমের। গায়ের রং, ভাষা ও কথা বলার ধরণ, সবই ভারতীয়দের থেকে আলদা। গায়ের হাল্‌কা রং এবং শক্ত শক্ত পায়ের পেশী, চেহারা বেঁটে, উঁচু চোয়াল এবং চওড়া কাঁধ হচ্ছে এদের শারীরিক বৈশিষ্ট। বলিরেখায় কুঞ্চিত এদের মুখমণ্ডল। চেহারাই এমন যে বন্ধুত্বর পরিবর্তে বিরূপতাই যেন এদের কাছে পাওয়া যাবে, এই রকমটাই মনে হয়।

এখান থেকে রওনা হয়ে পথে একটি ছোট নদী পার হয়ে গগর পৌছলাম। তিনটি শিখর বিশিষ্ট ও সুরু খাড়াই পাহাড়ের উপর এই জায়গাটি। গগরের পরে সিন্ধু নদী থেকে বেরিয়ে একটি ছোট নদী আবার সিন্ধু নদীতেই মিশেছে। সিন্ধুর পারে হাজারা জেলার একটি উপত্যকায় সম্রাট বাহিনীর শিবির পাতা হোল। স্থানীয় জনসাধারণ পুশ্‌তু ভাষায় কথা বলে, উচ্চারণ শুনে অনেকটা স্পেনীস ভাষার মতো মনে হয়। অতিক্রান্ত অঞ্চলের তুলনায় এখানকার জলবায়ু অনেকটা নরম। ভূমি উর্বরা, মানুষের জন্য শস্য এবং পশুর জন্য ঘাস প্রচুর পাওয়া যায়। দলে দলে অনেক পশু মাঠে চরে' বেড়াচ্ছে দেখা গেল। দুধ এবং ঘি এখানে অপর্যাপ্ত

পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকজনেরাও অনেক নম্র এবং বন্ধু-ভাবাপন্ন। কৃষিকর্ম এবং পশুপালনই এদের উপজীবিকা। এরা প্রধানত গ্রামীন্, গক্করদের মত শহুরে নয়।

বাইবেলের অনুবাদ

অনেক দিন হোল সম্রাটের সঙ্গে ধর্মবিষয়ক আলোচনা হয়নি। বাইবেল সম্পর্কে ইতিপূর্বে তাঁকে যা' শোনানো হয়েছিল, পাছে তা' চর্চার অভাবে সব ভুলে যা'ন, পাদ্রী এইজন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। শত্রু পশ্চাদপসরণ করছে, এই সংবাদ পাওয়ার পর থেকে আকবর খুব খুশ্ মেজাজে ছিলেন। প্রায় প্রত্যহই শিকার করতে বেরোতেন; অবসরও প্রচুর পাওয়া যেত। কয়েক দিন ধ'রে লেখার পর পাদ্রী মোন্সারেট খৃষ্ট জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ও তৎসম্পর্কে খৃষ্টের বাণী ও ক্রিয়াকলাপ বিবৃত ক'রে একটি রচনা সম্রাটের হাতে দেন। তিনি আবুল ফজলকে ঐ লেখাটি প'ড়ে শোনাতে বলেন। আবুল ফজল সেটি পাঠ করে' শোনাতে লাগলেন। সম্রাট প্রশ্ন করলেন, "ইহুদীরা প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করুক, এই যখন তাঁ'র কাম্য ছিল, তখন প্রভু কেন তা'দের কথায় ক্রুশ থেকে নেমে এলেন না?"

পাদ্রী তা'র উত্তরে বললেন, "ঈশ্বরের নিয়মানুযায়ী বিশ্বাসের দ্বারাই মানুষকে বিচার করতে হয়। অর্থাৎ, সে প্রকৃতই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে কিনা, এটা জানতে হয়। আব্রাহাম এতটা ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন যে বংশলোপের সম্ভাবনা জেনেও তাঁ'র একমাত্র পুত্র আইজাককে উৎসর্গ করতে আদিষ্ট হয়ে ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে সামান্যতম দ্বিধাও করেন নি। তাঁ'র বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বর তাঁ'র অভিপ্রেত কার্য সম্পন্ন করবেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী

হয়েই তিনি পুত্রকে জ্বলন্ত চিতায় তুলে দিতে পেরেছিলেন। ঈশ্বর আব্রাহামকে করুণা করেছিলেন। যীশু যদি ক্রুশ থেকে নেমে আসতেন তা হ'লে ইহুদীদের ঈশ্বর বিশ্বাসের সত্যতা অনু-ধাবন করা যেত না। সামান্য কয়েকজন লোকের কথায় যদি প্রভু ক্রুশ থেকে নেমে আসতেন তবে ইহুদীরা তা' দৈবশক্তির ক্রিয়া বলে মেনে নিত না, বল্‌তো এটা একটা ম্যাজিক মাত্র। অনেক দৈব ঘটনাই শয়তানের কাজ ব'লে প্রচার করা হয়ে থাকে।"

সম্রাট পাদ্রীর বক্তব্য শুনে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন। মোন্‌-সারেট ভাঙা ভাঙা ফার্সীতে তাঁ'র বক্তব্য প্রকাশ করছিলেন। পাদ্রীর বক্তব্য সম্রাট সবিস্তারে উপস্থিত সকলকে বুঝিয়ে বলার পর তাঁ'রাও সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

সম্রাট খানিকটা পরে আবার প্রশ্ন করলেন, "ঈশ্বর তো নিরাকার। তাঁ'র ডান পাশে যীশু উপবেশন করলেন,—এ কথার তাৎপর্য কি?

পাদ্রী বললেন, "আমরা প্রভুর জড় দেহের কথা বলি না। যেহেতু খৃষ্টই ঈশ্বর, সেই জন্য তাঁর গৌরব, সম্মান এবং ক্ষমতা তাঁর পিতারই তুল্য। আবার, যেহেতু যীশু নরদেহ ধারণ করে-ছিলেন, সেই জন্য পিতার,—অর্থাৎ ঈশ্বরের—নীচে তাঁর স্থান। কিন্তু স্বর্গস্থ দেবদূত এবং সাধু সন্তদের এবং পৃথিবীর যাবতীয় রাজা ও সম্রাট অপেক্ষা তাঁকেই ঈশ্বর অধিক মর্যাদা, গৌরব এবং আনন্দ দান করেছেন। তা' ছাড়া, যেহেতু দান সর্বদাই ডান হাতে দিতে হয়, সেই জন্যই প্রভু যীশুকে ঈশ্বরের বাঁ পাশে স্থান না দিয়ে সর্ব-দাই ডান পাশে তাঁ'র আসন নির্দিষ্ট করা হয়।"

সম্রাট এবং সভাসদগণ পাদ্রীর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনে বিশেষ

প্রীত হলেন। পাদ্রীর দেওয়া বাইবেল সম্পর্কিত রচনা-সম্রাট৺ সযত্নে রেখে দিলেন।

সম্রাট সদলবলে সিন্ধু নদের তীরে পৌঁছে বিশ্রাম নিলেন। এখানে সুবিস্তীর্ণ একটি সমতল প্রান্তরে শিবির পাতা হোল। চারিদিকেই বেশ গাছ গাছালি। খাদ্য দ্রব্য এবং বন্য ও গৃহপালিত পশু প্রচুর। নিকটেই অরণ্য থাকাতে দৃশ্যটিও চমৎকার, সম্রাটকে শিকারের লোভ পেয়ে বস্‌লো। পঞ্চাশ দিন এখানে অতিবাহিত হোল। নদীর তীরে একফালি জমির উপর একটি ছোট পাহাড় আছে, একটি ছোট দুর্গ সেখানে সম্রাটের আদেশে নির্মিত হোল। যেখানে সম্রাট বাহিনীর শিবির, সেখানে একটি ছোট শহর আছে, নাম তা'র আটকবেনারস। সেই শহর থেকে দুর্গটির দূরত্ব নয় মাইল। নদী পার হয়ে কাবুল রাজ্যে যাওয়া যায়। সেই জন্য এই শহরের বেশ গুরুত্ব আছে; এই বিবেচনাই দুর্গ নির্মাণের কারণ। হিন্দুরা সিন্ধুনদ পার হয়ে ভারতের বাইরে যেতে চায় না। শহরের নাম সেইজন্য 'আটক' হয়েছে।

ভারতের নদীগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সিন্ধু। হিমালয় থেকে গলিত বরফের বিপুল জলরাশি এই নদী দিয়ে নেমে আসে। আরও পাঁচটি নদী এসে সিন্ধুতে মিশেছে, এদের নাম আগেই করেছি। পর্বত থেকে সিন্ধু যেখানে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করছে সেখানে নদীতে অতি উৎকৃষ্ট স্বর্ণকণা পাওয়া যায়। আটটি শাখানদী দিয়ে সিন্ধুর প্রবাহ গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। জলের প্রবাহ এত বেগবান যে নদী পার হতে হাতীকেও বেশ কষ্ট করে পার হতে হয়।

জুন মাসের মধ্য ভাগ থেকে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই নদী এতটা ফুলে ওঠে, —শুধু বৃষ্টির জলেই নয়, হিমালয় থেকে বরফ গলা জলেই এর স্ফীতি এত বিরাট হয়ে ওঠে, যে মোহনা থেকে সমুদ্রে চল্লিশ মাইল পর্যন্ত জল সুপেয় থাকে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই নদীর নাম দিয়েছে 'নীলন্থু', ফার্সী ভাষায় যা'র মানে হচ্ছে 'নীল জল'। নামকরণ উপযুক্তই হয়েছে, কেননা, যেখানে নদীর সঙ্কীর্ণ অংশ পার হয়ে আবগানিস্থানে প্রবেশ করা যায়, সেখানে জল গভীর এবং নীলাভ, স্রোতও সেখানে দ্রুত এবং দুর্বার।

সম্রাট যখন বাহিনী সমেত বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন স্থানীয় পরস্পর বিবদমান দুইটি বিবদমান উপজাতির বিরোধ স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে মিটিয়ে দিলেন। প্রতিদান স্বরূপ তা'রাও সম্রাট বাহিনীর নদী পার হওয়ার জন্য অনেক নৌকা ও সেতু নির্মানের উপযোগী কাঠ এনে দিল।

প্রত্যহ রাত্রে যুদ্ধ মন্ত্রণা সভার বৈঠক হোত। দিনে চলতো শিকার, নানাবিধ ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদ। জ্যোতিষীরা যুদ্ধযাত্রার শুভ সময় নিরূপণের জন্য গণনায় প্রবৃত্ত হোল। সম্রাট এখন শত্রুর রাজ্য মধ্যে। স্থানীয় অধিবাসীদের স্বপক্ষে আনয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিতরণ করা হ'তে থাকলো। সম্রাট জানতেন যে যুদ্ধের ফলাফল সর্বদাই অনিশ্চিত; শেষ পর্যায়েও নিশ্চিত জয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'তে পারে। যুদ্ধ নিশ্চয়ই করা হবে এই ভান ক'রে কূটনীতির সাহায্যে অগ্রসর হওয়াই সম্রাটের অভিপ্রায় ছিল। তা' ছাড়া যা'র বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সেই মীর্জা হাকিম যে সম্রাটেরই বৈমাত্র ভাই একথা তিনি কখনোই বিস্মৃত হ'ন নি। সেই জন্যে, যখন তিনি সংবাদ পেলেন যে হাকিম

পশ্চাদপসরণ করছে, তখন তিনি পাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে পলাতকের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত হবে কি না। পাদ্রী তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন; আর অগ্রসর হয়ে কাজ নেই। পলাতক তো আপনারই ভাই। প্রতিশোধ অপেক্ষা করুণা নিশ্চয়ই মহত্তর।"

আকবর হৃষ্টচিত্তেই পাদ্রীর পরামর্শ শুনলেন। কিন্তু বিদ্রোহীকে সমুচিত শিক্ষা না দিলে সে আবার বিশৃঙ্খলা ও বিপদ ঘনিয়ে তুলতে পারে, এ সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই, সম্রাট এমন পন্থা-গ্রহণ স্থির করলেন যেন মীর্জা হাকিম নিজের অবিমৃষ্যকারিতা ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গমে করতে পাবে।

ইতিমধ্যে অনেক নৌকা তৈরী হয়েছিল। হিমালয়ে বরফ-গলা শুরু হয়েছে, বরফগলা জলে স্ফীত সিন্ধু নদে তীব্র স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় ভাসমান সেতুও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। সম্রাট স্থির করলেন যে নৌকাযোগে একটি অগ্রগামী দলকে ওপারে পাঠিয়ে কাবুল অভিমুখে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন। পাদ্রী যাঁকে পড়াতেন,—সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ,—তাঁর সম্পর্কে জ্যোতিষীরা প্রচুর উৎসাহ-ব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সম্রাট তাঁকে এই অগ্রগামী বাহিনীর নায়ক করেন, এবং সুরাটের শাসনকর্তা কুলিজ খাঁ (*) নত্তরং খাঁ। ইনি হলেন সেলিমের ভূতপূর্ব

* কুলিজ খাঁ প্রথমে ছিলেন সুরাটের শাসনকর্তা। পরে পদোন্নতি হয়ে লাহোর এবং সবশেষে আগ্রার শাসনকর্তা হ'ন। আকবরের অন্যতম বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ কর্মচারী কুলিজ খাঁ পর্তুগীজ এবং সকল জাতীয় খৃষ্টানদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। ব্লকম্যান লিখেছেন যে লাহোরে থাকার সময় কুলিজ খাঁ খৃষ্টানদের উৎপীড়ন করেছিলেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

গৃহশিক্ষক কুতুবুদ্দীন খাঁ'র পুত্র, এবং বরোদা শহরের পঁচিশ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত চম্পানীরের সুদৃঢ় দুর্গের অধ্যক্ষ, এবং বিখ্যাত মানসিংহকে মুরাদের সঙ্গে যেতে আদেশ করেন। কুলিজ খাঁ'র অধীনে একদল দক্ষ মঙ্গোল বাহিনী, নওরং খাঁ'র অধীনে চার হাজার অশ্বারোহী এবং মানসিংহের অধীনে তাঁ'র নিজস্ব বাহিনীকে দেওয়া হয়। এদের পশ্চাৎভাগ রক্ষার জন্য আরও জনাকয়েক নিম্নপদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ ও হাজার খানেক অশ্বারোহী নিয়োজিত করা হয়। এই বাহিনীর সঙ্গে পাঁচ শ' হাতীও ছিল। জ্যোতিষীর নির্ধারিত সময়ে মুরাদ সসৈন্য নদী পার হয়ে অগ্রসর হোল। বিদায় দেওয়ার সময় সম্রাট তা'কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

অগ্রগামী বাহিনী রওনা হওয়ার পর সম্রাট তাঁ'র পরিবারস্থ লোকজন, ধনরত্ন, রসদ ও অবশিষ্ট সৈন্যদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নিলেন।

মুঘল রণকৌশলে সমুদয় সৈন্য নিয়ে একসঙ্গে শত্রুকে আক্রমণ করার বিধি নেই। যদি ছ' হাজার ঘোড়সওয়ার শত্রুর দিকে ছুটে চলে, তা' হলে জানতে হবে যে আরও বিশ হাজার অশ্বারোহী পশ্চাতে মোতায়েন আছে। অগ্রগামী যোদ্ধারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে বা বিপর্যস্ত হলে পিছনের সংরক্ষিত বাহিনী তা'দের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। এদেরও পিছনে রাখা হয় আরও অনেক হাজার। এই সব সংরক্ষিত বাহিনীই অনেক সময় নিশ্চিত পরাজয় থেকে বাহিনীকে জয়ের পথে নিয়ে যায়। মীর্জা হাকিম যখন শুনলেন যে মুরাদ সসৈন্য সিন্ধু নদ পার হয়ে দ্রুতবেগে কাবুলের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তিনি সম্রাটের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করাই স্থির করলেন। নিঃশর্ত ভাবে আত্ম-সমর্পণ এবং আর যুদ্ধ বিগ্রহ ষড়যন্ত্র প্রভৃতিতে লিপ্ত না হওয়ার অঙ্গীকারের বিনিময়ে ভাই এর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করাই শ্রেয়ঃ

বিবেচনা করলেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে দূত প্রেরণ করলেন। দূতদের সঙ্গে প্রচুর সংখ্যক অশ্ব অশ্বতর রসদ এবং ধনরত্ন ভেট স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন। সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন হিসাবেই এই সব প্রেরিত হয়েছিল। পাকা দাড়ি সমন্বিত দুই বৃদ্ধ দূত এই সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল। তা'রা যখন সম্রাটের শিবিরে এলো তখন তিনি মল্লক্রীড়া দেখায় নিবিষ্ট ছিলেন সম্রাট গুপ্তচরের নিকট হাকিমের দূত প্রেরণের সংবাদ আগেই পেয়েছিলেন। ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদের আয়োজন করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে হাকিমের দূতরা যেন বুঝতে পারে যে সম্রাট মীর্জা হাকিমের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধকে মোটেই গুরুত্ব দেন না। যাই হোক, হাকিমের দূত দুইজন সম্রাটের নিকট হাকিমের ক্ষমাপ্রার্থনা আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের প্রস্তাব নিবেদন করলো। সম্রাটও তা' প্রসন্ন বদনে শুনলেন। নিকটেই সম্রাটের অন্য দুই ছেলে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ওমরাহদের কয়েকজন ছেলেও দাঁড়িয়ে ছিলেন। দূতদের সঙ্গে সম্রাট সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহারই করলেন। হাকিমের ক্ষমাপ্রার্থনার চিঠিটি আবুল ফজল সম্রাটের আদেশে পড়ে' শোনালেন। দূতরা জেনে গেল যে সম্রাট সন্ধির প্রস্তাব মঞ্জুর করেছেন। দূতদের অবিলম্বে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা হোল।

মুরাদ চলে যাওয়ার দুইদিন দিন পর রাত্রে সম্রাট পাদ্রীকে ডেকে পাঠালেন। ধর্মীয় এবং অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার জন্যই পাদ্রীকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। একটি ভূগোলক আনিয়ে সম্রাট পর্তুগাল ও ভারতের অবস্থিতি দেখিয়ে দিতে বললেন। পাদ্রী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এবং শহরের নাম জানেন দেখে সম্রাট আশ্চর্য হলেন। পাদ্রী কেন বিবাহ করেন

নি জানতে চাইলেন; সম্রাট বললেন, 'এটা কি ঈশ্বরের বিধান নয় যে প্রত্যেককেই বিবাহ করতে হবে? পাদ্রী যে বলেন, অবিবাহিত এবং বিবাহিত, দুই অবস্থাই উত্তম, এটা কি পরস্পর বিরোধী উক্তি নয়? পাদ্রী এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "সম্রাট কি জানেন না যে দুইটি উত্তম দ্রব্যের একটি অধিকতর উত্তম হতে পারে? রৌপ্য উত্তম,, স্বর্ণ উত্তমতর; জ্ঞান সোনা থেকেও শ্রেয়ঃ; সৎপ্রকৃতি সর্বোত্তম। চাঁদ সুন্দর, কিন্তু সূয তা'র চেয়েও সুন্দর ও শ্রেয়ঃ।" সম্রাট পাদ্রীর কথা মেনে নিলেন। পাদ্রী বললেন, "সেই জন্যই ধর্ম যাজকরা অবিবাহিত অবস্থায় থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করেন। এই উপায় অবলম্বন করেই তাঁরা জীবনের পরম বিষয় সমূহে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। স্ত্রী পুত্র পরিবারের চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁ'রা সর্বপ্রকার ভোগ সুখ প্রবৃত্তির প্রলোভন এই উপায়ে দূরে রাখতে সমর্থ হ'ন। খৃষ্টিয় দশ আজ্ঞার ষষ্ঠটি হচ্ছে বিলাস ব্যসন পরিহার করার নির্দেশ।" বাধা দিয়ে সম্রাট বললেন, "আপনারা বলে থাকেন যে খৃষ্টই ঈশ্বর। আপনারা যে তাঁ'রই অনুরূপ হতে চান, এটা কি ধৃষ্টতা নয়?" পাদ্রী তদুত্তরে বললেন, "আমরা বলি এবং বিশ্বাস করি যে খৃষ্টই ঈশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলি যে তিনি মানুষের দেহ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। মানুষ রূপে তিনি সৎভাবে জীবন যাপন করেছিলেন। সৎজীবন যাপনের জন্য যে সব উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন—তা' আমাদের ধর্মপুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। খৃষ্টকে যখন ঈশ্বর থেকে অভিন্ন মনে করি তখন তাঁ'র অনুরূপ হওয়ার কথা বলা অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রকম ইচ্ছা প্রকাশ করা মূর্খতা ও পাগলামিরই পরিচায়ক। অপর পক্ষে প্রভু-নির্দিষ্ট ব্যবহার ও অনুসৃত পথ অনুসরণ করাই প্রকৃত কর্তব্য। যে সব

কারণে তিনি নরদেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা'র একটি হোল এই যে তাঁ'রই মতো আত্মত্যাগ, সৎপ্রবৃত্তি ও আত্মোৎসর্গ যেন আমরাও আমাদের জীবনে সম্ভাবিত করতে পারি। অত্যন্ত নিপুণ চিত্রকরও তা'র অঙ্কিত চিত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির অনুকরণ করতে পারে না। প্রকৃতির সত্তা অধিগত না হওয়াই এই ব্যর্থতার হেতু। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও খৃষ্টকে যথাযথ অনুসরণ করতে পারবো না। আমরা অনেক পিছিয়ে থাকবো। আত্মম্ভরিতা, হঠকারিতা বা বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্য খৃষ্টকে অনুসরণ করা নয়, আত্ম-অবলুপ্তির দ্বারাই খৃষ্টানুসরণ করতে হয়। এই উপদেশই তিনি দিয়েছেন।"

সব কথা শুনে সম্রাট বললেন, "তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম মানুষ আদম থেকে পুরুষানুক্রমে যে ধারাবাহিকতা চলে এসেছে তা' আপনাদের মতো সাধু ও ধর্মযাজকদের জীবনের সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে!"

পাদ্রী বললেন, "আমি যদি শৈশবে অথবা বিবাহের পূর্বেই মারা যাই, তা' হ'লে? যদি স্ত্রী বন্ধ্যা হয়, অথবা স্বামী সন্তান উৎ-পাদনে অসমর্থ হয়? বিবাহই যে জীবনের সর্বোত্তম উদ্দেশ্য তা' মনে করা ঠিক নয়। প্রজাবৃদ্ধির জন্যই ঈশ্বর নরনারীর মিলনের নির্দেশ দিয়েছেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে লোকসংখ্যা প্রচুর হয়েছে। এই জন্যেই বাইবেলে খৃষ্টের উপদেশ লিখিত হয়েছে যে বিবাহ ব্যাপারটাই ব্যক্তির রুচি ও বিচারের উপর ছেড়ে দেওয়া বিধেয়।"

সম্রাট প্রশ্ন তুললেন, "ঈশ্বর যদি কাউকে নদী পার হওয়ার আদেশ দেন, তা' হ'লে তা'র পক্ষে সেই আদেশ অমান্য করে' পাপের ভাগী হওয়া কি ন্যায়সঙ্গত হবে?"

পাদ্রী বললেন, "আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমি একটু আগেই বলেছি যে বাইবেলে এমন কোন নির্দেশ নেই যে প্রত্যেককেই বিবাহ করতে হবে। বিবাহ না করলেই যে সন্তান থাকতে পারে না, একথা মনে করেন কেন? আপনি যদি আমার ও আমার ধর্মভ্রাতা রুডল্‌ফের পরামর্শ অনুযায়ী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, তবে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করলে আপনাকে রুডল্‌ফের সন্তান বলেই ধরে নিতে হবে, হুমায়ুনের পুত্র ব'লে নয়। যিনি আপনার জন্ম দিয়েছেন, তাঁ'র থেকে আপনার শরীরটাই পেয়েছেন; আর যিনি আপনাকে দীক্ষা দেবেন, আপনি তা'র কাছে পাবেন আত্মার সন্ধান। অবশ্য, সবার জন্মই অবিবাহিত থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন বিধেয় নয়, কতকগুলি লোককে বিবাহ করতেই হবে, ধর্মপুস্তকে এমন নির্দেশও আছে। প্রাকৃতিক নীতি অনুযায়ীই বিবাহের বিধিও ঈশ্বর দত্ত, বিবাহের ফলেই মানব জাতির পরিসর বৃদ্ধি পায়: মুসাও ইহুদীদের বিবাহের মাধ্যমে জনসংখ্যা বাড়াবার উপদেশ দিয়েছিলেন এই কারণে যে তা'র ফলে সত্য ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রকৃত ধর্মের প্রসার হবে। কিন্তু বাইবেলে বর্ণিত ধর্মই সর্বধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীতে জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই অনেক বেড়েছে। সেই জন্যই খৃষ্ট বিধান দিয়েছেন যে স্বীয় বিচার অনুযায়ী নিজের পথ বেছে নিতে হয়। সকলের জন্য ব্রহ্মচর্য নয়, অনেককেই বিবাহ করতে হয়।"

"কা'দের কথা বলছেন?" সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন।

পাদ্রী বললেন, "নরপতিদের পক্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিবাহ করা অবশ্যই কর্তব্য। এই জন্য পর্তুগালের রাজা হেন্‌রী পাদ্রী হওয়া সত্বেও দেশের বিজ্ঞজনের দ্বারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। খৃষ্টের মহামান্য পোপের

আশীর্বাদ যাতে পেতে পারেন সেই জন্যও চেষ্টা করা হয়েছিল। রাজা হেনরীর বার্ধক্য এবং শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও বিবাহের প্রস্তাব ওঠানো হয়। কিন্তু তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করেন নি। জীবনের অবশিষ্ট কাল অবিবাহিত অবস্থায় সৎভাবে অতিবাহিত করেন।"

ব্রহ্মচর্য এবং বিবাহ সম্বন্ধে সব দিক দিয়েই যখন আলোচনা করা হোল, জানবার আর বলবার কিছুই বাকী রইলো না, তখন সম্রাট বাইবেলে উল্লিখিত 'শেষ বিচার' সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন। তিনি বিশদভাবে জানতে চাইলেন শেষ বিচার কবে হবে এবং যীশুই বিচারক কিনা।"

পাদ্রী বললেন, "ঈশ্বরের মহিমা আমরা কতটুকুই বা জানি! শেষ বিচারের দিন তিনিই স্থির করবেন। তাঁর অজ্ঞেয় ইচ্ছার জন্যই আমরা তাঁ'র মহিমা বুঝতে পারি না। খৃষ্ট তাঁ'র শিষ্যদের নিকটও এই জ্ঞান উন্মোচিত করেন নি। শেষ বিচারের দিন সুদূর পরাহত হ'লে যদি আমরা কর্তব্য পালনে অবহেলা করি অথবা শীঘ্রই সেই দিন ঘনিয়ে আসছে জেনে যদি আমরা বিমর্ষ হয়ে পড়ি, এই উভয়বিধ সম্ভাবনার কথা চিন্তা ক'রেই তিনি তা' প্রকাশ করেন নি। কিন্তু সেই শেষ বিচারের দিনের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে বলেছেন, যেন আমরা ঈশ্বরের দানের মর্যাদা দিতে পারি, তা'র সদ্ব্যবহার করি, যেন তাঁর নিষেধ মেনে নিয়ে পাপকার্য থেকে বিরত থাকি। শেষ বিচারের দিনের লক্ষণসমূহ ঠিক তা'র আগে প্রকাশ পাবে। তিনি চেয়েছিলেন আমরা যেন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সর্বদা সতর্ক থাকি, যেন ঈশ্বরের করুণার সদ্ব্যবহার ক'রে চরম মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি।"

"কোন্ নিদর্শন দেখে বুঝতে পারবো যে শেষ বিচারের দিন

সমাগত ?"—সম্রাটের এই প্রশ্নের উত্তরে পাদ্রী জানালেন, "প্রভু যীশু বলেছেন যে যুদ্ধ, উপপ্লব, সাম্রাজ্য ও জাতির পতন, বৈদেশিক শত্রুর দ্বারা দেশ আক্রমণ প্রভৃতিই হচ্ছে শেষ বিচারের দিন সমাগত হওয়ার নিদর্শন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সব ঘটনা আজকাল অহরহ ঘটছে।"

সম্রাট খুব মনোযোগ সহকারে পাদ্রীর কথা শুনছিলেন। এর পর তিনি মূর্খের মতো কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। বাইবেল ও কোরাণের তুলনামূলক আলোচনা তুললেন। এক প্রবঞ্চক বলেছিল যে বাইবেলে পবিত্র আত্মা যা'কে বলা হয়েছে তিনিই সেই ব্যক্তি! খৃষ্টানরা এই কথার প্রতিবাদ করলে বলা হয় যে বাইবেলকে বিকৃত ক'রে দেওয়া হয়েছে। পাদ্রী বুঝতে পারলেন যে এতদিন ধ'রে সম্রাটকে যে সকল সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি তা' শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করেন নি। সম্রাট জানতে চাইলেন, 'যা'কে খৃষ্ট শত্রু (anti Christ) বলা হয়, তা' কি মহম্মদকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে ?

"না।" পাদ্রী দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন। "তবে ইয়োরোপের বহু পণ্ডিত মহম্মদ সম্পর্কে বলেছেন, 'সকল মানুষই তাঁ'র বিরুদ্ধে হাত তুলবে এবং তিনিও সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। তাঁ'র আত্ম পরিজনের থেকে দূরে তাঁ'র শিবির পাতা হবে।' মহম্মদ জন্মেছিলেন ইশমাইলের জাতিতে, তাঁ'র প্রবর্তিত ধর্ম যা'রা মানে নি, তিনি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধা'রণ করেছিলেন। মূসা প্রবর্তিত নিয়মাবলী এবং বাইবেলের বাণী থেকে মহম্মদের বাণী পৃথক।

সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, "তা'হলে, কোরাণ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?"

পাদ্রী মৃদু হেসে উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করলেন। সম্রাট

তাঁ'কে খোলাখুলি তাঁ'র মত জানাতে বললেন। পাদ্রী তখন বললেন, "মহম্মদ বলেছিলেন যে কোরাণে যা' যা' লিপিবদ্ধ আছে, ঈশ্বরই তাঁ'কে সে সব কথা বলেছেন। আমরা এই উক্তি বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর পরস্পর বিরোধী উক্তি করতে পারেন না। কারণ, ঈশ্বর একবার তাঁ'র প্রতিনিধিকে এক রকম বললেন, পরে আর এক প্রতিনিধিকে অন্যরকম বললেন, এ হতে পারে না। ঈশ্বরের পক্ষে পরস্পর বিরোধী উক্তি সম্ভবপর নয়। মুসা এবং যীশুর বাণী ও তাঁ'দের প্রদত্ত নিয়ম ও অনুশাসনগুলি অনেক বিষয়েই কোরাণের উক্তির বিরোধী। মুসার অনুশাসন, ধর্মসঙ্গীত এবং বাইবেল,—হয় এদের পবিত্র বলা চলে না এবং কোরাণকেই একমাত্র পবিত্রগ্রন্থ বলে মেনে নিতে হয়, অথবা ওর বিপরীত উক্তি করতে হয়।"

আকবর অভিনিবেশ সহকারেই পাদ্রীর বক্তব্য শুনলেন। আবুল ফজলও নীরবে উভয়ের কথা শুনছিলেন। তিনি এবার জিজ্ঞাসা করলেন, "মুসার অনুশাসন এবং খৃষ্টের সুসমাচার কি আলাদা আলাদা পুস্তকে আছে?"

পাদ্রী বললেন, "হাঁ, পৃথক পৃথক পুস্তকেই মুসা ও প্রভু যীশুর উক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর তা গ্রথিতও হয়েছে অনেক সময়ের ব্যবধানে। কিন্তু মুসার অনুশাসন ও খৃষ্টের সুসমাচারে অসামঞ্জস্য নেই। যে সব গ্রন্থ পবিত্র, তা'দের মধ্যে অসামঞ্জস্য বা পরস্পর বিরোধীতা নেই। মুসার মাধ্যমেই ইজ্‌রাইলের নরনারীর জন্য ঈশ্বর তাঁ'র পবিত্র অনুশাসন পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে যে, যীশুর আবির্ভাব কাল অবধি তা' মেনে চলা হয়। যীশুর আবির্ভাবের পর ঐ পুরাতন নিয়মগুলির অবসান হয়।"

আবুল ফজল প্রশ্ন করলেন, "যদি উভয় ধর্মপুস্তকে একই

সদুপদেশের কথা লেখা হয়েছে তবে পুরাতন অনুশাসনগুলি বাতিল হোল কেন?"

পাদ্রী উত্তর দিলেন, "মানুষের বোধশক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখেই পরম শক্তিমান ঈশ্বর তাঁ'র নির্দেশসমূহ মানুষকে দিয়েছেন। তিনি সকল মানুষেরই পিতা। পিতা যেমন শিশু পুত্রের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেন, এবং শিশু বড়ো হলে তা'র খাওয়ার ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন, শিশুকালে প্রদত্ত উপদেশ যেমন তা'র বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পরিবর্তন করা হয়, ঈশ্বরও তেমনই করেছেন। ইহুদীদের তিনি অবিশ্বাসীদের নিকট থেকে সরিয়ে এনে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। ইজিপ্টের অধিবাসীদের কুসংস্কার এবং দুর্নীতিপূর্ণ পরিবেশ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই মুসার মাধ্যমে তিনি অনুশাসনগুলি পাঠিয়েছিলেন। তারপর মানব সমাজ আরও বয়ঃপ্রাপ্ত হোল। তখন ঈশ্বর ধর্মপুস্তক বাইবেলের সাহায্যে শুধু ইহুদীদের জন্যই নয়, সমগ্র মানব জাতির জন্যই সুসমাচার প্রকাশ করলেন। মানুষ যাতে অতীতের অজ্ঞান অন্ধকার পার হয়ে আত্মার আহার্য সংগ্রহ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই বাইবেল লিপিবদ্ধ হোল। পবিত্র অনুশাসন সমূহ, —যা' মুসা প্রচার করেছিলেন, সেগুলি ছিল মানব সমাজের শিশু অবস্থার উপযোগী, বাইবেল হচ্ছে পরিণত বোধশক্তির উপযোগী।"

বাধা দিয়ে আবুল ফজল বললেন, "কোরাণও তো পরমার্থিক খাদ্যের সন্ধান দিয়ে থাকে!"

প্রতিবাদ করে পাদ্রী বললেন, "না তা কথনোই খাদ্য নয়। বাইবেলের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গতিহীন কোন কিছুই মানবাত্মার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।"

বিনাবাধায় মুক্তকণ্ঠে মত প্রকাশের অনুমতি পেয়েছেন ব'লে

পাদ্রী অকুণ্ঠিতভাবে সম্রাটকে ধন্যবাদ জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে অপ্রীতিকর অনেক কথা বলেছেন বলে, মার্জনাও চাইলেন।

সম্রাট বললেন, "এরূপ আলোচনায় উত্তেজিত হওয়ার মতো মানুষ আমি নই। আমি সত্যের অনুসন্ধানই করতে চাই।"

পাদ্রী নিবেদন করলেন, "আমি যা' সত্য ব'লে জেনেছি, আপনাকে আমি সেই সব কথাই জানিয়েছি।"

সেদিনের আলোচনা এখানেই শেষ হোল।

আসন্ন সংগ্রাম

মীর্জা হাকিম যখন শুনলেন যে সম্রাট আকবর এক বিরাট বাহিনী নিয়ে নিজেই তা' পরিচালনা ক'রে কাবুল অভিযানে আসছেন, তখন তা'র গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে যুদ্ধ এড়াবার পথ খুঁজতে লাগলেন। আত্মসমর্পণ করাই বিধেয় বলে স্থির করলেন। শান্তির প্রস্তাব দিয়ে দুই বৃদ্ধকে দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন। আকবরও নিমরাজী হয়েছিলেন। কিন্তু মাতুল ফরিদুন্ খাঁ (*) তাঁ'কে

* আকবরের বৈমাত্র ভ্রাতা মীর্জা হাকিমের মাতুল। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে মীর্জা হাকিম পাঞ্জাব আক্রমণ করলে লাহোরস্থিত বাদ্‌শাহী ফৌজের সাহায্যার্থে আকবর ফরিদুন খাঁকে তাঁ'র বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। ফরিদুন খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে হাকিমের সঙ্গে যোগ দেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে হাকিমের মৃত্যু হয় এবং ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ফরিদুন খাঁ আকবরের নিকট নতি স্বীকার করেন। কিছুকাল নজরবন্দী রেখে সম্রাট তাঁ'কে মক্কায় হজ করতে পাঠিয়ে দেন। ফরিদুন খাঁ ছিলেন সুচতুর প্রশাসক, বুদ্ধিমান কূটনীতি বিশারদ এবং কুশলী ও সাহসী সেনানায়ক। আকবরের প্রতি ছিল তাঁ'র বদ্ধমূল বিরাগ।

কুপরামর্শ দিয়ে আত্মসমর্পণ করা থেকে বিরত করলেন। এই কুপরামর্শের ফলেই মীর্জা হাকিমের মৃত্যু নিকটতর হয়। গুপ্তচরের সংগৃহীত সংবাদের চেয়ে ফরিদুন্ খাঁ'র প্রদত্ত সংবাদ ও পরামর্শই হাকিম গ্রহণ করতে লাগলেন। ফরিদুন্ খাঁ তাঁ'কে বুঝিয়েছিলেন অল্প সংখ্যক কাফেরের এক বাহিনী নিয়ে আকবর যুদ্ধে এসেছেন।

আকবরের চর হাকিম যুদ্ধ করবেন সংবাদ দিলে সম্রাট অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন। সেই বৃদ্ধ দুই দূত তখনও সম্রাটের ছাউনীতে অবস্থান করছিল। সম্রাট তা'দের কাবুল ফিরে যেতে বললেন। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তিনি তা'দের কোনও মূল্যবান উপহার বা নগদ অর্থ দিলেন না। কয়েকটি পুরাতন পোযাকের একটা পুঁটুলি তা'দের দিলেন। সম্রাটের এই ব্যবহারে প্রমাণিত হোল যে তিনি সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে দূতদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করলেন। মীর্জা হাকিমের সহোদরা ও আকবরের বৈমাত্র ভগ্নী বক্‌ত্‌উন্নিসা বেগমও (†) শান্তির প্রস্তাবে সায় দিয়ে একজন দূতকে পাঠিয়েছিলেন। সম্রাট তা'কে নগদ টাকা ও অন্যান্য দ্রব্য উপহার দিয়ে ফেরৎ পাঠালেন। এর পর সম্রাট দুইবার নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু জ্যোতিষী ও গণৎকারদের কথায় বিরত হলেন। পরে যখন উপযুক্ত দিন পাওয়া গেল, তখন সসৈন্য নদী পার হলেন এবং কাবুল নদী ও সিন্ধুনদের সঙ্গমের নিকটে ছাউনি পাতলেন। নদী পার হওয়ার স্থান থেকে এই সঙ্গমস্থলের দূরত্ব দুই মাইল। এই অঞ্চলটিকে ইন্দোসিথিয়া বলা হয়। সঙ্গমের পূর্বদিকে সিন্ধু

---

† মীর্জা হাকিমের সহোদরা বক্‌ত্‌উন্নিসার বিবাহ হয় বাদকশানের হাসানের সঙ্গে। আকবর তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তা'রই অনুরোধে আকবর হাকিমকে ক্ষমা করেছিলেন।

এবং শুভস্তু নদীর সঙ্গম পর্যন্ত অঞ্চলকে গান্ধার বলা হয় (*)। শভস্তু নদীর সঙ্গম থেকে উত্তরাঞ্চলের নাম স্বোয়াট্ বা শভস্তু। গান্ধার ও শভস্তুর অধিবাসীদের পাঠান বলা হয়। এরা ভারত আক্রমণ করে খৃষ্টানদের পরাজিত করেছিল।

সমগ্র সৈন্য বাহিনী নদী অতিক্রম করা অবধি সম্রাট ছাউনী তুললেন না। এই সময়টা অলস ভাবে না কাটিয়ে তিনি পণ্ডিতদের নিয়ে ধর্মালোচনা করতেন। প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি পাদ্রীর কথা বিস্মৃত হ'ন নি; পাদ্রী যাতে নিরাপদে নদী পার হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি একজন সেনানায়ককে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত করেছিলেন। নৌকার সংখ্যা পর্যাপ্ত ছিল না এবং নদীর স্রোতও ছিল তীব্র। এই জন্য নদী পার হওয়া বিশেষ বিপদ সঙ্কুল হয়, সম্পূর্ণ বাহিনীকে নদী পার হতে সময়ও লেগেছিল প্রচুর। পাদ্রীর জন্য সম্রাটের উৎকণ্ঠা লক্ষ্য ক'রে সকলেই চমৎকৃত হয়েছিল।

সম্রাটের আদেশে পাদ্রী তাঁ'র পোঁটলা খুলে ধর্মগ্রন্থগুলি বের করলেন। এই সুযোগে তিনি খৃষ্টধর্মের প্রতীক সমূহের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করলেন। কয়েকটি চিত্র দেখিয়ে তা'দের নিহিতার্থ বললেন, স্বর্ণময় টেবিল ও সোনার বাতি দানের ব্যাখ্যা করলেন। সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন যাতে সবাই তা' বুঝতে পারে। ইস্লামে বিশ্বাসীরা মূর্ত্তিপূজা ঘৃণা করে। দেবদূত ও পরীর মূর্ত্তি নির্মাণ এবং প্রতিকৃতি অঙ্কনেরও তা'রা বিরোধী। পাদ্রী তা' জানতেন। সেই জন্য ধর্মপুস্তকে অংকিত ও প্রার্থনা গৃহে রক্ষিত দেবদূত এবং সাধু সন্তদের মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলার আগে তিনি বিশেষ

---

* বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার এবং আফগানিস্থানের কিয়দংশে গান্ধার দেশ ছিল।

সাবধানতা অবলম্বন করতেন। খৃষ্টও মূর্ত্তিপূজা নিষিদ্ধ করেছিলেন। "তোমরা কেহ প্রতিমূর্ত্তি নির্মান করো না।"—এই নিষেধ দিয়ে থাকলেও যীশু, গীর্জা ও চ্যাপেলে সাধু সন্তদের মূর্ত্তি এবং দেবদূতদের প্রতিকৃতি রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই সব মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি নয়। তিনি এদের পূজা করতেও বলেন নি। সুতরাং গীর্জায় ও প্রার্থনা গৃহে সাধু-সন্তদের প্রতিমূর্ত্তি ও দেবদূতদের প্রতিকৃতি থাকলেই খৃষ্টধর্ম মূর্ত্তি পূজার প্রশ্রয় দেয় এমন কথা বলা ঠিক নয়। পাদ্রীর এই কথা শোনার পর সম্রাট যীশুর একটি ছবিকে চুম্বন করতে দ্বিধা করেন নি। পাদ্রী একথাও বলেছিলেন যে ধার্মিক লোক মাত্রই বাইবেলের সত্য ব্যাখ্যা করেন, এঁরা বলেন যে বাইবেলে উক্ত 'খোদিত মূর্ত্তি' এবং 'বিগ্রহ' শব্দের দ্বারা দৈত্য, দানব ও ভূয়া দেবতাদের কথা বলা হয়েছে। সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বর লিখিত অনুশাসন ও বাইবেলের মাধ্যমে এদের পূজা করতে নিষেধ করেছেন।

নোহর তরণী Noah's are সম্পর্কেও আলোচনা হয়। নোহর তরনী দ্বারা পরিত্রাতা যীশুকেই উদ্দেশ করা করা হয়েছে। সম্রাট সব শুনে বেশ প্রভাবিত হলেন মনে হোল। কারণ, পরিত্রাতা যীশুর প্রতীক ব্যাখ্যা তাঁ'র খুব ভালো লেগেছিল। তদ্‌গত হয়েই তিনি পাদ্রীর কথা শুনছিলেন; কিন্তু মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখাচ্ছিলেন যে মনে হতে পারে তিনি অন্য বিষয়ও চিন্তা করছিলেন। এইরূপ লোক দেখানো ভাব প্রকাশের কারণ এই হতে পারে যে তাঁ'র খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগের গভীরতা যেন তাঁ'র পরিষদরা ঠিক ধরতে না পারে।

ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে অগ্রগামী বাহিনীর সঙ্গে কাবুল শহরের অনতিদূরে মীর্জা হাকিমের সৈন্যদের এক সংঘর্ষ হয়েছে।

পনেরো হাজার মঙ্গোল অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে মীর্জা হাকিমের সেনাপতি সম্রাটের অগ্রগামী বাহিনীর চার হাজার সৈন্যের একটি দলের গতিরোধ করে। এই বাহিনী সাহায্যার্থে মানসিংহ অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁ'র পৌছনোর আগেই সম্রাট তনয় মুরাদের বাহিনীর বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। তা'দের প্রায় সকলেই পলায়নের উদ্দেশ্যে পিছু হঠতে থাকে। মুরাদ যখন দেখলেন যে তাঁ'র সৈন্যেরা পালাবার উদ্যোগ করছে, তখন তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে একটা বর্শা হাতে নিয়ে চীৎকার ক'রে বললেন, "আমি এখান থেকে এক পাও হঠে যাবো না, যদি সমগ্র শত্রুবাহিনীও আমাকে ঘি'রে ফেলে একাকীই তা'দের প্রতিরোধ করবো। এখন যা'রা পালাচ্ছে,—যুদ্ধে আমাদের জয় হলে, আমি তা'দের দেখে নেবো।" মুরাদের এই বিরোচিত কথা শুনে পলায়নোদ্যত সৈন্যদল নতুন উদ্যমে যুদ্ধ করতে লাগলো। তা'রা কিশোর বীরকে ঘিরে' ব্যূহ রচনা করলো। অল্পকাল পরেই মানসিংহ তাঁ'র বাহিনী নিয়ে পৌঁছে গেলেন। মানসিংহের সঙ্গে কিছু সংখ্যক হাতীও ছিল। হস্তী-বাহিনীই যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দেয়। উন্মত্ত হস্তীযুদ্ধের সামনে থেকে হাকিমের সৈন্যেরা দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পালাতে লাগ্‌লো।

সংবাদ পাওয়া গেল যে মীর্জা হাকিমের সঙ্গে ফরিদুন খাঁ'র কলহ বেধেছে। ফরিদুন খাঁ হাকিমকে বুঝিয়েছিল যে আকবরের সৈন্যবল কম; যুদ্ধে হাকিমের জয় সুনিশ্চিত। মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং আকবর নির্বাধায় বিপুল বাহিনী নিয়ে কাবুল রাজ্যে প্রবেশ করতে পেরেছেন—এই সংবাদ গোপন করার জন্য, বিশেষতঃ কোনও যুদ্ধকালীন কোনও জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি ব'লে মাতুলের উপর মীর্জা হাকিম অত্যন্ত বিরূপ হলেন। রাজ-

ধানীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য তিনি সৈন্যদের আদেশ করলেন।

মুরাদ মঙ্গোল প্রথানুযায়ী সৈন্যবাহিনী পরিচালন করছিলেন। শত্রু সৈন্য পিছু হঠছে দেখেও তিনি তা'দের পশ্চাদ্ধাবন করলেন না। পিতার পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করলেন।

মঙ্গোল প্রথায় সৈন্য পরিচালন পদ্ধতি এইরূপ:

সমগ্র অশ্বারোহী বাহিনীকে তিন অংশে অর্ধচন্দ্রাকারে স্থাপন করতে হয়। অশ্বারোহীদের পিছনে থাকে পদাতিক সৈন্য। তাদেরও পিছনে সাজানো হয় হস্তী বাহিনীকে। হাতীকে কখনও প্রথমে আক্রমন করতে দেওয়া হয় না। কেন না, হাতী যদি কখনও কোনও কারণে ভয় পায়, —জ্বলন্ত মশাল নিয়ে তাড়া করলে যুদ্ধের হাতীও ভীত হয়ে পড়ে, —তখন তা'কে সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। শত্রু মিত্র নির্বিবাদে সৈন্যদের পদদলিত ক'রে প্রাণভয়ে পালাতে থাকে। অশ্বারোহীদের অর্ধচন্দ্রাকারে সাজিয়ে আক্রমণের উদ্দেশ্য হোল: বাম ও ডান ভাগ সাঁড়াশীর মতো শত্রু সৈন্যদের দুপাশ থেকে চেপে ধরা, অর্ধবৃত্তের পরিধি সঙ্কুচিত ক'রে শত্রুর নড়াচড়ার জায়গা অবলোপ করা। এইরূপ চাপ সৃষ্টি করার পর হস্তী বাহিনীকে সামনে আনা হয়। হাতীর বিরাট চেহারাই ভয়ের উদ্রেক করে। কিন্তু, বন্দুকের গুলির আঘাত বিশেষতঃ গুলী যদি তা'র শুঁড়ে লাগে, তা' হলে হাতী আহত শুড় উঁচু ক'রে সামনে ছুটতে থাকে, কোনও বাধাই সে তখন গ্রাহ্য করে না। অনেক সময় আক্রমণের জন্য উষ্ট্রবাহিনীও নিয়োজিত হয়। হাতী অপেক্ষা উটও কম বিভীষিকার সৃষ্টি করে না। কামড়ে লাথি মেরে উট যখন এগিয়ে চলে তখন তা'কে বাধা দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

পেশোয়ারে পৌঁছনোর পর সম্রাট মুরাদের সংবাদ পেলেন।

আর কাল বিলম্ব না ক'রে সমগ্র বাহিনীকে দ্রুত কাবুল অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ করলেন। কোথাও না থেমে প্রতিদিন গড়ে চল্লিশ মাইল ক'রে বাহিনী অগ্রসর হ'তে থাকলো। সম্রাটের সঙ্গে ছিল বাছাই করা কয়েকটি অশ্বারোহী দল। তিনি বাহিনীকে এইভাবে বিন্যস্ত করলেন :

সিন্ধুনদের পূর্বতীরে সেনাবাহিনীর একটি বড়ো অংশকে রাখলেন। তা'র অর্ধেক পরিমাণ রাখলেন সিন্ধু ও কাবুল নদীর সঙ্গমের কাছে কাবুল রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে। মূল বাহিনীকে পিছন থেকে, বা তা'র ফিরবার সময় যাতে কোনও বিপদ বা অসুবিধা দেখা না দেয়, তা'র জন্যই এই রকম ব্যবস্থা করা হোল। পথিমধ্যে সম্রাট জালালাবাদে অবস্থান করেন। এখান থেকে কাবুলের দূরত্ব হচ্ছে তিনদিনের পথ। সম্রাটের পত্নীদের এবং পরিবারস্থ অন্যান্যদের দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন রাজা ভগবান দাসকে (২৩)।

পূর্বেই লিখেছি যে সিন্ধুনদ পার হওয়ার আগে সম্রাট স্থানীয় দুই বিবদমান উপজাতির বিরোধ মিটিয়ে দিয়েছিলেন। এদের একটি হচ্ছে দেলাজাকী উপজাতি। এই উপজাতির দুই সর্দার প্রত্যেকে চৌদ্দ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে সম্রাটের অভিযানে যোগ দিয়েছিল। তা'রা মানসিংহের সঙ্গে মুরাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে গিয়েছিল। সাহসে ও হিংস্র স্বভাবে এই ঘোড় সওয়াররা সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার ক'রেছিল। গোণ্ডারা, ঘোরিয়া এবং স্বোয়াটের, উপজাতিরাও এদের ভয় করতো। এরা পশুপালনকেই জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় ব'লে বেছে নিয়েছে। সুদখোর মহাজনের ঋণশোধে অসমর্থ হ'লে লুঠপাট ক'রেই দিন কাটাতো। আল্লা ও মহম্মদের নামে এরা প্রাণ বিসর্জন করতেও কুণ্ঠিত নয়। তা'দের দলপতিদের অন্তর্বিরোধ মিটিয়ে দেওয়ার পর এরা সম্রাটের অভিযানে

যোগ দেয়। সম্রাট এদের উত্তমর্ণ মহাজন ও সর্দারদের নিকট প্রাপ্ত ঋণ থেকে মুক্ত ক'রে দেন। এরা যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে সে জন্য সর্ববিধ সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দেন। সম্রাট তা'দের ধর্মাচরণ সম্পর্কেও পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। পাদ্রীর এটা মনঃপূত হয় নি। কেননা, সবাইকে ধর্মাচরণে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থই হচ্ছে ধর্মের হানি ঘটানো; প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী চললে অন্যদের ধর্মাচরণে ক্ষতি হয়।

পেশোয়ার একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। সামারিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে একে সুরক্ষিত শহর বলা যায় না। মীর্জা হাকিম এখানে কিছু সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন, কিন্তু মানসিংহ এগিয়ে আসছেন এই খবর পেয়েই তা'রা দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যায়। শান্তির সময় এই শহরে সর্বদাই একটি ক্ষুদ্র সেনানী বাহিনী থাকে। সম্রাট পেশোয়ারে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় লোকজন কাউকেই দেখতে পান নি, সবাই আতঙ্কে শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পেশোয়ারের জনসংখ্যা দুই হাজারের মতো হবে। সম্রাট বাহিনী নিকটবর্তী হলে শহরের অধিবাসীরা হাকিমের আদেশে শহরের যাবতীয় বাড়ীঘর ও শস্য-ভাণ্ডার পুড়িয়ে দিয়েছিল।

পেশোয়ার শহরের পূর্বপ্রান্তে একটি পাহাড আছে। বালনাথ সম্প্রদায়ের মতো এখানেও এক যোগী সম্প্রদায় থাকে; তা'দেরই মতো এদের ধরণ ধারণ ও বেশ ভূষা। স্থানীয় লোকজন এদের এলাকাকে 'গোরখত্রী' বলে (২৪)। এই যোগী সম্প্রদায় মনে করে যে এই পাহাড়কে কেন্দ্র করেই ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন! সম্রাট এদের আস্তানায় গিয়ে সেবারের মতোই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম

করেন, এবং আকাশের দিকে দুহাত বাড়িয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন।

খাইবার

সম্রাট আকবর বাহিনীকে ছাউনী গুটিয়ে কাবুল অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। দুদিনের পথ এগিয়ে মুরাদও কাবুল অভিমুখে তাঁর বাহিনী পরিচালিত করছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই দুপাশে খাড়া পাহাড় ও একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথে পৌঁছনো হোল। এর নাম খাইবার গিরিবর্ত্ম। এখানে সম্রাট বাহিনীকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়। প্রাচীনকালে এই গিরিবর্ত্মকে 'কাপিশোনিয়ান গিরিপথ' বলা হোত (*)। অসমতল, পাথর ও নুড়িতে সমাচ্ছন্ন এবং হঠাৎ খাড়াই এই পথ হাতী, উট এবং বিরাট বাহিনীর চলার বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অগ্রগামী পূর্তকর্মী দল অবশ্য যথা সম্ভব করেছিল, কিন্তু তা' ছিল হাল্‌কা কাজ চলা গোছের। বহু সংখ্যক হাতী ও উটের পায়ের ও খুরের আঘাতে সেই মেরামৎ করা পথ অচিরেই জীর্ণ ও টুটে ফেটে যায়। উটগুলির বিপদই চরমে উঠেছিল। অতি সতর্কভাবে জন্তুগুলিকে এগিয়ে নেওয়া হয়। এক পা এদিক ওদিক হলে পথের পাশের গভীর খাদে পতন অনিবার্য। সম্রাটপরিবারের মহিলারা হাতীর পিঠে যাচ্ছিলেন। এদের মধ্যে বাংলাদেশের বিদ্রোহী প্রাক্তন

---

* প্রাচীনকালে গ্রীকরা খাইবার গিরিপথকে 'কাপিশোনিয়ান গিরিবর্ত্ম' বলতো। গিরিবর্ত্মের মাঝামাঝি কোথাও 'কপিশ' নামে এক শহর ছিল ; পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বলা হোত 'কাপিশান'। গ্রীক ভাষায় 'কপিশ' শব্দের অর্থ 'পার্বত্য'। ইতিহাস খ্যাত Cyrus এই নগরী ধ্বংস করে।

নবাব দাউদের স্ত্রী ও কয়েকটি প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাও ছিল। দাউদ ছিলেন জাতিতে পাঠান; সুলেমান কাররানির দ্বিতীয় পুত্র। দাউদ মুঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আকবর তাঁ'কে শায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে সেনাপতি খাঁ জাহান এবং টোডরমলকে প্রেরণ করেন। ওড়িষার বালেশ্বরের নিকটে এক যুদ্ধে দাউদ পরাজিত ও বন্দী হ'ন। তাঁর মুণ্ড কেটে সম্রাটের কাছে কাটামুণ্ড পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দাউদের বেগমদের এবং কন্যাদেরও সশস্ত্র প্রহরায় আকবরের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সম্রাট এদের সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করেন। সাধারণ বন্দীর মতো তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা অসম্মান করেন নি। এদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার এক গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। কাবুল যাওয়ার পথের এক বিস্তীর্ণ অংশ দুর্ধর্ষ পাঠান অধ্যুষিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। যদি পাঠান উপজাতিরা সম্রাটের অভিযানে কোনও বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করে, তা'হলে মুহূর্ত মধ্যে তিনি দাউদের স্ত্রী কন্যাদের সম্মানিতা অতিথির মর্যাদা থেকে বিচ্যুত ক'রে সাধারণ বন্দিনী বা ক্রীতদাসীর পর্যায়ে নামিয়ে দিতে পারবেন। বাংলার পাঠান নবাব দাউদের পরিবার যে সম্রাটের সঙ্গেই ছিল, এ সংবাদ পাঠানদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যুবরাজ সেলিম সম্রাটের মূল বাহিনীর চলাচল ব্যবস্থার কর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিল। তিনি আদেশ দিলেন যে সর্বাগ্রে হাতী ও উটের বাহিনী খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করবে। এদের চলে যাওয়ার পর চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হোল ঘোড়াদের; ঘোড়া নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। সম্রাটের অন্তঃপুরিকারা সকলেই হস্তী পৃষ্ঠে ছিলেন। সর্বাগ্রে তাঁদের যেতে দিয়ে সেলিম তাঁদের সম্মানিত করলেন। আগে আগে চলে সেলিম গিরিপথের সর্বোচ্চ একটি

জায়গায় অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষা করছিলেন। সমগ্র বাহিনী নিরাপদে গিরিবর্ত্মের সর্বোচ্চ অংশ অতিক্রম করার পর তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে বাহিনীর সম্মুখভাগে স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

খাইবার অতিক্রম করার পর একটি উচ্চ সমতল স্থানে বাহিনীর জন্য শিবির পাতা হোল। জায়গাটির নাম 'আলি মস্‌জিদ'। কিম্বদন্তী এই যে মহম্মদের জামাতা আলি যখন কাফেরদের নিকট মহম্মদের পবিত্র ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করছিলেন, সেই সময় এই স্থানে তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেন। স্থানীয় এক সর্দারের কন্যাকে তিনি প্রলুব্ধ করেন। সর্দার এ ব্যাপার জানতে পারে এবং ক্রুদ্ধ হয়ে যথোচিত শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে। প্রকাশ্যে কিছু করা সঙ্গত হবে না মনে করে' একটি কৌশল গ্রহণ করে। আলি যখন নামাজ পড়ছিলেন তখন মস্‌জিদের দিকে লক্ষ্য করে' পার্শ্ববর্তী উঁচু গিরিশিখর থেকে একটি বড়ো পাথর গড়িয়ে দেওয়া হয়। নামাজের সময় মুসলমান মাত্রই মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' রাখে, আলিরও দৃষ্টি ছিল মাটির দিকে। পাথর গড়িয়ে আসার শব্দ তিনি শুনতে পেয়েছিলেন; কিন্তু একটুও বিচলিত হ'ন নি, নামাজ পড়াও বন্ধ করেন নি। তিনি শুধু দুহাত দিয়ে বেগে গড়িয়ে আসা পাথরের চাঁইটা ধরে' ফেললেন। বলা হয় যে আলির আঙুলের দাগ পাথরটাতে লেগে আছে। পাদ্রী মনে করেন যে এটা কুসংস্কার প্রসূত এক আজগুবি গল্প। আজমিরে খাজা মৈনুদ্দীন চিস্তির (*) কবরও একটি পবিত্র

---

* আজমিরে খাজা মৈনুদ্দীন চিস্তি সিগিজির কবর মুসলমানদের নিকট একটি পবিত্র তীর্থ। ইনি ছিলেন ইসলামের প্রবর্তক মহম্মদের অনুচর। ইসলামের প্রচারকল্পে তিনি ভারতে আসেন এবং এদেশেই দেহ রক্ষা করেন। আকবর একাধিক বার চিস্তি সাহেবের কবর পরিক্রমায় গিয়েছিলেন।

স্থান বলে 'মুসলমানরা মনে করে'। অথচ মসজিদটি জীর্ণ; এমন কি, তা'র ছাদ পর্যন্ত নেই। গিরিবর্ত্মের সর্বোচ্চ স্থানেই এই আলি মসজিদ। পাশেই একটি ঝরনা, জল পড়ে' পড়ে' একটি স্রোতস্বিনী সৃষ্টি হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি মনোরম।

এর পর এলো খাইবার গিরিপথের সর্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ অঞ্চল। দুই পাশে সউচ্চ দুইটি গিরিশৃঙ্গ। সাজ সরঞ্জাম ও পিঠে মাল নিয়ে একটি হাতী সন্তর্পণে চলতে পারে, পথ এত সরু শ'খানেক লোক পথ আগলে দাঁড়ালে একটা বিরাট সৈন্য বাহিনীও কাবু হতে পারে।

এই খাড়াই অঞ্চল পার হওয়ার পর পাওয়া গেল ক্রমাগত ঢালু পথ। হাতী ঘোড়া উট প্রভৃতি পশুগুলিকে ধীরে ধীরে চালিয়ে নেওয়া হোল। তথাপি, ছোট রকমের কয়েকটা দুর্ঘটনা এড়ানো যায় নি। পদাতিক সৈন্য ও ভৃত্যের দল দৌড়িয়ে চলতে লাগলো। কামান ও রসদবাহী পশুগুলিকে পাহাড়ের অন্য পথ দিয়ে ঘুরিয়ে নেওয়া হোল। ঢালু পথ পাহাড়ের গা বেয়ে নীচুতে একটি অল্প-পরিসর সমতল ভূমিতে পড়েছে। সেখানে সম্রাটের শিবির খাটানো হোল। স্থানটির নাম খাইবার। প্রায় ষোল মাইল দীর্ঘ খাইবার গিরিপথই ভারত প্রবেশের স্বল্পতম দূরত্বের পথ। এই পথ ধরেই গ্রীক ও কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল থেকে বিভিন্ন শতাব্দীতে অভিযাত্রীরা ভারতে এসেছে। এই গিরিপথের ঠিক মধ্যবিন্দুর অবস্থিতি হচ্ছে ৩৪ডিগ্রি উত্তর দ্রাঘিমা এবং ১১০ ডিগ্রি পূর্ব অক্ষাংশ (*)। গিরিপথটি সোজা পূর্ব-পশ্চিম বরাবর প্রলম্বিত।

---

* মোন্‌সারেটের প্রদত্ত তথ্য ঠিক নয়। খাইবারের মধ্যবিন্দুর ভৌগলিক অবস্থিতি হচ্ছে ৩৪'৫ ডিগ্রি উত্তর দ্রাঘিমা, এবং ৭১'৫ ডিগ্রি পূর্ব অক্ষাংশ।

সম্রাট যে জায়গায় শিবির পেতেছিলেন তা'র পশ্চিম দিকে একটি উঁচু পাহার ঢালু হয়ে সমতল ভূমিতে মিশেছে। একটি প্রাচীন শহরের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা বাড়ীঘর সেখানে ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে। শোনা যায়, ওখানে একটি শহর ছিল, নাম 'লাণ্ডিখানা' এর অর্থ হোল 'মেয়েদের শহর'। ঐ শহরের মেয়েরা আমাজন নারীদের মতো যুদ্ধ করতে জানতো (*)। গিরিপথে ভ্রমণরত একাকী পথিকদের ধ'রে এনে বন্দী ক'রে রাখতো, এবং তাদের সাহায্যে বংশ রক্ষা করতো।

লাণ্ডিখানার কিছু পরে 'শহর গোলাম'। এটাও এক পরিত্যক্ত শহর, এখানেও দেখা যায় পুরোণো ভাঙ্গা বাড়ীঘর। প্রবাদ এই যে বিভিন্ন স্থানে যাদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হোত, তাদের কেউ কেউ পালিয়ে এসে এই শহরে আশ্রয় নিত। চারদিকে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী; দলবদ্ধ আক্রমণের সম্ভাবনা দেখলে পলাতক দাসগুলি পাহাড়ের দুর্গম সব খাঁজের ভিতর আত্মগোপন করতো। সুযোগ পেলেই এরা খাইবার গিরিপথে ভ্রমণকারী যাত্রীদের উপর হামলা ক'রে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতো। গ্রীষ্মকালে জলকষ্ট এড়াবার জন্য কয়েকটি পুকুর খনন করেছিল: নিকবর্তী পর্বতের গা বেয়ে বৃষ্টির জল এই সব পুকুরে এসে জমা হোত এবং সারাবছর স্থানীয় অধিবাসীদের প্রয়োজন মেটাতো।

* পাদ্রী লাণ্ডিশব্দের ভুল মানে করেছেন পুশ্তু ভাষায় 'লাণ্ডি' মানে নদী। আমাজন স্ত্রীলোক সদৃশ মেয়েরা এখানে ছিল, এ তথ্যের কোনও ভিত্তি নেই।

খাইবার গিরিপথ সম্পূর্ণ অতিক্রম ক'রে সম্রাটের বাহিনী বিদৌলা পাহাড়ের কাছে 'বিস্‌সারম' নামে একটি ছোট শহরে পৌঁছয়। বিদৌলার আর এক নাম হচ্ছে বেদৌলত। দৈর্ঘ্যে প্রায় চার হাজার এবং উচ্চতায় দুই হাজার ফুট। সম্পূর্ণ পাহাড়টিই একটি অখণ্ড পাথরের চাঁই—বোল্‌ডার বিশেষ। পাহাড়ের উপর কোনও গাছ, গুল্ম এমনকি একটা ঘাস পর্যন্ত নেই। সম্রাট আকবরের পিতা হুমায়ুন একবার এদিকে এসেছিলেন; তিনিই এই পাহাড়ের প্রাকৃতিক অবস্থা দেখে এর নামকরণ করেছিলেন—বেদৌলত, মানে 'নিঃস্ব'। পাহাড়ের উঁচুতে কয়েকটি গুহা আছে, সেখানে নাকি কিছু সংখ্যক সাধু সন্ন্যাসী আছে। পাদ্রী মনে করেন যে একশ্রেণীর তথাকথিত সাধু সন্ন্যাসী ভড়ং ও বুজরুগিতেই পারদর্শী তা'দের পক্ষে এরূপ দুর্গম ও জনহীন স্থানে কায়ক্লেশে থাকা ও তপস্যা করা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসল কথা এই যে, প্রভু যীশুর অনুগামী সেন্ট বার্থলেমিউ যখন প্রভুর বাণী ও মহিমা প্রচার করতে এই অঞ্চলে এসেছিলেন, তখনও তাঁ'র অনুচর সজ্জন সন্ন্যাসীরাই নির্জনে তপস্যা করার অভিপ্রায়ে এইসব গুহা বানিয়েছিলেন।

দুই দিন চলার পর আমরা জালালাবাদ শহরে পৌঁছলাম। শহর থেকে এক মাইল দূরে কাবুল নদী। নদীর পারেই সম্রাটের শিবির পাতা হে'ল। পাদ্রী মোন্‌সারেট অগ্রগামী বাহিনীর নায়ক মুরাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কাবুল নগরীর প্রায় উপকণ্ঠেই মুরাদের বাহিনী উপস্থিত হয়েছিল। যদি কাবুল আক্রমণ করতেই হয়, তা'হলে বাহিনীর পক্ষে পাদ্রী ভারস্বরূপ হয়ে উঠবে; সেইজন্য, পাদ্রীর সম্পর্কে মুরাদ সম্রাটের নির্দেশ জানতে চাইলেন। সম্রাটও সব দিক বিবেচনা ক'রে,

বিশেষতঃ যুদ্ধ সম্পর্কে পাদ্রীর অনভিজ্ঞতা ও শারীরিক অপুটতার বিষয় বিবেচনা ক'রে, —পাদ্রীকে মূল শিবিরে ফিরিয়ে দিতে বললেন। শাহ্জাদা মুরাদ পাদ্রী মোন্সারেটকে খুবই সম্মান করতেন। যে কয়দিন পাদ্রী মুরাদের বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন, মুরাদ তাঁ'র সুখ-সাচ্ছন্দ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

মুরাদের বুদ্ধি বিবেচনা এবং আদব কায়দা বেশ প্রশংসনীয় ছিল। রাজা ভগবান দাসের পরামর্শক্রমে মুরাদ সর্বদাই সশস্ত্র দেহরক্ষীদের প্রহরায় শিবিরের বাইরে চলাফেরা করতেন। মিঞা খাঁ ছিলেন মুরাদের বাহিনীতে সর্বপ্রকার সরকারী চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেদ ফর্মান ফতোয়া প্রভৃতি বিষয়ক প্রধান কর্মচারী। মুরাদের হুকুম ছিল যে তাঁ'র ছাউনীর কোথায়ও গণ্ডগোল দেখা দিলে কঠোরতা অবলম্বন করা এমন কি মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞাও দেওয়া যেতে পারে। মিঞা খাঁ শাহ্জাদা মুরাদের এই নির্দেশ অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গেই পালন করতো।

খাইবার গিরিপথ থেকে কাবুল নগরীর অর্ধেক দূরত্বে সম্রাটের মূল বাহিনীর শিবির পাতা হোল। এই স্থানটি বিশেষ পর্বতসঙ্কুল এবং চারিদিকেই গভীর অরণ্য। পর্বত শৃঙ্গগুলি সারা বছরই তুষারে ঢাকা থাকে। জুলাই মাসে তুষার গলা শুরু হয়। এখন গ্রীষ্মকাল; কিন্তু কাবুল নগরী ও সন্নিকটস্থ অঞ্চল বেশ ঠাণ্ডা। বরফ গলা জল হাওয়াকে শীতল করে দেয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই অঞ্চলে কখনও খাদ্যাভাব হয় না। কারণ, কাবুল উপত্যকার সর্বত্রই ফলবান গাছ প্রচুর আছে। উপত্যকার গাছগুলিতে তুষার পড়ে না; চারপাশের' উঁচু পাহাড়গুলিই প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে তুষার আক্রমণ ঠেকিয়ে থাকে। আঙ্গুর, পীচ, আখ্রোট, ডুমুর ও অন্যান্য সুস্বাদু ফলের বাগান এখানে

অজস্র। স্থানীয় অধিবাসীরা জাতিতে পাঠান; চলতি কথায় 'আফগান' বলা হয়। কৃষিই এদের প্রধান উপজীবিকা। মাল বহনের জন্য ভারবাহী পশু ও নদী পারাপারের ও নদীপথে মাল-বহনের জন্য নৌকা ব্যবহারে এরা অভ্যস্ত নয়। মালপত্র বস্তাবন্দী ক'রে নিজেদের পিঠের সঙ্গে বেঁধে হেঁটে দূরপথ অতিক্রম করতে পারে। ষাঁড়ের চামড়ায় তৈরী 'মশক' তৈরী ক'রে জলে ভাসিয়ে দেয় এবং নৌকার বিকল্পে মশক চ'ড়ে নদী পারাপার করে। গান বাজনা এদের বিশেষ প্রিয়। এশিয়ার অন্যান্য জাতির মতো এদের গানের সুর কোমল ও করুণ নয়; বরঞ্চ ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের মতো।

জালালাবাদের শাসন কর্তার বাসভবনটি প্রকৃতিক দিক দিয়ে বেশ সুরক্ষিত। পূর্বদিকে উঁচু মালভূমি, কাবুল নদীর তীর পর্যন্ত প্রসারিত। অন্য তিন দিকে গভীর বন। ফরিদুন খাঁ এখানে আগে শাসনকর্তা ছিলেন। আকবরের সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে এই খবর পেয়ে মীর্জা হাকিমের নিষেধ সত্ত্বেও পলায়ন করেন।

কাবুল নগরী উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত। শীতকালে এত ঠাণ্ডা হয় যে নগরীর অধিবাসীরা সে সময়ে জালালাবাদ চলে আসে। সেই সঙ্গে কাবুলের শাসনকর্তা, আমীর ওমরাহ এবং সৈন্য বাহিনীও কাবুল থেকে নেমে আসে। প্রকৃতপক্ষে জালালাবাদ হচ্ছে কাবুল রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী। কাবুল নগরী দুই কারণে প্রসিদ্ধ। প্রথমতঃ— প্রাদেশিক রাজধানী ব'লে, দ্বিতীয়তঃ— বাণিজ্য কেন্দ্র ব'লে। ভারত পারস্য ও তাতার দেশগুলিতে সওদা নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যবসায়ীরা এখানে জড়ো

হয়। বিখ্যাত বোখারা (*) ও বাল্তিস্তান (†) প্রভৃতি দেশগুলিতে যাওয়ার পার্বত্য পথগুলি কাবুল থেকেই শুরু হয়েছে; ইয়োরোপ ও এশিয়ার বিরাট পর্বতগুলিও এখানে মিলিত হয়েছে। হিন্দু-কুশ, পামির এবং হিমবাহ (প্রাচীন গ্রীকরা বলতো পারোপনিসুস্, ইমায়ুস্, এমোদুস্, ইমোদি, প্রভৃতি) —এই তিন বৃহৎ পর্বতমালা কাবুল রাজ্যেই নিজ নিজ প্রান্তসীমা প্রসারিত করেছে। পর্বত এবং অরণ্য হচ্ছে কাবুল রাজ্যের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এই দেশে তৈমুর লঙ-এর স্বজাতি বাস করতো। অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং লুঠতরাজই ছিল এদের পেশা। কালক্রমে এরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং একটি শাখা খাইবারের পথে ভারতে প্রবেশ করে।

কাবুল

শাহ্‌জাদা মুরাদের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযাত্রী বাহিনীর অগ্রগামী দল জালালাবাদে উপস্থিত হতেই কাবুলে নানাবিধ গুজব রটতে থাকে। সকলেই একবাক্যে বলতে থাকে; এবার হাকিমের পতনও মৃত্যু অনিবার্য। জনরব একেবারেই ভিত্তিহীন ছিল না, কেন না কয়েক দিনের মধ্যেই মীর্জা হাকিম সদলবলে রাজধানী ছেড়ে পালালেন। তাঁ'র দুইটি ছোট ছেলেও তাঁ'র সঙ্গে ছিল। পালাবার সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে ছোট ছেলেটি প'ড়ে যায়, কিন্তু তাঁ'কে বাঁচানো যায় নি; পলায়নকারী অন্যান্য ঘোড়সওয়াররা

---

* গ্রীক নাম 'সোগ্দানিয়া'।

† বাল্খ্ বা প্রাচীন ব্যাক্ট্রিয়া।

নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য উর্ধশ্বাসে ছুটছিল, ঘোড়ার খুরের আঘাতে বাচ্চা ছেলেটি থেঁৎলে পিষে গিয়েছিল। এর মৃতদেহ পাওয়া যায় নি, তা'র জন্য কোন অনুসন্ধানও করা হয় নি। মীর্জা হাকিম জনা কয়েক বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে একটি উঁচু পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করার পথ একটি মাত্রই ছিল।

মীর্জা হাকিমের পলায়ণের সংবাদ পেয়ে সম্রাট আকবর কাবুলের জনগণের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন যে তাদের কোন আশঙ্কার কারণ নেই। ব্যবসায়ী, শ্রমজীবি এবং সাধারণ নাগরিক, —কারো প্রতিই সম্রাটের বৈরিতা নেই। তিনি এসেছেন তাঁ'র বিদ্রোহী ভ্রাতা ও তা'র অনুগত সৈন্য ও দলীয় ব্যক্তিদের দমন করতে। সম্রাটের এই ঘোষণায় সুফল পাওয়া গেল। নাগরিকরা শান্ত হয়ে সম্রাটের আগমণের প্রতিক্ষা করতে লাগলো। অবশেষে সম্রাট আকবর সসৈন্য কাবুল নগরীতে প্রবেশ করলেন।

প্রাসাদে উপস্থিত হ'লে আকবর বেশ খানিকটা আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়েন : এখানেই তাঁর পিতা এবং পিতামহ রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের কথা সম্রাট মনে করে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

কাবুলে প্রবেশ করার আগে সম্রাট-বাহিনীকে দুইটি দুর্ঘটনায় পড়তে হয়। শাহ্জাদা মুরাদের সৈন্যদলের বেতন বাবদ পনেরো হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে যথেষ্ট সৈন্যের পাহারায় একটি খাজাঞ্চীকে সম্রাট প্রেরণ করেছিলেন। পথিমধ্যে মীর্জা হাকিমের সৈন্যরা এদের উপর হামলা করে। খাজাঞ্চী বা তার প্রহরায় প্রেরিত সৈন্যরা কোনও বাধা দেয়নি। হাকিমের সৈন্যরা সমুদয় স্বর্ণমুদ্রা লুঠ ক'রে

পর্বত কন্দরে লুকিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় দুর্ঘটনা ঘটে শেখ জামালকে নিয়ে। শেখ জামালের ভগ্নী গহরুন্নিসা বেগম ছিলেন আকবরের প্রিয়তমা মহিষীদের অন্যতমা। একশ' সৈন্য নিয়ে শেখ জামাল কাবুলের দিকে এগিয়ে আসছিলেন ; হঠাৎ মীর্জা হাকিমের সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করে। শেখ জামাল বা তার সৈন্যরা আকস্মিক আক্রমণে বিমূঢ় হয়ে পড়ে, তারা কোনও প্রতিরোধই করতে পারেনি। অবশ্য তারাপ্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, এবং কোনও রকমে সম্রাটের শিবিরে পৌছতে পেরেছিল। কিন্তু এই অপমানকর ঘটনায় শেখ জামাল কাউকে মুখ দেখাতে পারছিলেন না। তিনি মাথা মুড়িয়ে ছিন্নবস্ত্রে ফকীর সেজে ছাউনী ত্যাগ করেন। এই সংবাদ পেয়ে লোক পাঠিয়ে সম্রাট তাঁকে ফিরিয়ে আনেন, এবং বলেন যে যুদ্ধে জয় পরাজয়ের অনিশ্চয়তা থাকবেই, তারজন্য সর্বদা সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়। ফকির হয়ে পালিয়ে যাওয়ার কোনও অর্থই হয় না।

সম্রাট সাতদিন কাবুলে অবস্থান করলেন। এই সময় বাদকশানের খাজা হাসানের পত্নী বক্‌ত্‌উন্নিসা সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আগেই বলা হয়েছে যে এই মহিলা হলেন হাকিমের সহোদরা এবং আকবরের বৈমাত্র বোন। তিনি এসেই মীর্জা হাকিমের কৃত অপরাধের জন্য হাকিমের হয়ে সম্রাটের মার্জনা ভিক্ষা করলেন। সম্রাট কিন্তু সোজাসুজি তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন না। তিনি কাবুল রাজ্যের শাসনভার বক্‌ত্‌উন্নিসার উপর ন্যস্ত করলেন। (অবশ্য, বক্‌ত উন্নিসাও কৌশলে কয়েকদিন পরে হাকিমের হাতেই রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ ক'রে বাদকশান ফিরে যান)।

আকবর ঘোষণা করলেন যে মীর্জা হাকিমের সঙ্গে তাঁর

কোন সম্পর্কই অবশিষ্ট রইলো না। তিনি আদেশ জারী করলেন যে কেউ যেন কখনও তাঁর সামনে হাকিমের নামোচ্চারণও না করে। এও প্রচার করলেন যে প্রয়োজন বোধ করলেই তিনি রাজ্যশাসনের অধিকার বক্ত্‌উন্নিসার হাত থেকে নিজ হাতে নিয়ে নেবেন। তিনি আরও জানালেন যে মীর্জা হাকিম কাবুলেই থাকুন বা যেখানেই থাকুন সম্রাটের সে বিষয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। তবে, বক্ত্‌উন্নিসার অনুরোধে শীঘ্রই কাবুল ত্যাগ করে ভারতে নিজ রাজধানীতে ফিরে যাবেন একথাও বলা হোল। আকবর বক্ত্‌উন্নিসাকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে মীর্জা হাকিম আবার যদি দৌরাত্ম শুরু করেন তবে তাঁকে রেহাই দেওয়া হবে না। নিজের স্বার্থ ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার বয়স নিশ্চয়ই হয়েছে। মীর্জা হাকিম যদি আর কোনও উপদ্রব না করেন, তা হলে সম্রাটও তাঁর ক্ষতিকারক কিছু করবেন না। যদি হাকিম আবার পাগলামী করে, সম্রাট তাঁকে ক্ষমা করবেন না। তিনি ইচ্ছা করলেই হাকিম যেখানে আত্মগোপন করে রয়েছে, সেই পার্বত্য এলাকা চারদিক থেকে অবরোধ করে তাঁকে অনাহারে মেরে ফেলতে পারেন; কিন্তু তিনি তা' করবেন না। কেননা, তিনি বক্ত্‌উন্নিসার সানুনয় মার্জনা ভিক্ষা মঞ্জুর করেছেন।

সকলকে শুনাইয়াই আকবর উপরোক্ত বক্তব্য প্রকাশ করলেন। তারপর কাবুল রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার দলিলপত্র সম্পাদন করে বক্ত্‌উন্নিসাকে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব দিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করলেন।

ফেরা

শিবির গুটিয়ে সৈন্যবাহিনী ভারত অভিমুখে রওনা হোল। সম্রাট তা'দের বিদায় দিয়ে কতিপয় রক্ষী নিয়ে জালালাবাদে উপস্থিত হলেন। মূল বাহিনীর সঙ্গে পাদ্রী মোন্সারেটও ছিলেন। সকলে এগিয়ে এসে সম্রাটকে অভ্যর্থনা করলো। পাদ্রীর মাধ্যমে সুদূর স্পেন ও পর্তুগালে তাঁ'র গৌরব বার্তা প্রচারিত হবে, সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্য নিয়েই সম্রাট পাদ্রীর অভ্যর্থনাই সমধিক হর্ষ সহকারে গ্রহণ করলেন।

এর পরই সত্যসত্যই ফতেপুর সিক্রি প্রত্যাবর্তনের পালা শুরু হোল। বিনা রক্তপাতে লড়াই শেষ হোল। এই কথা গর্ব সহকারে কয়েকজন সেনাপতিকে বলার পর সম্রাট হঠাৎ পাদ্রীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন যে আফ্রিকায় এক যুদ্ধে চারঘণ্টার মধ্যে চারজন রাজা কি ক'রে নিহত হোল ? ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে পর্তুগাল-রাজ সেবাস্তিয়ান আল্‌কাজার 'কিবির' নামক উত্তর আফ্রিকার একটি জায়গায় মূরদের বিরুদ্ধে লড়াইতে অন্যান্য কয়েকজন মুসলমান সরদারের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা'রা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। পাদ্রী ঐ যুদ্ধের আনুপূর্বিক বিবরণ দিলে সম্রাট এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে যা'রা বেপরোয়া হাতাহাতি লড়াই করে তিনি তা'দের প্রশংসা করতে পারেন না। সেই সঙ্গে এই কথাও বললেন যে যা'রা কাপুরুষের মতো নিজেদের শরীরকে নিরাপদে রাখা শ্রেয়ঃ মনে করে তিনি তা'দের নিন্দা না ক'রে পারেন না। যে সব তরুণ সৈন্য সমুদ্র পার হয়ে নিজেদের নিরাপত্তার বিষয় ভুলে গিয়ে সংগ্রাম করে, সম্রাট তা'দের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। সম্রাট সেবাস্তিয়ানের মতো আকবরও অসমসাহসী ও বিপদে ভ্রুক্ষেপহীন ছিলেন।

দুর্গম খাইবার গিরিপথের কথা ভেবে পাদ্রী স্থির করলেন যে মূলবাহিনী গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করার আগেই তিনিও পথ পার হয়ে যাবেন; কেন না, হাতী, ঘোড়া, উট এবং বিরাট এক বাহিনীর চলার পর খাইবার গিরিপথ একেবারেই দুর্গম হয়ে উঠবে। তিনি একাকী এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন; সম্রাটও রাজী হলেন।

মূল বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে অরক্ষিত অবস্থায় একাকী এগিয়ে যাওয়া পাদ্রীর পক্ষে যথেষ্ট হঠকারিতা হয়েছিল। খাইবার গিরিপথের বিক্ষিপ্ত পাথরের নুড়িগুলি ইতিমধ্যেই বর্ষার প্রকোপে পথ চলার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। ছোট বড়ো নানা আকারের খণ্ড পাথর ও নুড়ির উপর দিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে পা ফেলতে হয়। পাদ্রীর গতি অতিশয় মন্থর হয়ে পড়েছিল। এমন সময় একদল মুসলমান যাত্রীর সঙ্গে তাঁ'র দেখা হোল। তা'দের একজন এগিয়ে এসে পাদ্রীর পথরোধ ক'রে দাঁড়ালো। তারপর সেই লোকটি ও পাদ্রীর মধ্যে নিম্নোক্ত প্রকার বাক্যালাপ হোল:—

"তুমি কি মহম্মদকে বিশ্বাস করো?"

পাদ্রী তদুত্তরে বললেন, "নিশ্চয়ই না।"

"কেন?"

"কারণ, আমি বিশ্বাস করিনা যে তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত।"

"তুমি কোরাণে বিশ্বাস করো?"

"না।"

"না কেন?"

"কারণ, উহা ঈশ্বরের পুস্তক নয়।"

তখন ঐ লোকটি অন্যান্য মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে বললো, "ইয়া আল্লা! শুনুন আপনারা, এই অবিশ্বাসী কাফেরের

কথা শুনুন। লোকটা বলে কিনা যে সে মহম্মদকে মানে না, অল্‌কোরাণেও এর বিশ্বাস নেই!”

লোকটা বেশ চেঁচিয়েই কথাগুলি বার কয়েক বললো। লোকগুলি পাথর ছুঁড়েই পাদ্রীকে মেরে ফেলতে পারতো। কিন্তু, তাঁ'র ফলে সম্রাট আকবর ক্রুদ্ধ হয়ে তা'দের বধ করার নির্দেশ দিতে পারেন, তাই শেষ পর্যন্ত ওরা পাদ্রীকে হত্যা করলো না।

সম্রাট খাইবার গিরিপথের পাশে অবস্থিত আলি মস্‌জিদের নিকটে পৌঁছে কিছু সময় বিশ্রাম করলেন। প্রচুর ভিখারীর উৎপাত হচ্ছিল। প্রায় হাজার তিনেক ভিখারী কাবুল থেকে সারাপথ সম্রাট বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আসছিল, এবং সৈন্যদের কাছে এটা ওটা চেয়ে বিরক্ত করছিল। সম্রাট আলি মস্‌জিদের সামনে তা'দের প্রত্যেককে একটি ক'রে স্বর্ণমুদ্রা ভিক্ষা দিলেন। তারপর মস্‌জিদে গিয়ে নামাজ পড়লেন। উপস্থিত ভিক্ষুকরা এবং স্থানীয় অধিবাসীরা সম্রাটের বদান্যতা ও ধর্মীয় আচার ব্যবহার দেখে খুব প্রীত হোল।

পারস্য সম্রাট দরায়ুসের যে সাম্রাজ্য একদা অতি দূর দূরান্ত অবধি বিস্তৃত ছিল, তা'র পূর্ব প্রান্তীয় দেশের নাম গান্ধার। গান্ধারের পূর্ব সীমানার পরেই হিন্দুস্থানের সিন্ধুদেশ। খাইবার গিরিপথের পাশে একটি প্রাচীন শহর ছিল; গ্রীক লেখকরা এর নাম 'কপিশ' ব'লে উল্লেখ করেছে। এখন এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নির্জন। সম্রাটের বাহিনী এর পাশ দিয়ে গিয়েছিল।

কাবুল যাওয়ার সময় সম্রাট প্রত্যহ প্রকাশ্যে নামাজ পড়তেন। তাঁ'র নামাজ পড়ার জন্য তাঁবুর পাশে একটি ছোট তাঁবুও নির্মিত হোত। কাবুল থেকে ফেরার পথে এই সাদা তাঁবু

আর নির্মিত হয় নি; সম্রাটও লোক-দেখানো ধার্মিকতার ভড়ং করেন নি।

খাইবার গিরিপথ অতিক্রান্ত হওয়ার পর একটি জায়গায় অধিবাসীদের বাড়ীঘর সম্রাটের আদেশে পুড়িয়ে দেওয়া হোল। কাবুল যাওয়ার সময়ে ন্যায্য মূল্যের বিনিময়েও এখানকার লোকেরা সম্রাট বাহিনীকে খাদ্য শস্য বিক্রয় করতে রাজী হয় নি। মীর্জা হাকিমের চক্রান্তেই ওরা ঐরকম করেছিল। সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা বাড়ী ঘর ছেড়ে নদীর অপর তীরে পালিয়ে গিয়েছিল। দূর থেকে অসহায়ার মতো বাড়ীঘর ক্ষেত খামার পুড়তে দেখলো।

সম্রাট কাবুল নদীর তীরে এসে কয়েকদিন অপেক্ষা করলেন বর্ষা শেষ হয়ে এখন শীত এগিয়ে আসছে। পর্বতে বরফ-গলাও বন্ধ হয়ে এসেছে। নদী এখন অনেকটা শীর্ণ, অগভীর স্রোতেও বিশেষ বেগ নেই। সিন্ধুনদের সংযোগস্থলের নিকটেই একটি ভাসমান নৌকার সেতু বানানো হোল।

সিন্ধু নদ পার হয়ে সম্রাট কাশ্মীর অভিমুখে চললেন। কাশ্মীরের রাজা এককালে সম্রাট আকবরের নিকট অনেক সহায়তা ও সুবিধা পেয়েছিলেন, কিন্তু কখনও সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। সম্রাট যখন কাবুল অভিমুখে যাচ্ছিলেন, তখন কাশ্মীর-রাজের কাছ থেকে সৈন্য বাহিনীর জন্য রসদ, জল, এমন কি বাহিনীর পক্ষে উপকার হতে পারে এরকম কোন খবরও পাওয়া যায় নি। সাধারণ সৌজন্য প্রকাশ করতেও তিনি আসেন নি। কাশ্মীর-রাজ তাঁ'র পিতৃব্যের নিকট পরাভূত হয়ে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, পরে আকবরের সহায়তাই রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন। তাই, সম্রাট আশা করেছিলেন যে কাশ্মীর-

রাজ শিষ্টতাসূচক সাক্ষাৎ করতে নিশ্চয়ই আসবেন। কোনও সহায়তাই যখন পাওয়া গেল না, এমন কি ভদ্রতাসূচক ব্যবহারও না, তখন সম্রাট সঙ্গত ভাবেই রুষ্ট হলেন। ফেরার পথে তা'কে কিছু শিক্ষা দেওয়া স্থির করলেন।

সম্রাটের পরামর্শদাতারা কিন্তু কাশ্মীর আক্রমণের প্রস্তাবে সায় দিলেন না। তাঁ'রা বললেন, কাবুল যাওয়া আসায় সৈন্যরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আট মাস ধ'রে তা'রা পথ চলেছে। তা' ছাড়া, কাশ্মীরের পথ ঘাটের অবস্থাও আক্রমণের অনুকূল নয়। পার্বত্য অঞ্চল, পথগুলি বেশ খাড়াই, হাতী ও ভারী কামান নিয়ে যাওয়ার পক্ষে নিরাপদ নয়। কাবুলের পথের তুলনায় কাশ্মীরের পথ বেশি দুর্গম। শীত সমাসন্ন। কাশ্মীরের পথ ঘাট বরফে ডুবে যাবে, সঠিক পথই খুঁজে বের করা দুরূহ হয়ে উঠবে। সব শুনে সম্রাট কাশ্মীর আক্রমণ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হ'লেন।

বাহিনী রোটাস্ পৌঁছলে মোন্সারেটকে ডেকে সম্রাট জানালেন যে সিরহিন্দ্ শহরে রুডল্ফ্ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কথায় কথায় সম্রাট 'রুডল্ফ' শব্দটির অর্থ জানতে চাইলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও অবতারের নাম থেকে এই শব্দটি নেওয়া হয়েছে কি? তিনি যাবতীয় খৃষ্টান অবতার ও সন্তদের নাম জানতে চাইলেন। মোন্সারেট সম্রাটের সব প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, অবতার বলতে খৃষ্টানরা apostle শব্দ ব্যবহার করে; মুসলমানরা বলে 'রসুল'। খৃষ্টীয় অবতারগণ অত্যন্ত ক্ষমতাবান। তাঁ'রাই যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র ব'লে অভিহিত করেছেন। মুসলমানরা একজন রসুলের কথা বলে, খৃষ্টানদের অবতারের সংখ্যা বারো। এঁরা সবাই মহম্মদের অনেক আগেই ধরাধামে বিতরণ করেছেন। সম্রাট আবার প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা পাদ্রীরা ঈশ্বর-প্রেমের জন্যই

সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করেছেন, কালো পোষাক পরেন; আপনাদের পক্ষে কি কোনও পাপ করা সম্ভব?' মঙ্গোলদের কাছে কালো রঙ শোকের চিহ্ন, মৃত্যুর প্রতীক। পাদ্রী বললেন, 'রুডল্‌ফ্‌' যদি পাপ করেই থাকেন, তবে তা' অতি সামান্য। চারিত্র বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে তিনি অন্য সকলের চেয়ে অনেক উর্ধে। তথাপি আমাদের ধর্মীয় নির্দেশ এই যে মাঝে মাঝে মাঝে আমাদের অন্তরের গ্লানি, কৃত অন্যায় কাজ, চিন্তা ও বাক্য সম্পর্কে অন্য কোনও পাদ্রীর নিকট মন খুলে স্বীকারোক্তি করবো এবং অনুশোচনা করবো। এই জন্যই আমি আপনার নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি যে যাতে আমি অবিলম্বে রুডল্‌ফের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি, আপনি তা'র ব্যবস্থা করুন।' পাদ্রী বললেন যে তিনি রুডল্‌ফের রোগমুক্তির ও অন্তরের শান্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করবেন. এবং রুডল্‌ফ্‌ করবেন মোনসারেটের সমক্ষে নিজের কৃত পাপকর্ম ও চিন্তার স্বীকারোক্তি ও অনুতাপ। মোন্‌সারেট বললেন, "আপনি যদি আমাকে রুডল্‌ফের কাছে যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেন, তা' আমার ও রুডলফের পক্ষে বিশেষ উপকারী হবে। আমি যেমন তাঁ'র নিকট যাওয়ার চিন্তায় ব্যাকুল হয়েছি, আমি নিশ্চিত জানি যে রুডল্‌ফ্‌ও আমাকে দেখার জন্য, কাছে পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছেন।"

সম্রাট তখন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখুন আপনারা, এরা দুজন পরস্পরের প্রতি কতো অনুরক্ত!" তিনি অতঃপর শেখ ফরিদাকে (*) ডেকে পাদ্রীর হাতে

---

* ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে ওয়াজির খাঁ সাময়িক ভাবে বঙ্গদেশের সুবাদার হন। পরবর্তী বছরে ওড়িষার বিদ্রোহী পাঠান নবাব কতলুখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। 'টাকাবাই' নামক একটি স্থানে (বালে-

প্রচুর মুদ্রা দেওয়ার আদেশ করলেন, যাতে পাদ্রীর দেনা ও পাথেয় মেটাতে কোনও অসুবিধা না হয়।

বিপাশা এবং আরও দুইটি নদী পার হয়ে মোনসারেট লাহোরে উপস্থিত হলেন। সিরহিন্দ্ থেকে রুডল্ফ্‌কে লাহোরে নিয়ে আসা হয়েছিল। মোন্সারেটের আগমনের সংবাদ পেয়েই রুডল্ফ্ তাঁ'র রোগশয্যা থেকে উঠে এলেন। ইতিমধ্যেই তিনি অনেকটা সুস্থ হয়েছিলেন।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সম্রাট বাহিনীও লাহোরে এসে পৌঁছলো। পাদ্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই আকবর তাঁ'কে জানালেন যে তিনি স্পেন সম্রাটের নিকট একজন রাজদূত পাঠাতে চান (২৫)। রাজদূতের সঙ্গে মোন্সারেটও যাবেন, সম্রাট এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

রুডল্ফ্ এই সুযোগে সম্রাটকে জানালেন যে পর্তুগীজ অধিকৃত দামন অঞ্চলে মুঘল রাজকর্মচারীরা হানা দিয়ে প্রভূত

-শ্বর জেলার অন্তর্গত বর্তমান 'মোগলমারী') এই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কত্লু খাঁ নিহত হন। শেখ ফরিদ ছিল ওয়াজির খাঁর জনৈক সেনানায়ক। বীরত্ব ও রণচাতুর্যের পুরস্কার স্বরূপ তা'কে ১০০ সৈন্যের নায়ক থেকে দেড়হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত করা হয়। মানসিংহের ভাগিনেয় এবং মীর্জা আজিজ কোকহ্‌র জামাতা খস্রুকে সিংহাসনে বসানোর উদ্দেশ্যে সেলিমকে হত্যার যে চক্রান্ত হয়, শেখ ফরিদের কৌশলে তা' ব্যর্থ হয়। এর ইমান স্বরূপ, শাহ্‌জাদা সেলিম যখন বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর হ'ন, শেখ ফরিদকে পাঁচ হাজারী মন্সবদার করে' দেওয়া হয়। শেখ ফরিদ যুদ্ধপ্রিয় ছিল। নিজের জন্য কোনও বাড়ীঘর করেনি, সাধারণ সৈন্যদের সঙ্গে তা'দের মতোই সারা জীবন অতিবাহিত করে।

ক্ষতি সাধন করছে। সম্রাট যদি তা' বন্ধ করতে পারেন তা'হলে ভারতস্থিত পর্তুগীজরা সম্রাটের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকবে। সম্রাট স্থানাদারির খবরে খুব দুঃখপ্রকাশ করলেন। যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আশ্বাস দিলেন।

লাহোর

আয়তনে, জনসংখ্যায় এবং ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে বিচার করলে সমগ্র এশিয়া ও ইয়োরোপে লাহোর নগরী অদ্বিতীয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ীরা এখানে সর্বদাই ভিড় জমিয়ে রাখে। অসংখ্য রকমের শিল্পজাত দ্রব্য এখানে আমদানী হয়। সর্বপ্রকার শিল্প ও কারিগরী কাজ এই শহরের বিভিন্ন মহল্লায় অনু-শীলিত হয়। শহরের লোকসংখ্যা অত্যধিক। রাস্তায় সদা সর্বদা মানুষের ভিড। মূল শহরের ব্যাস প্রায় তিন মাইল। ইট ও সিমেণ্টে তৈরী প্রাচীর ও গম্বুজ অতিশয় উৎকৃষ্ট কারিগরীর পরিচয় দেয়। শহরে একটি বাজার আছে; সেখানকার দোকানপাটের উপর সুউচ্চ একটি কাঠের ছাদ। বছরের কোন ঋতুতেই বেচা-কেনা করতে কা'রও অসুবিধা হয় না। এইরূপ উঁচু ছাদ সম্বলিত বাজার অন্যান্য দেশের পক্ষেও অনুকরণযোগ্য। এই বাজারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোল এর আতরের বাজার; নানাপ্রকার আতর এখানে পাওয়া যায়। সকাল বেলা বাজারের আশে পাশে অনেকদূর পর্যন্ত বাতাস সুগন্ধি হয়ে থাকে। এই গন্ধ সুখকরও বটে। মূল শহরের বেষ্টনী-প্রাচীরের বাইরে অনেক দূর অবধি বিভিন্ন রাস্তার দুই পাশে অসংখ্য সুদৃশ্য অট্টালিকা; ধনী ব্রাহ্মণ এবং কাশ্মীরি ব্যবসায়ীরাই এই সব অট্টালিকার মালিক। কাশ্মীরিদের দেখতে অনেকটা ইহুদীদের মতো। অনেক কাশ্মীরি রুটি প্রস্তুত ক'রে বিক্রী করে। অনেক

সরাইখানার মালিক। অনেকে আবার পুরাণো জিনিষপত্র বিক্রী করে।

মীর্জা হাকিম লাহোর আক্রমণ করেছিলেন। শহরের পূর্ব-প্রান্তে কয়েকটি ফুলের ও ফলের বাগানে তাঁ'র ছাউনী পাতা হয়েছিল। শহরের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা ভগবান দাসের পুত্র মানসিংহ, যিনি সম্প্রতি কাবুল অভিযানে শাহ্‌জাদা মুরাদের অগ্রগামী সৈন্যদলে অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। হাকিম তাঁ'কে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। মানসিংহ আত্মসমর্পণ করেন নি। তিনি মীর্জা হাকিমকে জানিয়েছিলেন, "আপনার বৈমাত্র ভ্রাতা জালালুদ্দীন আকবরের নিকট আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে এই লাহোর দুর্গ কা'রও হাতে তুলে দেবো না। আপনার অভিরুচি হয় তো আপনি দুর্গ আক্রমণ করে' আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন। আপনাকে বাধা দেওয়ার জন্য আমি সততই প্রস্তুত। আপনি যদি আপনার সৈন্যদের সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করেন, আমি তাহলে আমার সৈন্যদের সাহস ও বীরত্বের উপর নির্ভর করবো। যদি দুর্গ জয় করতে পারেন, আমার প্রাণ সম্পর্কে আমি চিন্তা করবো না। আমার একমাত্র কামনা এই যে আমি যেন আকবর বাদ্‌শাহ্‌র নিকট বিশ্বস্ত থাকতে পারি।"

অবিলম্বে ও অল্পায়াসে লাহোর দুর্গ অধিকার করা যাবে এই আশা নিয়ে মীর্জা হাকিম শহরের ধনী ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। যুদ্ধের সময় শহরে দাঙ্গা লুঠতরাজ ইত্যাদি হয়ে থাকে; এই সব অরাজকতা যাতে না হ'তে পারে মীর্জা হাকিম তাঁর সেনানায়কদের সেই মর্মে যথাযথ নির্দেশ দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে শুধু দুর্গমধ্যস্থ বাদ্‌শাহী ফৌজের বিরুদ্ধেই তা'র লড়াই, জনসাধারণের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাকিমকে

যুদ্ধই করতে হয় নি। সম্রাট আকবর কাবুল অভিযানের পথে লাহোর আসছেন এই সংবাদ পেয়েই সসৈন্য হাকিম লাহোরের অবরোধ তুলে নিয়ে দ্রুত কাবুল অভিমুখে প্রস্থান করলেন।

কাবুল থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে লাহোরে পৌঁছেই আকবরের প্রথম কাজ হোল তাঁ'র বিরাট বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দেওয়া। শীত এসে পড়েছে; সৈন্যদের তিনি শীতকালীন ছাউনীগুলিতে চলে যাওয়ার হুকুম দিলেন। অল্পসংখ্যক দেহরক্ষী নিয়ে সম্রাট ফতেপুর সিক্রি অভিমুখে রওনা হলেন। সম্রাটের প্রত্যাবর্তনে রাজধানীতে উল্লাসের জোয়ার বয়ে গেলো।

রাজধানী রাজনীতি

অসংখ্য যুদ্ধবিজয় এবং সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধিতে সম্রাট আকবরের অসামান্য সাফল্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। তৈমুর লঙ্ থেকে শুরু ক'রে তাঁ'র কোনও পূর্বপুরুষই তাঁ'র সমকক্ষ নয়। বৈরাম খাঁ'র হাত থেকে রাজ্যের পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে দেওয়ার পর, ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে সম্রাট আকবর ভারতের সর্ব প্রান্তে তাঁ'র সাম্রাজ্যের সীমানা প্রসারিত করতে থাকেন। মালব, গুজরাট, গঙ্গারিস্, গাঙ্গেয় উপত্যকা, ওড়িষা বা ব্রাহ্মণী ও গঙ্গানদীর অন্তর্বর্তী ভূভাগ, এবং কাকনাগ (*), শবরী (†),

---

* সুবর্ণরেখা ও বৈতরণী নদীর অন্তর্বর্তী অঞ্চলে (বর্তমান বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, সেরাইকেলা এবং কেঁওঝার জেলার কতকাংশ) এককালে 'কাকনাগ' উপজাতির বাসভূমি ছিল। সম্ভবতঃ লুপ্ত ইতিহাসের একঅধ্যায় কোল জাতি অধ্যুষিত এই অঞ্চল ও সন্নিহিত ভূভাগে 'কোলিয়ান রাজ্য' ছিল। পক্ষান্তরে টলেমি লিখেছেন, বর্তমান

গঙ্গারিদে, ভীল প্রভৃতি জনগোষ্ঠী সমূহকে তিনি শাসনাধীনে আনেন। কাবুল, কাশ্মীর (১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে জয় করা হয়), জম্মু, সিন্ধুদেশ, বিদর্ভ, আমেদনগর প্রভৃতি রাজ্যগুলি আকবরের বিরাট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ওড়িষায় দাউদকে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন ভুঁইঞাকে অবদমিত করার ফলে সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল এখন শান্ত। প্রায় চল্লিশজন নরপতি ও সর্দারকে অবরুদ্ধ ক'রে এবং তা'দের অনেককে হত্যা করে' সম্রাট সর্বত্র নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এতগুলি দেশ ও জনগোষ্ঠীর উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বিস্তার করে' থাকলেও সম্রাট কিন্তু পশ্চিমে সিন্ধুনদ এবং পূর্বদিকে গঙ্গানদীর অববাহিকা অতিক্রম করেছেন মাত্র কয়েকবার। ভারত অতি বিশাল দেশ। এশিয়ার যাবতীয় দেশের মধ্যে ভারতই সর্বোত্তম ও সর্ববৃহৎ।

ফতেপুর সিক্রি ফিরে এসে সম্রাট আকবর স্পেনে রাজদূত প্রেরণের প্রস্তাব পুনরায় তুললেন। তিনি চেয়েছিলেন যে পাদ্রী মোনসারেট রাজদূত মিশনের সঙ্গে যাবেন। রুডল্ফ্ এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। সৈয়দ মুজাফ্ফর নামক এক ওম্‌রাহকে সম্রাট

সম্বলপুর জেলার উত্তরে ও পশ্চিমে,—ময়ূরভঞ্জ, রায়গড় ও রায়পুর জেলায়—'কাকমুখ' নামের এক অবলুপ্ত জনগোষ্ঠী বাস করতো।

† টলেমির বর্ণনায় (পৃঃ ১৭৩) জানা যায় যে এককালে সম্বলপুর জেলায় হীরকখনি ছিল। সম্বলপুর থেকে উত্তর পশ্চিমে গোয়ালিয়র পর্যন্ত অঞ্চলে 'শবরী' জাতি বাস করতো। কানিংহাম লিখেছেন, দক্ষিণে পেন্নার নদী পর্যন্ত শবরী (বা শুবর) জাতির বাসভূমি ছিল। পূব দিকে গঙ্গা নদীর অববাহিকা পর্যন্ত অঞ্চলে শুকর (চুয়াড় ?) জাতির অস্তিত্বের কথা টলেমির বর্ণনায় পাওয়া যায়।

রাজদূত নির্বাচন করেছিলেন। ইনি ছিলেন শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত। মহম্মদের জামাতা আলি শিয়া মতবাদের উদ্‌ভাবক। স্বর্গের দূত গ্যাব্রিয়েল আলির হাতে পবিত্র কোরাণ অর্পণ করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ভুল ক'রে গ্রন্থটি মহম্মদের হাতে দেন। পারস্যে শিয়া মতবাদই রাজকীয় ধর্ম। আলির মতাবলম্বীরা তাঁদের পতাকায় সিংহের প্রতিকৃতি এঁকে থাকে। পারস্য সম্রাট তাঁ'র পতাকায় গর্জনরত সিংহের প্রতিকৃতি দিয়েছেন।

ইয়োরোপে রাজদূত প্রেরণে একটি বিঘ্ন দেখা দিল। পাদ্রীরা গোয়া থেকে প্রাপ্ত একটি চিঠিতে জানতে পারেন যে বুল্‌সারের অধিকার নিয়ে মুঘল ও পর্তুগীজদের মধ্যে লড়াই বেধে গিয়েছে। আকবরের এক পিসিমা —গুলবদম বেগম—মক্কা যাওয়ার পথে সুরাটে অপেক্ষা করছিলেন। নিরাপদে সমুদ্রযাত্রার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তিনি পর্তুগীজদের বুল্‌সার অঞ্চল দান করেন। সমুদ্রপথে কোনও পর্তুগীজ জাহাজ তাঁ'র ক্ষতি সাধন করবে না, এই ছিল প্রতিশ্রুতি। বেগম সাহেবা কিন্তু মক্কা থেকে ফিরে, দেওয়া-কথার মর্যাদা রাখলেন না। তিনি সুরাটের অধিবাসীদের উস্কানী দিলেন যেন তা'রা বুল্‌সার ফিরে পাওয়ার দাবী তোলে। স্থানীয় একটি মুঘল অশ্বারোহী বাহিনী বুল্‌সার আক্রমণ করে' পর্তুগীজদের প্রভূত ক্ষতি সাধন ক'রে। অভিজাত শ্রেণীর মুঘলরা অত্যন্ত দাম্ভিক। মক্কায় হজ করতে যাওয়ার সময় সমুদ্রপথে যাতে কোনও জলদস্যু আক্রমণ না ক'রে, দিউ বা দামনে এসে পর্তুগীজদের নিকট এরূপ অনুরোধ করা তা'রা নিতান্ত অপমানকর বলে' মনে করতো। সুরাট ও ব্রোচের মুসলমান শাসনকর্তারাও পর্তুগীজদের অনুরূপ অনুরোধ করতে উৎসাহ বোধ করতো না। এই বিষয় নিয়ে মুঘল ও পর্তুগীজদের মধ্যে মনকষাকষি লেগেই থাকতো। পর্তুগীজদের

প্রীতি আকবরের সহৃদয়তা মুঘল অভিজাতবর্গ ও শাসনকর্তারা কখনই পছন্দ করেনি।

সুরাটের কর্তৃপক্ষ ছদ্মবেশে কয়েকজন চর পাঠিয়ে জানতে পারলো যে জ্যাকব লোপেজ নামক একজন পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতির অধীনে সৈন্যবাহী কয়েকটি জাহাজ সুরাট বন্দরের অদূরে তাপ্তী নদীর মোহনায় নোঙর ফেলেছে। কয়েকজন নাবিক মাটিতে হাঁটা চলার এবং পাখী মারার জন্য তীরে আসতেই মুঘল সৈন্যরা তা'দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অধিকাংশ পর্তুগীজ সৈন্যই সাঁতার কেটে জাহাজে ফিরে গেল বটে, কিন্তু বাকী কয়েকজন মুঘলদের হাতে বন্দী হোল। মুঘলরা বিজয় উল্লাসে নয়জন বন্দীকে সুরাটে নিয়ে গেল। সারারাত তা'দের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। মুসলমান ধর্ম গ্রহণের জন্য তা'দের নানাবিধ প্রলোভনও দেখানো হয়। তা'দের বলা হয়েছিল যে যদি তা'রা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তা'দের প্রত্যেককে সুন্দরী স্ত্রী এবং প্রচুর ধনদৌলত দেওয়া হবে। পর্তুগীজ সৈন্যরা ঘৃণাভরে প্রলোভন ও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পরের দিন একটি খোলা মাঠে সর্বসমক্ষে বন্দীদের একে একে শিরচ্ছেদ করা হোল। এদের কাটা মুণ্ডগুলি আকবরের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মোনসারেট অনেক চেষ্টা করেও নিহত সৈন্যদের নামগুলি জানতে পারেন নি। শুধু একজনের নাম জানতে পেরেছিলেন,—এড্‌ভারডুস্ পেরেইরা।

ফতেপুর সিক্রিতে যখন কাটা মুণ্ডগুলি নিয়ে আসা হয়, পাদ্রীরা তা' জানতে পেরেছিলেন ; কিন্তু তাঁ'রা ভাণ করলেন যেন তাঁ'রা এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও টের পান নি। সম্রাটও ভাণ করলেন যেন সুরাটের ঘটনা এবং কাটামুণ্ড. কিছুই তিনি শোনেন নি, দেখেন নি। সুরাটের সেনাপতি যখন নিজে এসে সম্রাটের

দরবারে সুরাটের ঘটনা বিবৃত করলেন, তখন কিছুই আর গোপন রইল না। পাদ্রীদের প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট স্বীকার করলেন যে কাটা মুণ্ডগুলি তিনি দেখেছেন। তিনি বললেন যে সমগ্র ঘটনাই তাঁ'র কাছে নিতান্ত দুঃখের কারণ হয়েছে। পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধও তাঁ'র পক্ষে বেদনাদায়ক হয়েছে।

তৎসত্ত্বেও মুঘল-পর্তুগীজ লড়াই সহজে মেটেনি। ব্রোচের শাসনকর্তা কুতুবুদ্দীন পনেরো হাজার অশ্বারোহীর এক বাহিনী খাড়া করলেন। তাঁ'র সঙ্গে সুরাটের মুঘল সৈন্যদেরও যুক্ত করা হোল। এই সম্মিলিত বাহিনী দামনের পর্তুগীজ ঘাঁটি আক্রমণ করলো। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় ধীবর সম্প্রদায় ও দরিদ্র জনসাধারণ বাড়ীঘর ছেড়ে নিকটবর্তী পাহাড়ে ও জঙ্গলে আশ্রয় নিল। এই সময় নদীতে একদিন হঠাৎ জলোচ্ছাস হয়; তা'তে অনেক শিশু ও স্ত্রীলোকের প্রাণান্ত ঘটে।

কুতুবুদ্দীনকেও তা'র অপকর্মের ফলভোগ করতে হোল। গুজরাটের নবাব তৃতীয় মুজাফ্ফর শাহ্ পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে' সুরাট আক্রমণ করে। যুদ্ধে কুতুবুদ্দীন নিহত হলেন।

কুতুবুদ্দীন যখন দামন আক্রমণ করেন তখন স্থানীয় পর্তুগীজ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অসীম সাহস ও সামরিক দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল। বর্শা, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রের সাহায্যে তা'রা মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করে। পর্তুগীজদের পক্ষে একটি হাতি ও কিছু সৈন্য বিনষ্ট হয়; কিন্তু কুতুবুদ্দীন জয়লাভ করতে পারেন নি।

পাদ্রীদের নিকট দামনের খবর পৌঁছলে তাঁ'রা সম্রাটের সকাশে নিজেদের মর্মবেদনা প্রকাশ করেন। পর্তুগীজরা কোনও

প্ররোচনাই দেয় নি, তবু তা'দের উপর আক্রমণ ও অত্যাচার চালানো হয়। সম্রাট পাদ্রীদের বক্তব্য শুনে শপথ উচ্চারণ ক'রে বললেন যে এই যুদ্ধ সম্পূর্ণতঃই তাঁ'র অজ্ঞাতে হয়েছে। কুতুবুদ্দীন ও সাহিব খাঁ এই যুদ্ধের নায়ক, দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক; স্ব স্ব পদাধিকারবলে স্থানীয় ব্যাপারে সম্রাটের আগাম অনুমতি ছাড়াই গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তথাপি, সম্রাটের স্বার্থেই তাঁ'রা যুদ্ধ করেছেন, তাই তাঁ'দের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্রাট নিতে চান না। পাদ্রীরা সম্রাটের সততায় অবিশ্বাস করতে পারলেন না। পাদ্রীরা জানতেন যে সম্রাটের উদার ধর্মমতের জন্য আমীর, ওম্‌রাহ, সেনাপতি ও সুবাহ্‌দাররা তাঁ'র উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। সুযোগ পেলে স্বার্থসিদ্ধি সাধনে তৎপর লোকেরও অভাব নেই। আকবরের প্রশাসনে এ রকম কর্মচারীও ছিল।

পাদ্রীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সম্রাট পূর্বোক্ত দুই সেনাপতিকে সৈন্যবাহিনীসহ দামন থেকে সরে' আসার নির্দেশ দিলেন। তাঁরাও সম্রাটের আদেশ বিনা আপত্তিতে মেনে নিলো। এতে পাদ্রীদের সন্দেহ হোল যে দামনের ঘটনার পেছনে সম্রাটের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল, তিনিই গোপনে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তী ঘটনায় এই সন্দেহের সত্যতা প্রমাণিত হয়। দিউ অঞ্চল ছিল পর্তুগীজদের অধিকারভুক্ত। তুলা বেচাকেনার একটি বড়ো বাণিজ্যকেন্দ্র। তুলার গাঁঠের ভিতর প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে দিউতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। বাছাই করা সৈন্যরা তুলা বিক্রেতার ছদ্মবেশে আহার্য ও পানীয়ের সন্ধানে দিউর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বাজারে প্রবেশ করবে এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র স্থানীয় পর্তুগীজ সৈন্যদের ব্যারাক অতর্কিতে আক্রমণ করবে। সম্রাটের আদেশ

অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। দিউর পর্তুগীজ শাসনকর্তা পেক্রস্ মেনেসিউস্ ছদ্মবেশী মুঘল সৈন্যদের খাদ্যশস্য কেনার অনুমতি দিলেন। সেই সঙ্গে যাতে এরা দৌরাত্ম্য করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে শহরের অনেক জায়গায় প্রকাশ্যে এবং গোপনে সশস্ত্র সৈন্যও মোতায়েন করে' রেখেছিলেন। শাসনকর্তা পেক্রস্ সম্ভবতঃ আগে থেকেই মুঘলদের অভিসন্ধি অনুমান করতে পেরে-ছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করার মতো ধৃষ্টতা মেনেসিউসের থাকার কথা নয়। তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন তাঁ'র মনে কোন সন্দেহেরই রেখাপাত হয় নি। তাঁ'কে সতর্ক দেখে মুঘল সৈন্যরা দিউ ত্যাগ করে' চলে যায়। দিউতে যখন এই ঘটনা ঘটছিল, সেই সময় আকবর পাদ্রীদের কাছে প্রায়ই জানতে চাইতেন দিউতে শাসনকর্তা কে। সম্রাটের আগ্রহের কারণ পাদ্রীরা সে সময় বুঝতে পারেন নি। পাদ্রীরাও তাঁ'র নাম জানতেন না, তাই তাঁ'রা সম্রাটকে কোন তথ্যই দিতে পারেন নি।

আশাভঙ্গ

দামনের গোলযোগের সংবাদ যখন পাদ্রীরা জানতে পারলেন তখন তাঁ'রা গোয়ার প্রধান ধর্মযাজকের নিকট থেকেও একটি চিঠি পেয়েছিলেন। প্রধান ধর্মযাজক তাঁ'দের গোয়ায় ফিরে যাবার অনুরোধ করেছিলেন; তবে একথাও লিখেছিলেন যে ঈশ্বরের গৌরব প্রচারকল্পে তাঁ'রা যদি সম্রাটের দরবারে থেকে যেতে চান, তা'হলে তিনি তাঁ'দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবেন না। এদিকে সম্রাট আকবর স্পেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের কথা যতোই বলুন না কেন, প্রধান ধর্মযাজক তা'কে ভণ্ডামীই মনে করেন। তিনি লিখেছিলেন যে তাঁ'রা যেন গোয়ায় ফিরে যাবার জন্য বিনীতভাবে

সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সম্রাটের মনে কোনও সন্দেহ বা অসন্তোষের কারণ যেন না হয়।

পাদ্রীরাও সম্রাটের নিকট গোয়ায় ফিরে যাবার জন্য সবিনয়ে অনুমতি চাইলেন। সম্রাট মনে করলেন যে পাদ্রীরা পর্তুগীজদের প্রতি মুঘল শাসনকর্তার ব্যবহারে মণক্ষুন্ন হয়েছেন, এবং সেই জন্যই গোয়ায় ফিরে যেতে চাইছেন। তিনি পুনরায় শপথ করে' জানালেন যে দামনের ঘটনায় তিনি মর্মাহত; পর্তুগীজ নাবিকদের নিধন সম্পূর্ণই তাঁ'র অজ্ঞাতে ঘটেছে।

পাদ্রীরা সম্রাটের কথা একটুও বিশ্বাস করলেন না। তিনি তো খৃষ্টান ন'ন যে সত্য কথা বলবেন! নিতান্ত অসৌজন্য যা'তে না হয়, সেই জন্য তাঁ'রা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাঁ'দের একজন প্রস্তাবিত রাজদূত মিশনের সঙ্গে স্পেনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফতেপুর সিক্রিতেই অপেক্ষা করবেন, অন্যজন গোয়ায় ফিরে যাবেন। মিশনের তৃতীয় পাদ্রী হেন্‌রিকুয়েজ অনেক আগেই গোযায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। রুডল্‌ফ্‌ ও মোন্‌সারেটের তখনও কিছুটা আশা ছিল যে আকবরকে হয়তো একদিন প্রভুর আলোকে নিয়ে আসা সম্ভবপর হবে। আশা করার কারণও ছিল। প্রথমতঃ, কাবুল থেকে ফিরে আসার পর সম্রাট ধর্মালোচনায় অধিকতর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাতেন। যেদিন তিনি ফতেপুর সিক্রিতে ফিরে আসেন সেই দিনই রুডল্‌ফ্‌কে বলেছিলেন, "খোদা জানেন, খৃষ্টীয় ধর্মাচার আমার কতো প্রিয়। খৃষ্টধর্ম বিষয়ে আরও জানার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ। কিন্তু আপনাদের ট্রিনিটির মহিমা কিছুতেই আমার বোধগম্য হয় না।" রুডল্‌ফ্‌ সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেন, "সম্রাট, আমরা কখনই বলি না যে তিনজন ঈশ্বর আছেন। আমরা যাঁ'কে ঈশ্বর বলে' জানি, তিনি পিতা পুত্র এবং পবিত্র

আত্মা,—এই তিন রূপে স্ব-প্রকাশিত।"

সম্রাট উপস্থিত পার্শ্বচরদের নিকট রুডল্‌ফের কথা পুনরুক্তি করে' শোনালেন। তারপর রুডল্‌ফকে বললেন, "আপনাদের উপরওয়ালাদের বলুন যে তাঁ'রা যেন এমন কাউকে পাঠিয়ে দেন যিনি পর্তুগীজ ও ফারসী উভয় ভাষাই ভালো জানেন। খুব ভালো হয় যদি ইস্‌লাম থেকে ধর্মান্তরিত কোন খৃষ্টানকে পাঠাতে পারেন। ইস্‌লাম এবং খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব গুলি তাঁ'র জানা থাকলেই ভালো হয।"

এর পরে সম্রাট পাদ্রীদের গোপনে জানিয়েছিলেন যে তিনি পর্তুগালের সম্রাটের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনে অভিলাষী। এই চুক্তি, সম্পাদিত হ'লে ভারত ও পর্তুগাল, দুই দেশই একযোগে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে। যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় সম্রাট আকবরই বহন করবেন বলে' জানালেন। রুডল্‌ফ্‌ যদি ফতেপুর থেকে যা'ন, তবে পরে এক সময় তাঁ'কে মহামান্য পোপের নিকট একটি সৌজন্যমূলক পত্র দিয়ে পাঠাতে পারেন। এর যাবতীয় ব্যযও সম্রাটই বহন করবেন জানালেন।

সম্রা'ট চা'ন নি যে দুই জন পাদ্রীই তাঁ'কে ছেড়ে গোযায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁ'দের একজন অন্ততঃ সম্রাটের নিকট থাকবেন, তিনি এই অনুরোধ করেন। পাদ্রীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে' সম্রাটকে জানালেন যে তাঁ'দেব একজন গোয়ায় ফিরে যাবেন, একজন থাকবেন। সম্রাট এ কথা শুনে খুব আনন্দিত হলেন। উপস্থিত পার্শ্বচরদের নিকট তিনি পাদ্রীদের এমন প্রশংসা করতে লাগলেন যে তাঁ'রা অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। রুডল্‌ফই ফতেপুর সিক্রিতে থেকে যাবেন এই কথা শুনে সম্রাট বললেন, "আপনাদের এই সিদ্ধান্তে ঈশ্বর নিশ্চয়ই প্রীত হয়েছেন।

আপনাদের দেশে রুডল্‌ফের মতো পাদ্রী আরও আছেন, তিনি এখানে থেকে গেলে আপনাদের বিশেষ ক্ষতি হবে না, কিন্তু আপনারা চলে গেলে আপনাদের স্থানপূরণ করতে পারেন এমন লোক আমি পাবো কোথায়?"

আরও একটি কারণে পাদ্রীদের আশা ছিল যে সম্রাট খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। প্রস্তাবিত রাজদূর মিশন প্রেরণের বিষয় নিয়ে একদিন সম্রাট পাদ্রীদের সঙ্গে একান্তে আলোচনা করছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মহামান্য পোপের মর্যাদা, প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেন। তিনি এর আগে দুইজন বিদেশীর কাছে পোপের কথা শুনেছিলেন। মহামান্য পোপই হচ্ছেন পৃথিবীতে প্রভু যীশুর প্রতিনিধি। অবশ্য এক অবিশ্বাসী শ্রেণী নিজেদের খৃষ্টান বলে' পরিচয় দিলেও পোপের প্রাধান্য স্বীকার করে না। সম্রাট পাদ্রীদের বললেন, "আপনারা মহামান্য পোপকে অবশ্যই বলবেন যে আমি শুনেছি তিনিই পৃথিবীতে যীশুর প্রতিনিধি। বিভিন্ন দেশের রাজারা তাঁ'র পায়ে লুটিয়ে পড়ে' নিজেদের কৃতার্থ বোধ করেন। রুডল্‌ফ্ যখন পোপের কাছে যাবেন তখন তিনি আমার হয়ে তাঁ'র পদ চুম্বন করবেন। আপনাকে আমার প্রতিনিধি করে' পাঠিয়েছি তাঁ'কে এই কথা বলবেন। তাঁ'কে অনুরোধ করবেন তিনি যেন তাঁ'র বানী সামান্য কিছু আমাকে লিখে পাঠান। সেই বানী পড়ে' আমি ঈশ্বরের তত্ত্ব আরও বেশি জানতে পারবো। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভয় বজায় রেখে কি রূপে রাজ্যশাসন করতে হয় সে বিষয়ে তিনি যেন আমাকে উপদেশ দেন। আমার ক্ষুদ্র জীবন তা' হ'লে ধন্য হবে।"

একজন সজ্জন খৃষ্টান নরপতির মতোই আকবর মনের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি 'তলব খোদা' (সুফী) সম্প্রদায়ের মতোই

এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সন্ধানকামী। তা'দের মতোই তিনিও স্ত্রী, সন্তান, ধন, সম্পত্তি,—কিছুই মূল্যবান মনে করেন না। মহামান্য পোপই হ'ন বা যেশুইট ধর্মযাজকদের উচ্চতম পরিষদই হোক, অথবা অন্য যে কেহই হোন, আকবরের হৃদয়কে যিনি স্পর্শ করতে পারবেন, তিনি তেমন লোকের নিকটই দীক্ষা গ্রহণে প্রস্তুত আছেন।

আকবর যদি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন তবে তাঁ'র সন্তানদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াবে এই প্রশ্ন করা হ'লে তিনি নিজেকে চেঙ্গিস খাঁ'র বংশধর ব'লে উল্লেখ করেন। চেঙ্গিসের ছিল দশটি ছেলে; তিনি তা'দের স্ব-অভিরুচি অনুযায়ী ধর্ম অবলম্বন করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তা'দের একজন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এরূপ প্রবাদ আছে। সম্রাট নিজের পুত্রদেরও ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতা দেবেন ব'লে জানালেন।

আকবরের সহৃদয় ব্যবহার দেখে এবং কথাবার্তা শুনে পাদ্রীরা ভাবলেন সম্রাটের অন্তরে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের আকাঙ্খা সত্যই প্রবল হয়েছে। ঈশ্বরের হাতে ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়ে সম্রাটের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করাই তাঁ'রা স্থির করলেন। অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার চেয়ে জেনে শুনে ঠকাও শ্রেয়ঃ। এইরূপ বিবেচনা ক'রে রুডল্‌ফের উপর শাহজাদা মুরাদের লেখাপড়ার ভার দিয়ে অপর পাদ্রী মোন্‌সারেট গোয়ায় ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

নওরোজ

১৫৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস এসে পড়লো। এই সময় এদেশে বসন্ত ঋতুর সময়। সম্রাট নওরোজ (২৬) উৎসবের আয়োজনে

ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইহুদী ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মার্চ মাস থেকে বর্ষক্রম ধ'রে থাকে। 'নওরোজ' শব্দের দুটো অর্থ : নয় দিন বা নয়া দিন। সম্রাট নববর্ষ উৎসবের কল্পনা পেয়েছিলেন হিন্দুদের কাছ থেকে। হিন্দুরা বর্ষারম্ভের দিন নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠান ক'রে থাকে। হিন্দুদের পক্ষে নববর্ষের প্রথম দিন কর্মবিরতির দিন বা ছুটির দিন। ইয়োরোপেও এই সময় বসন্ত ঋতুর উদয় হয়। ছত্রিশ দ্রাঘিমার উত্তরাংশে অবস্থিত পৃথিবীর সকল দেশেই এই সময় নূতন শস্যঘরে ওঠে। বিচিত্র বর্ণের ও গন্ধের ফুল লতাপাতা সৌন্দর্যে বিকশিত হয়। মনে হয় ধরিত্রী যেন আনন্দে হিন্দোলিত হচ্ছে। পাহাড় উপত্যকা ও প্রান্তর যেন এই সময় সদা হাস্যময়। অন্যান্য দিনের গতানুগতিক কর্মসূচী ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানুষ এই সময় মাঠে প্রান্তরে বেরিয়ে পড়ে, সব চেয়ে সেরা জামা পোষাক পড়ে, নিমন্ত্রণ দিনের মতোই দামী ও অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ করে।

নওরোজ উৎসবে সম্রাট আকাতরে অর্থ ব্যয় ক'রে থাকেন। এবারের উৎসব অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি জাকজমক সহকারে উদ্‌যাপিত হয়। অনেকেই বলেছেন গত ত্রিশ বছরেও এমন সমারোহ হয় নি। নওরোজের প্রথম দিন একটি উচু বেদীর উপর সুসজ্জিত স্বর্ণসিংহাসনে বসলেন, মাথায় শোভা পেল হীরা মুক্তা খচিত মহামূল্যবান একটি মুকুট। প্রাসাদের সবগুলি কামরার দেওয়াল ও স্তম্ভ সোনা ও সিল্কে মুড়ে' দেওয়া হোল। কাবুল অভিযানে যে সব সেনাপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্রাটের সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁ'দের প্রত্যেককে সম্রাট নিজের হাতে মূল্যবান উপহার দিলেন। রাজধানীর সর্বত্র নাচগান আমোদ প্রমোদের জোয়ার বয়ে চললো। অনেকই সম্রাটের জন্য নজরানা ও ভেট নিয়ে

এলেন। প্রাসাদের দ্বার এই দিন সর্বশ্রেনীর নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। অতিথিদের জন্য বিনামূল্যে প্রচুর সুখাদ্য এবং পানীয়ের বন্দোবস্ত ছিল। বহুসংখ্যক 'যোগী' নওরোজের উৎসবে সমবেত হয়েছিল। ধর্মের নামে তা'রা নানাবিধ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্যগীতে মত্ত হোল। নগরীর সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির মহিলারা এবং সাধারণ শ্রেণীর স্ত্রীলোকরা, একই সঙ্গে ভিড করে' উৎসবে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাসাদে এসে'ছিল। জোর গুজব রটে গিয়েছিল। যে সম্রাট ঈশ্বর-জননী কুমারী মেরীর ভজনা করেছেন। গুজবের খানিকটা ভিত্তিও ছিল। সম্রাটের জনৈক আত্মীয় নওরোজ উৎসবের সময় দেখতে পায় যে সরকারী সাজ সরঞ্জামের তত্বাবধায়ক মাতা মেরীর একটি প্রতিকৃতি দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখছে। যে দেওযালে ছবিটি টাঙানো হয়েছিল তা'র সামনে দাঁড়িয়ে সম্রাট প্রাসাদ চত্বরে সমবেত জনতাকে দর্শন দিতেন। প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে সম্রাট জনসাধারণের আর্জি ও নালিশ শুনতেন। অলিন্দের এই অংশটিতে বুক সমান নীচু প্রাচীর, অনেকটা বড়ো জানালার মতো। মুসলমানরা একে ঝরোকা (*)

---

* মুঘল রাজত্বকালে প্রাসাদের দীর্ঘ ও প্রশস্ত বারান্দায় নানাবিধ স্থাপত্যের অলঙ্করণে সমৃদ্ধ আচ্ছাদন থাকতো। বারান্দায় চলা ফেরার সময় প্রাসাদ চত্বর থেকে কাউকে দেখা যেত না, কিন্তু বারান্দা থেকে জাফ্‌রি ও ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যেত। দীর্ঘ বারান্দার এক এক অংশ উন্মুক্ত থাকতো। সম্রাটরা দিনে তিনবার ঐ উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে জনতাকে দর্শন দিতেন। সম্রাট যে জীবিত ও সুস্থ এবং অবরুদ্ধ ন'ন,—সম্রাটের দর্শনের দ্বারা তা' প্রমাণিত হোত। আকবর এই প্রথা বিশেষ মানতেন না। আওরংজেব দর্শনদান প্রথাকে মূর্তিপূজার সামিল ব'লে মনে করতেন, তিনি ঝরোকায় দাঁড়িয়ে দর্শন দিতেন না।

বসে। এরূপ প্রকাশ্য স্থানে.—কেননা, বাইরে থেকে জনতার চোখে সম্রাটের দাঁড়াবার জায়গার ঠিক পেছনের দেওয়ালেই ছবিটি টাঙানো হয়েছিল, —ছবি টাঙাবার নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য থাকবে। সম্রাটের আত্মীয়টি নিজ ব্যয়ে ফুল ও রঙীন সিল্ক কিনে এনে মাতা মেরীর ছবিটি উত্তমরূপে সাজিয়ে দিলেন। তাঁ'র উদ্দেশ্য ছিল যে সম্রাট এতে খুসী হয়ে তাঁ'কে অনুগ্রহ করতে পারেন। লোকটির হিসাবে ভুল হয়নি। যথাসময়ে ছবিটির উপর সম্রাটের দৃষ্টি পড়লো ; তিনি ছবিটি সাজানোর খুব প্রশংসা করলেন। কে এ রকম সাজিয়ে দিয়েছে তাও জানতে চাইলেন। এই ঘটনাই পূর্বোক্ত গুজবের ভিত্তি। অখৃষ্টানরাও মাতা মেরীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলো, এটা সত্যিই আনন্দের বিষয়।

পুনঃপ্রয়াস

নওরোজের কয়েকদিন পরে আকবর আবার ধর্মালোচনা সভার অধিবেশন করলেন। কয়েকজন মুসলমান পণ্ডিত এবং পাদ্রীরা সভায় উপস্থিত হ'লে অধিবেশন শুরু হোল। পাদ্রীরাই প্রথমে আলাপ শুরু ক'রে কোরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত মহম্মদের উক্তির প্রকৃত ভাষ্য জানতে চাইলেন। 'স্ব স্ব ধর্মের নির্দেশ মেনে চললে প্রত্যেকেই পরিত্রাণ পেতে পারে।' —এই উক্তি যদি যথার্থ হয় তবে যা'রা কোরাণ মানে না, তা'দের পাপী বলা হয় কেন? পাদ্রীদের এই প্রশ্ন শুনে উলেমা মৌলবীরা চমৎকৃত হলেন ; চট্‌ক'রে কোনও জবাব দিতে পারলেন না। কোরাণে প্রকৃতই এরূপ উক্তি আছে কিনা এ সংশয়ও অনেক প্রকাশ করলেন। কোরাণ নিয়ে আসা হোল, এবং পাদ্রীরা গ্রন্থটি থেকে উক্তিটি প'ড়ে শোনালেন। দু একজন বললেন, ঐ উক্তির মর্ম

অনুধাবন করতে হ'লে ওর পরে এই শব্দগুলিও যোগ দিতে হবে:
— 'যদি তা'রা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাকে এবং মহম্মদকে বিশ্বাস করে।'

রুডল্‌ফ বললেন, "তা' হ'লে ঐ উক্তির পরে 'মহম্মদ রসুল আল্লা' কথাগুলি অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা থাকে না।"

বাদ্‌শাহ্‌ এবং উপস্থিত সকলেই রুডল্‌ফের বক্তব্যের সারবত্তা মেনে নিলেন। কারণ, 'মহম্মদ রসুল আল্লা'—এই বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে 'মহম্মদ ঈশ্বরের দূত'। সুতরাং, রুডলফ্‌ বললেন, 'স্ব স্ব ধর্মের নির্দেশ মেনে চললে —' প্রভৃতি যা' বলা হয়েছে, তা'র সঙ্গে এই বাক্যাংশ জুড়ে দিলে সম্পূর্ণ উক্তিটাই পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে। মহম্মদের আবির্ভাবের আগে থেকেই থোবা, জাবুর ও ইঞ্জিল (পেণ্টাটুচ্‌, ধর্মসঙ্গীত এবং বাইবেল) প্রচলিত ছিল। ইহুদী ও খৃষ্টানের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। এই সব ধর্মশাস্ত্র যা'রা মানতো, তা'দের সঙ্গে বিরোধ না করে' স্বীয় মত প্রচার করা অনেক সুবিধাজনক; হয়তো এই উদ্দেশ্যও ছিল।

পাদ্রীরা বললেন যে মনুষ্য সৃষ্টির সময় থেকেই একটি ধর্মনীতি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। রুডল্‌ফ্‌ বললেন, "আদম ও নোহ হচ্ছে এই শাশ্বত ধর্মনীতির প্রচারক ও বিশ্বাসী। পরে মুসার নিকট তা' পর্বতগাত্রে আগুনের অক্ষরে তা' ব্যক্ত হয়। সর্বশেষে এলেন ঈশ্বরের প্রেরিত পুত্র যীশু, আমাদের ত্রাণকর্তা। ঈশ্বরের বাণী তিনিই আমাদের শুনিয়েছিলেন। তিনিই 'প্রকাশিত বাক্য'—Revelation—ব্যক্ত করছেন, এবং তা' আমাদের ধর্মপুস্তকে বিধৃত হয়েছে। প্রত্যেক খৃষ্টান বাইবেলের প্রকাশিত বাক্য বিশ্বাস করে।

পাদ্রীদের জিজ্ঞাসা করা হোল যে খৃষ্টীয়-ধর্মনির্দেশে বিনাপ্রশ্নে

যে সব বিষয় বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে তা' প্রমাণ-সাপেক্ষ কি না।

পাদ্রীরা জানালেন, "ঈশ্বরের যা' বিশ্বাস করতে বলেছেন তা'র সত্যতা পরীক্ষা করতে যাওয়া ধৃষ্টতা ও ধর্মহীনতার পরিচায়ক।"

সম্রাট বললেন, "ঈশ্বরেব অনুগ্রহেই মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মায়। বিশ্বাস এবং ইশ্বরের দয়া একই বস্তু।

খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের দয়া একার্থবাচক নয়,—পাদ্রীরা এটা সম্রাটকে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু আরবী ভাষায় তাঁ'দের দখল সামান্য ব'লেই বক্তব্য প্রাঞ্জল ক'রে প্রকাশ করা গেল না পরবর্তী কোন সময়ে সুযোগ পেলে তা' বলা যাবে, এই বিবেচনা করে পাদ্রীরা আপাততঃ নিরস্ত হলেন।

মুসলমান পণ্ডিতরা বললেন,—ঈশ্বরের কোন পুত্র থাকতে পারেনা, এবং যীশুই সেই পুত্র, এ কথা মেনে নেওয়া কষ্টকর।

রুডল্‌ফ্‌ বললেন, "তা'র চেয়ে বেশি কষ্টকর হচ্ছে যীশুকে 'ইবনাল্লাহ' ঈশ্বরের পুত্র) না বলে' 'রোহ্‌আল্লাহ্‌ (ঈশ্বরে বিশ্বাস) বলা। কোরাণের চতুর্থ-অধ্যায়ে খৃষ্টকে 'কলমৎউল্লা' (ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর) বলা হয়েছে। সুতরাং তিনিই যে ঈশ্বরের পুত্র সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশ্বাসের প্রাথমিক পর্যায়ে এই কথা মেনে নিতে হবে। 'সর্বপ্রথমে ছিল শব্দ', বাইবেলের এই উক্তি কোরাণেও সমর্থিত হয়েছে।"—রুডল্‌ফ্‌ ফার্সীভাষায় তাঁ'র বক্তব্য নিবেদন করছিলেন।

কোন্‌ জাতির মানুষ ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয়ে নিজ জীবনে তা' অনুসরণ ক'রে থাকে তা' জান্‌বার জন্য সম্রাট সতত উদ্‌গ্রীব থাকতেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু লোকের সঙ্গে

প্রচুর আলাপ আলোচনার পর সম্রাট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে ধর্মানুসরণের একটি মাত্র পথ নেই, ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ও বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাসের সাহায্যেই মানুষ স্বধর্ম পালন করে। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, ইহুদী, খৃষ্টান, একে অন্যের থেকে ধর্মাচরণে পৃথক পৃথক মনোভাব পোষণ করে' থাকে। প্রত্যেকেই নিজের আচরিত ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে' মনে করে। শুধু তা'ই নয়; প্রত্যেকেই আশা করে যে অন্য সকলেও তা'র অনুসৃত পথই গ্রহণ করুক। কেউ যদি ধর্মান্তরিত হতে রাজী না হয়, তা'হলে তা'কে শত্রু ব'লে মনে করা হয়। এই সব চিন্তা ক'রেই সম্রাটের মনে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সম্রাট একদিন ধর্মালোচনা সভার অধিবেশন সমাপ্ত হ'লে বললেন, "আমি বুঝতে পেরেছি যে পৃথিবীতে বহু ধর্মমত ও বিধি প্রচলিত আছে। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, ইহুদী, খৃষ্টান,—প্রত্যেকেরই ধর্মবিশ্বাস স্বতন্ত্র। প্রত্যেকেই নিজের বিশ্বাস অপরের তুলনায় মহত্তব মনে করে। সেই জন্য আমি চাই যে প্রত্যেক ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলি নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতরা একদিন আলোচনা করুন। তাঁ'দের আলোচনা শুনে আমি বুঝতে পারবো কোন্ ধর্ম সর্বোত্তম।" এই আলোচনার জন্য তিনি রুডল্‌ফ্‌কে একটি শুভদিন স্থির করতে অনুরোধ জানালেন।

রুডল্‌ফ্ বললেন, "সম্রাট, কোনও দিনই অশুভ নয়, কারণ প্রত্যহই ঈশ্বর তাঁ'র পবিত্র আলো বিকিরণ করছেন অবশ্য এ কথাও বাইবেলে বলা হয়েছে, 'দিনকাল পাপে পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং, ভাই সব আপনারা মূর্খের মতো চলবেন না। জ্ঞানী বুদ্ধিমানদের মতো আচরণ করুন।' এই উক্তির নিহিতার্থ হচ্ছে এই যে যা'রা যীশুর বিরোধীতা করে, তা'দের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তির

কালে খৃষ্টানদের পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। দুর্ঘটনা হ'লে সেদিনটি মন্দ এবং না ঘটলে সেদিনকে শুভ বলা হয়। দিনের নিজস্ব কোন সত্তা নেই যে তা'কে ভালো বা মন্দ বলা যেতে পারে।"

সকলেই রুডল্‌ফের কথা শুনে চমৎকৃত হলেন। কারণ, তা'দের কুসংস্কার ছিল যে বছরের কতক দিন পবিত্র ও শুভ, আর কতক দিন অপবিত্র ও অশুভ। অপবিত্র দিনে কেউ শুভ কাজ করতেন না। যাই হোক, পাদ্রীর কথার কেউ প্রতিবাদ করলেন না। তুলনামূলক ধর্মালোচনার জন্য সম্রাট পরের দিনই স্থির করলেন।

পরের দিন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতরা সমবেত হ'লে আকবর সভার উদ্বোধন ক'রে বললেন, "ধর্মালোচনা শুরু করার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি। পরমেশ্বরের দয়াতেই আমি অনুরোধ করতে পারছি। ঈশ্বর-তত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য আমার ব্যাকুলতার সংবাদ আপনারা জ্ঞাত আছেন।" সভার অধিবেশন হয়েছিল প্রাসাদের ভিতরে। পণ্ডিতমণ্ডলীকে যাঁ'র যথা স্থান নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছিল। বিশিষ্ট ওমরাহ্‌গণ এবং সম্রাটের বড়ো দুইছেলেও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পূর্বনির্ধারিত সূচী অনুযায়ী পাদ্রীদেরই প্রথমে বলতে দেওয়া হোল। তাঁ'রা একটি কঠিন প্রশ্ন তুললেন: 'অল্‌কোরাণে লিখিত আছে যে যদি এই গ্রন্থ একটি পর্বতে নিয়ে যাওয়া হয়, পর্বত দুই খণ্ড হয়ে যাবে। এই বিষয়ে আমাদের দুইটি বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে: প্রথমতঃ, কোন্‌ গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে? স্বর্গ থেকে যা নেমে আসে এবং গ্যাব্রিয়েল যা' মহম্মদকে দিয়েছিলেন, সেই গ্রন্থটি কি? না, ঐ গ্রন্থের প্রত্যেকটি কপির পক্ষেই পূর্বোক্ত বাণী প্রযোজ্য? যদি তাই হয়, অর্থাৎ কোরাণের প্রত্যেকটি কপির পক্ষেই ঐ

কথা প্রযোজ্য হয়, তবে, আমরা যে পাহাড়ের উপর ব'সে (*) আলোচনা সভা করছি, তা' তো ভেঙে টুটুকরো হচ্ছে না! মহম্মদকে যদি প্রকৃত অবতার ব'লে মানি, তা'হলে তো সেই রকমই হোত। কোরাণের অনেক কপিই তো এই পার্বত্য স্থানে আছে। আর যদি ধ'রে নিই যে গ্যাব্রিয়েল যে কপিটি স্বর্গ থেকে নিয়ে এসেছিলেন, তা'হলে সেই আদি গ্রন্থটি কোথায়? সে'টি কি কোনও পর্বত টুটুকরো করতে পেরেছিল?' পণ্ডিতেরা জানালেন যে শুধু আদি গ্রন্থটি সম্পর্কেই ঐ উক্তি প্রযোজ্য, তা'র কপিগুলোর সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আদি গ্রন্থটি কোথায় আছে, সে সংবাদ তাঁ'দের জানা থাকলেও প্রকাশ করতে সাহসী হলেন না। সম্রাট একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তা'কে সবাই মক্কার সুলতান বলে অভিহিত করতো (†),—মক্কাতেই কি কোরাণের আদি কপিটি আছে? (‡) লোকটি অসঙ্কোচে বললো যে সে

---

* ফতেপুরসিক্রি পার্বত্য অঞ্চল, সেই জন্যই পাদ্রীরা এই উক্তি করেছিলেন।

† 'মক্কার সুলতান' ব'লে যা'কে অভিহিত করা হোত, তা'র নাম ছিল সুলতান খাজা আব্দুল আজিম, সংক্ষেপে মী'র হাজী।

‡ Rodwell কৃত কোরাণের অনুবাদ এবং Muir লিখিত মহম্মদের জীবনী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্মিথ লিখেছেন, 'কোরাণের যে পাঠ আমরা দেখি তা'র একটি শব্দও মহম্মদ লেখেন নি। মহম্মদের তিরোধানের বৎসরকাল পরে তাঁ'র পদাধিকারী আবুবকর মহম্মদের একান্ত শিষ্যদের থেকে তাঁ'র উপদেশাবলী সংগ্রহ করেছিলেন। এর দশ বারো বছর পরে তৃতীয় খলিফা ওথমান দেখলেন যে বিভিন্ন শিষ্যদের দ্বারা কোরাণের বহুতর স্থানে পাঠান্তর ঘটেছে।

জানে না। ওর উত্তর শুনে সম্রাট পাদ্রীদের একান্তে বললেন, "আমার মৌলভীরা আপনাদের কাছে কোরাণের বিষয়ে প্রকৃত উত্তর দেবে এটা মনে করবেন না। এরা যা'র যা'র নিজস্ব মনগড়া উত্তরই দেবে।" পাদ্রীরা তখন বললেন, "আপনারা আদি কোরাণ গ্রন্থটি নিয়ে আসুন। এনে ফতেপুরসিক্রির পাহাড়ে রেখে দেখুন পাহাড় ফেটে যায় কিনা। যদি পাহাড় না ফাটে, স্বীকার করতে হবে যে গ্রন্থটি ঈশ্বরের দেওয়া নয়।" একথা শুনে একজন বললেন, কোরাণে লিপিবদ্ধ কথাটি প্রহেলিকা হতে পারে, ওর গূঢ়ার্থ অন্য কিছু হবে। রুডল্‌ফ্‌ বললেন, তাই যদি হয়, তাহলে যেখানে বলা হয়েছে যে মহম্মদ তাঁর সূতী বস্ত্রে তৈরী কামিজের একটি হাতায় আশমান থেকে আধখানা চাঁদ ধ'রে কামিজের অন্য হাতা দিয়ে সেটাকে আকশে ছুঁড়ে দিলেন, আর দুটো আধখানা চাঁদ জোড়া লেগে পূর্ণচন্দ্র হোল,—সে কথারও তো গূঢ়ার্থ থাকতে পারে! যদি চাঁদের ব্যাপারে কোনও গূঢ়ার্থ না থাকে, যদি তা সরল সত্য বর্ণনা হয়, তবে পাহাড় ফেটে যাওয়ার কথাটাও প্রহেলিকা হতে পারে না।

আলোচনা শেষ হলে সম্রাট বললেন, "বুঝতে পারছি বিভিন্ন

ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো ধর্মগ্রন্থের পাঠ (text) ও ভাষ্যে পার্থক্য থাকার দরুণ মুসলমানেরাও যেন একাধিক সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে না যায়, এই উদ্দেশ্যে তিনি কোরাণের তৎকালীন প্রচলিত সব কয়টি কপিই সংগ্রহ ক'রে বিনষ্ট ক'রে দেন, এবং নূতন ক'রে কোরাণ লিখিত হয়। আদি কোরাণ গ্রন্থ ব'লে কোনও গ্রন্থ নেই।' The World's Living Religions : Robert Ernest Hume, Ph. D. গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ধর্মে বিভিন্ন পন্থা ও আচরণ এবং বিশ্বাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের আচরিত ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। শুধু তাই নয়, নিজের মতে আনবার জন্য অন্যধর্মাবলম্বীর উপর চাপ সৃষ্টি করে। সফল না হলে তা'কে অবিশ্বাসী এমন কি শত্রু ব'লেও মনে করে।"

দিনের পর দিন ধর্মসভার অধিবেশন হ'তে থাকলো। পাদ্রীরা তাঁদের বক্তব্য লিখে আনতেন এবং সভার শেষে তা' সম্রাটের হাতে দিতেন। দেখা গেল, সম্রাটের আমন্ত্রণে যাঁ'রা প্রথম দিন উপস্থিত ছিলেন, তাঁ'দের অনেকেই একে একে আসা বন্ধ করলেন। পরিষ্কার বোঝা গেল তাঁ'দের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। পাদ্রীরা লক্ষ্য করলেন সম্রাট হিন্দু পণ্ডিতদের প্রতি ক্রমশঃই অধিকতর পক্ষপাতী হয়ে উঠছেন। হিন্দুদের অনুরোধে (*) বাজারে গো-মাংস বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হোল। মনে হোল সম্রাট এক নূতন ধর্মমত প্রতিষ্ঠার কল্পনা করছেন। এই ধর্মমতের নামকরণও হোলঃ 'দীন-ই ইলাহী' (২৭) প্রাসাদের সর্বোচ্চ অংশে ছাদের উপর এক অভিনব কাঠে তৈরী প্রার্থনাগৃহ সম্রাটের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হোল। এখানে তিনি সূর্যোদয়ের অনেক আগে থাকতেই প্রার্থনার ভঙ্গীতে পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্য আরাধনা করতেন।

পাদ্রীরা দেখলেন আকবর প্রথম প্রথম যে সব কথা বলছিলেন তা' যেন বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন। তাঁ'রাও আর আগের

---

* সম্ভবতঃ জৈন ধর্মগুরু হরিবিজয় সুরী জৈন, বৈষ্ণব, যোগী, —সকল সম্প্রদায়কেই মোন্‌সারেট্ হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত বলে' ধরে' নিয়েছিলেন।

মতো তাঁ'দের মতবাদ লিখে দেওয়া আস্তে আস্তে কমিয়ে আনলেন এবং শেষ অবধি বন্ধ ক'রে দিলেন।

অনেক দিন অপেক্ষা করার পর প্রস্তাবিত রাজদূতের সঙ্গে পাদ্রীদের একজন গোয়ায় ফিরে গেলেন।

ইয়োরোপে রাজদূত প্রেরণ

স্পেনে রাজদূত প্রেরণের দিন এগিয়ে এলো। নির্বাচিত রাজদূত সৈয়দ মুজাফ্ফর কিন্তু তাঁ'র নির্বাচনে খুসী হ'তে পারেন নি। একে তো অনেক দূরের অজানা দেশ স্পেনে যেতে হ'বে, তা'ছাড়া আছে সমুদ্র যাত্রার কষ্ট। বিদেশে রাজদূত হয়ে যাওয়াকেও তিনি নির্বাসন দণ্ড ব'লেই মনে করলেন। আরও একটি কারণ ছিল, যা' কিনা সৈয়দ সাহেবকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছিল: সম্রাট মোন্সারেটের হাতে একটি সীল করা খাম দিয়েছিলেন, সুরাটে পৌঁছবার পর তা' খুলে দেখার নির্দেশ ছিল। ঐ সীল করা খামে —আর কিছু নয়—মৃত্যুদণ্ডাদেশ ছিল, সৈয়দ সাহেব সেই আশঙ্কাই করেছিলেন। শাহ্ মনসুরের ষড়যন্ত্রে সৈয়দ মুজাফ্ফরও জড়িত ছিলেন, এই সন্দেহবশতঃই হয়তো সম্রাট তাঁ'কে রাজধানী থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, নব নির্বাচিত রাজদূত সেই রকমই মনে করলেন। পথে যেতে যেতে পাদ্রীকে খামটি খুলে দেখার জন্য বিস্তর অনুরোধ করেছিলেন। পাদ্রী তাঁ'র কথায় কর্ণপাত না করায় সৈয়দ মুজাফ্ফর তাঁ'কে হত্যা করার চেষ্টাও কয়েকবার করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গী যা'রা ছিল তা'রা এই অপচেষ্টায় বাধা দেয়। তা'রা জানতো যে পাদ্রীদের অনুরোধেই রাজদূত পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল; সুতরাং তাঁ'দের কাউকে হত্যা করলে সম্রাট তা'র প্রতিশোধ

নেবেন, তা'দের কাউকে রেহাই দেবেন না। তা'রা সৈয়দ মুজাফ্‌ফরকে একথাও বুঝিয়েছিল যে একজন নিরীহ সাধু ব্যক্তিকে হত্যা করা কোনও মুসলমানের পক্ষেই শ্লাঘার কারণ হ'তে পারে না। তা'রা পরামর্শ দিল যে সুরাটে পৌঁছে চিঠি খোলার পর যদি তেমন কিছু দেখা যায়, তখনই যা' করার স্থির করা যাবে। সৈয়দ সাহেব এই পরামর্শ শুনে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেন ; তবে ব্রোচের সুবাহ্‌দার কুতুবুদ্দীনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বিদেশ যাত্রা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন, এই কথা জানালেন।

দামনে গিয়ে ইয়োরোপগামী জাহাজের সন্ধান নেওয়ার উদ্দেশ্যে মোন্‌সারেট দল থেকে এগিয়ে যেতে চাইলেন। সৈয়দ সাহেব পাদ্রীর দেহরক্ষী হিসাবে আটজন অনুচর দিলেন। অবশ্য, তা'রা মাণ্ডু পর্যন্তই যাবে। মাণ্ডুর সুবাহ্‌দার নতুন দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করবেন। মাণ্ডুর সুবাহ্‌দার সম্রাটের হুকুম আগেই পেয়েছিলেন। তিনি পাদ্রীকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য একজন মুঘল সৈন্যকে পাঠিয়ে দেন। খৃষ্টান বা 'ফ্রাঙ্ক্‌' দেখলেই মুঘলদের হত্যাপ্রবৃত্তি দেখা দেয়। এই সৈন্যটাও মোন্‌সারেটকে খুন করার ফিকির খুঁজছিল। হত্যা ক'রে পাদ্রীর সর্বস্ব লুণ্ঠনও তা'র অভিপ্রায় ছিল। মোন্‌সারেট তা' আঁচ করতে পেরেছিলেন। সতর্ক থাকার দরুণ দুর্বৃত্তটার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে নি।

ঈশ্বরের দয়ায় পাদ্রী নিরাপদেই সুরাট পৌঁছলেন। এই সময়েই মুঘলদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে পর্তুগীজরা তাপ্তী নদীর মোহনায় কয়েকটা যুদ্ধ জাহাজ সাজিয়ে মক্কাগামী হজযাত্রীদের জাহাজের যাতায়াত বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। এই গোলমালে মোন্‌সারেটকেও কিছুটা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। সুরাটের নিকটবর্তী বিয়ারার মুঘল শাসনকর্তা পাদ্রীকে বন্দী করেন। পাদ্রী যখন তাঁকে

সম্রাটের মোহরাঙ্কিত খামটি দেখা'ন, তখন তাঁ'কে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাঁ'র মনোরঞ্জনের জন্য খাদ্য পানীয় অর্থ ভেট দিলেন। ইতিমধ্যে পাদ্রীর সহযাত্রীরাও এসে গেলো। শাসনকর্তাটি তা'দের কাছেও শুনতে পান যে সম্রাট পাদ্রীকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখেন। এর পর থেকে শাসনকর্তা এবং অন্যান্য পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা পাদ্রীর প্রীতি অর্জনের জন্যই যেন পরস্পরের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হোলেন। তাঁ'রা এমন ভাব দেখলেন যে তাঁ'রা পাদ্রীকে কোনদিন বন্দী করেন নি, তাঁ'র নিরাপত্তার জন্যই তাঁ'কে গৃহমধ্যে প্রহরায় রেখেছিলেন! বিপুল সমারোহে, তোপধ্বনি ক'রে এবং শাসনকর্তার বাড়ীতে আড়ম্বরপূর্ণ ভোজের আয়োজন ক'রে তাঁ'রা পাদ্রীকে সম্বর্ধনা জানালেন।

পাদ্রীর মন কিন্তু সেদিন বিষাদ ভারাক্রান্ত ছিল। আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে তাঁ'র কষ্ট হচ্ছিল। গুপ্তচর অভিযোগে সেদিন দুটি খৃষ্টান যুবকের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। তা'রা নাকি নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছিল। ওরা যদি খৃষ্টধর্ম ত্যাগ ক'রে ইস্‌লাম গ্রহণ করতে রাজী হোত, তবে তা'রা বেঁচে যেতো। কিন্তু ধর্মত্যাগ অপেক্ষা তা'রা মৃত্যুকেই বরণ ক'রে নিয়েছিল। স্থানীয় জৈন ধর্মাবলম্বী বণিকরা হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তা'দের বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। তা'দের অনুরোধও রাখা হয় নি।

ভোজের পর পাদ্রীকে পর্তুগীজ নৌবাহিনীর দিকে যেতে দেওয়া হোল। সেখানেও তাঁ'কে বিপুল সমারোহে আপ্যায়িত করা হয়। সারারাত আমোদ আহ্লাদ ও গোপন আলোচনায় অতিবাহিত হওয়ার পর সকালবেলা পাদ্রী সুরাটে ফিরে এলেন। তিনি যে ফিরে এলেন তা'তে মুসলমানরা খুবই বিস্মিত হয়েছিল।

তিনি যে নিষ্পাপ এবং তাঁ'র যে কোনও অভিসন্ধিই নেই, সে বিষয়ে মুসলমান শাসনকর্তা এবং অন্যরা নিশ্চিত হোল।

. সৈয়দ মুজাফ্‌ফর সুরাটে পৌঁছেই তাঁ'র নিকট আত্মীয় কুতুবুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কুতুবুদ্দীন তাঁ'কে সাফ জানিয়ে দিলেন যে সম্রাটের আদেশ পালন না করলে তিনি তাঁ'র সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখবেন না। সৈয়দ সাহেব বৃদ্ধ বয়সে স্পেনের মতো অজানা দূরদেশে যেতে,—বিশেষতঃ সমুদ্রপথে,—নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। আপনজন কুতুবুদ্দীনের কাছে কোনও ভরসা না পেয়ে সৈয়দ সাহেব তাঁ'র যথাসর্বস্ব ত্যাগ ক'রে একদিন বেমালুম উধাও হয়ে গেলেন। শোনা গেল যে তিনি সেদানীর (বর্তমান মহারাষ্ট্র) রাজার আশ্রয় ভিক্ষা করেছিলেন। সেদানীর অধিবাসীদের 'দক্ষিণী' বলা হয়। রাজদূতের প্রধান সহকারী কর্মচারীরূপে যিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন. সেই আবদুল্লা সাহেব ইতি-মধ্যে দামন শহরে পৌঁছলেন। নির্বাচিত রাজদূত নিরুদ্দেশ হওয়ার পর তিনি পাদ্রীর সঙ্গে গোয়ায় গেলেন।

গোয়ার পর্তুগীজ ভাইসরয়, ধর্মযাজক মণ্ডলী এবং স্থানীয় মুঘল রাজপ্রতিনিধি আব্‌দাল্লা সাহেবকে আন্তরিকতা এবং ভদ্রতা সহকারে অভ্যর্থনা করলেন। সম্রাট আকবরের প্রস্তাবিত রাজদূত মিশনের গুরুত্ব আবদাল্লা সাহেব বেশ বুঝতে পেরে-ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিজের এবং মোন্‌সারেটের বিদেশ যাত্রার যাবতীয় ব্যয় বহন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু সে বছর স্পেনগামী মাত্র একটি জাহা-জেরই সন্ধান পাওয়া গেল। জাহাজটি খুব ছোট। মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধির পক্ষে ওরকম একটি ছোট জাহাজে যাওয়া সমীচীন বলে' বিবেচিত হোল না। গোয়ার ধর্মযাজকর মণ্ডলীও মোন্‌সা-

রেটকে স্পেন যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু, উপযুক্ত জাহাজের অভাবে এক বছরের জন্য রাজদূত মিশনের স্পেন যাত্রা স্থগিত রইল। মাসের পর মাস কেটে বছর অতিবাহিত হোল। ইতিমধ্যে ভারতের ও ইয়োরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এত পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে যে বিদেশে রাজদূত প্রেরণের কথাই আর উঠল না।

ওদিকে সম্রাটের অস্থিরচিত্ততায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে রুডল্‌ফ্‌ ফতেপুরসিক্রি থেকে চ'লে আসার সুযোগ খুঁজছিলেন। গোয়ার ধর্মযাজক মণ্ডলীও তাঁ'কে ফিরে আসার জন্য একাধিক চিঠি লিখেছিলেন। অনেক কষ্টে রুডল্‌ফ্‌ গোয়ায় ফেরার অনুমতি পেলেন, তবে সম্রাট তাঁ'কে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিলেন যে যতো শীঘ্র সম্ভব তিনি ফিরে আসবেন। পরের বছর, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে রুডল্‌ফ্‌ গোয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তী জুলাই মাসের ১৫ তারিখে এই সজ্জন খৃষ্টান সাল্‌সেট্‌ অঞ্চলে দুর্বৃত্তদের হাতে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হ'ন। রুডল্‌ফ ছিলেন ডিউক অব্‌ আট্রিয়ার ছেলে এবং যেশুইট্‌ পাদ্রী মণ্ডলীর প্রধান যাজক ফাদার ক্লডিয়াস্‌ অ্যাকোয়াভাইভার ভ্রাতুষ্পুত্র। নম্র ব্যবহার, বিদ্যানুশীলন, পবিত্র জীবন যাপন, সকলের সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার,—এই সব গুণের জন্য রুডল্‌ফ্‌ সকলেরই প্রিয় ছিলেন। আকবরের সভায় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আবুল ফজল সময় পেলেই রুডল্‌ফের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করতেন। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁ'র নশ্বর জীবনের সমাপ্তি ঘটে। সম্রাট আকবর রুডল্‌ফের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মর্মাহত হ'ন। তিনি নাকি সখেদ উক্তি করেছিলেন, "হায়! পাদ্রী যদি আমার কথা শুনে এখানেই থেকে যেতেন!"

আকবর বাদ্‌শাহ্‌

বাদ্‌শাহ্‌ জালালুদ্দীন আকবরকে যেমনটি দেখেছি ও বুঝেছি, এখন তা' লিখ্‌ছি :—

আকবরের চেহারা ভাবভঙ্গী চলা বলা প্রভৃতি ছিল প্রকৃতই রাজকীয় মর্যাদায় মণ্ডিত। রাজোচিত আত্মসাতন্ত্র্যবোধ তাঁ'কে অন্য সবাইর থেকে পৃথক ক'রে রাখ্‌ত। প্রথম দর্শনেই, হাজার লোকের ভিড়েও, তাঁ'কে সম্রাট বলে' চেনা যায়। হাল্‌কা বাদামী তাঁ'র গায়ের রঙ, চওড়া কাঁধ, মাথায় দীর্ঘ কেশরাশি। দুটো পা'ই একটু বাঁকা, সম্ভবতঃ অতিরিক্ত অশ্বারোহণের ফলেই পায়ের গড়ন এইরকম হয়েছে। হাঁটার সময় বাঁ পায়ের উপর চাপ একটু বেশি পড়ে, মনে হয় বাঁ পা' একটু ছোট। কিন্তু কোনদিন বাঁ পায়ে আঘাত পেয়েছিলেন শুনিনি। চলার সময় মাথা ডানদিকে একটু হেলে থাকে। মুসলমানদের মতো টুপী পরেন না, দীর্ঘ চুলের গোছা জড়িয়ে নিয়ে হিন্দুদের মতো পাগ্‌ড়ি পরেন। প্রশস্তকপাল সূর্যালোকে সমুদ্র যেমন ঝল্‌মল্‌ করে তেমনই উজ্জ্বল ও তীব্র তাঁ'র চোখের দৃষ্টি। চোখের পাতার চুলও বেশ দীর্ঘ; কৃষ্ণ সাগরের তীরে ককেসাস্‌ পর্বত ও ড্যানিয়ুব নদীর অন্তর্বর্তী দেশের মানুষের মতোই তাঁ'র অক্ষিপল্লব। সরল সুউন্নত নাসিকা, নাসারন্ধ্র প্রশস্ত। বাঁ নাসারন্ধ্রের নীচে ঠোঁটের একটু উপরে ছোট একটি জড়ুল। বাদ্‌শাহ্‌ প্রত্যহ দাড়ি কামিয়ে ফেলেন, কিন্তু তুর্কী নও-জওয়ানের মতো গোঁফ রাখেন। শুনেছি হিন্দুদের খুসী রাখার উদ্দেশ্যেই মাথায় জড়িয়ে জড়িয়ে পাগড়ি পরেন। শরীর তাঁ'র কৃশও নয়, মেদবহুলও নয়, অত্যন্ত সুগঠিত বলিষ্ঠ ও সমর্থ তাঁ'র অবয়ব। খুব উচ্চ স্বরে হাসেন, হাসবার সময়ে তাঁ'র মুখের চেহা-

রাই বদলে যায়। অত্যন্ত সংযত তাঁ'র ভাবপ্রকাশ। রাগলে তাঁ'কে 'ভয়ানক মনোহর' দেখায়। সম্রাটের বয়স যখন আটত্রিশ বছর, তখন পাদ্রীরা ফতেপুর সিক্রিতে যান। যে কোনও লোকের সঙ্গে তিনি সহজেই আলাপ করতে পারেন। কথাবার্তায় লোককে মুগ্ধ করার একটি অসাধারণ ক্ষমতা লক্ষ্য করেছি। জনসাধারণ যাতে তাঁ'র নিকটে এসে বক্তব্য জানাতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে অনেক নিয়ম জারী করেছিলেন। সাধারণই হোক বা বিশিষ্ট কোনও নাগরিকই হোক, সবার জন্যই তাঁ'র দরবার কক্ষের দরজা উন্মুক্ত ছিল। সকলেই প্রতি তিনি শিষ্ট ব্যবহার করেন। সকলের সঙ্গেই মিষ্ট ভাষায় কথা বলেন। রাজকীয় গাম্ভীর্য, ঔদার্য ও নিরপেক্ষ ব্যবহারই তাঁ'কে সর্বজনপ্রিয় ক'রে তুলেছে। ইস্‌লামের প্রতি আনুগত্য গভীর না হওয়া সত্বেও তাঁ'র প্রাণনাশের চেষ্টা হয়নি কোনদিন। আকবরের এক বিস্ময়কর স্বজ্ঞা (intuition) ছিল; সুযোগ ও বিপদের সম্ভাবনা আগে থেকেই তাঁ'র অন্তরে প্রতিফলিত হোত, এবং পূর্বাহ্ণেই তিনি প্রস্তুত হতেন। কিন্তু হায়! তাঁ'র সর্বগুণই অর্থহীন; কেননা, প্রকৃত খৃষ্টজনোচিত বিশ্বাসের কোনও ছায়া ছোঁয়া তাঁ'র ছিল না।

আকবর ছিলেন দক্ষ পশু শিকারী। পাখী শিকারে তাঁ'র উৎসাহ ছিল না। মন ছিল তাঁ'র নিরুত্তেজ। সেই জন্যই হয়তো নানাপ্রকার উত্তেজনাপূর্ণ ক্রীড়া কৌতুকে সময় কাটাতেন। এই সব ক্রীড়া কৌতুকে অভিজাত শ্রেণী এবং সাধারণ মানুষ ও সরকারী কর্মচারী, সকলেই বিনাবাধায় যোগ দিতে পারতো। পলো খেলা, হাতী ষাঁড় হরিণ ও মোরগের লড়াই, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, সশস্ত্র মানুষে-মানুষ এবং মানুষে পশুতে লড়াই, —সাধারণতঃ এই সব ক্রীড়াই অনুষ্ঠিত হোত। পায়রা পোষা ও তা'দের

দিয়ে নানারকম ক্রীড়া কসরৎ করানো আকবরের এক বিশিষ্ট শখ ছিল। দশ রকম বিভিন্ন জাতের পায়রা পুষতেন, সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। পায়রার জন্য প্রাসাদের ছাদে সুদৃশ্য শাদা নীল ও অন্যান্য রঙের ইটে তৈরী অজস্র খুপরী ছিল। দূরে থেকে রঙীন ইটের কেয়ারী করা ছাদের অংশই দেখা যেতো, পায়রার খুপরীগুলো দেখা যেতো না। একদল খোজা ও যুবতী পরিচারিকা পায়রার তদারকীতে নিযুক্ত ছিল। নতুন কোনও জাতের পাখী বা অভিনব কোনও দ্রব্য কিংবা নতুন কোনও খেলা,—আকবর খুব আগ্রহ নিয়ে দেখতেন। গান বাজ্‌না নাচ ম্যাজিক শারীরিক কসরৎ এবং ভাঁড়ের লোক-হাসানো ইতরামি তাঁ'র খুব প্রিয় ছিল। এই সব হাল্‌কা ব্যাপারে উৎসাহী ও ব্যস্ত থাকলেও তিনি কখনই রাজকার্য সম্পর্কিত চিন্তা ও কর্ম থেকে বিরত থাকতেন না। সর্বদা'ই বহুলোক তাঁ'র নিকট ভিড় ক'রে থাকুক,—আকবর এই রকমটি চাইতেন। সম্রাটের রাজসভায় কোনও দিন বিদেশাগত আগন্তুকের সংখ্যা কম হোত না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের শাসনকর্তাদের প্রতি তাঁ'র এই নির্দেশ ছিল যে তাঁ'রা যেন প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাজধানীতে উপস্থিত থেকে বাদ্‌শাহ্‌র দরবারে নিয়মিত হাজিরা দেন। প্রাসাদ থেকে সম্রাট যখনই বাইরে কোথাও যেতেন একদল সশস্ত্র দেহরক্ষী এবং আমীর ওমরাহরা তাঁ'কে ঘিরে থাকতো। এরা সকলেই পায়ে হেঁটে সম্রাটের অনুসরণ করতো, এবং সম্রাট বললেই তবে নিজ নিজ ঘোড়ায় চড়তো।

পশ্‌মী বা সূতীবস্ত্রে তৈরী আগুল্‌ফ লম্বিত শাদা রঙের জামা পরিধান করাই হচ্ছে মুসলমানদের সামাজিক রীতি। এই রীতি অনুযায়ী পায়ের জুতোর গোড়ালীর দিক খোলা থাকে। আকবর শাদা রঙের জোব্বাও পরতেন না, তা'র পায়ের গোড়ালীর

কাছে জুতোর অংশও উন্মুক্ত থাকতো না। স্বর্ণখচিত রেশমী জামা পরতেন; জামার ঝুল কখনই হাঁটুর নীচে নামত না। পায়ে থাক্‌তো গোড়ালী ঢাকা জুতো। এই রকম জামা জুতো ও পাগ্‌ড়ির ফ্যাশন সম্রাটেরই উদ্‌ভাবিত। হীরা-মুক্তা-খচিত স্বর্ণালঙ্কার তাঁ'র উর্ধাঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করতো। ইয়োরোপীয় ধাঁচে তৈরী একটি তলোয়ার এবং দীর্ঘ একটি ছোরা তাঁ'র কোমরবন্ধনী থেকে ঝুলতো। অস্ত্রবিহীন ও দেহরক্ষী বিহীন হয়ে সম্রাট কখনই চলা ফেরা করতেন না। সর্বদাই জনা বিশেক সশস্ত্র দেহরক্ষী তাঁ'কে ঘিরে থাকতো। এমন কি, হারেমে প্রবেশের সময়ও দেহরক্ষী পরিবৃত হয়ে থাকতেন। কোনও কোনও সময় সম্রাট স্পেনীয়দের মতো টাইট্‌ অধোবাস পরতেন, তবে তা' প'রে প্রাসাদের বাইরে যেতেন না। হাতী ও উটের পিঠেও সাবলীল ভাবে চড়তে পারতেন। দুই ঘোড়ায়টানা গাড়ী হাঁকিয়ে যখন কোথায়ও যেতেন, তখন তাঁ'কে খুব আভিজাত্যপূর্ণ দেখাতো। গাঢ় লাল রঙের নরম মখ্‌মলে আচ্ছাদিত আসনে তিনি পা' গুটিয়ে গাড়ীতে বসতেন।

খুব কম ক'রেও চল্লিশ রকম ব্যঞ্জন বড়ো বড়ো পাত্রে সাজিয়ে খানা টেবিলে প্রত্যহ সম্রাটকে পরিবেশন করা হোত। রান্নার ঘর থেকে সূক্ষ্ম সূতী কাপড়ে ঢেকে ভোজ্যদ্রব্য কিশোর বয়সী ভৃত্যরা বয়ে নিয়ে আসতো; তা'দের খবরদারী করার জন্য একদল ভৃত্য খানসামার নেতৃত্বে কিশোর ভৃত্যদের ভোজন গৃহে প্রবেশের দরোজা পর্যন্ত তা'দের সঙ্গে থাকতো। সূতীবস্ত্রে ঢাকা পাত্রগুলি প্রধান সূপকার সীল্‌ ক'রে দিত, যেন পথিমধ্যে কেউ খাদ্যদ্রব্যে বিষ না মেশাতে পারে। খানা কাম্‌রার প্রবেশ দ্বারে কয়েকটি খোজা পরিচারক খানা পাত্রগুলি ভৃত্যদের কাছ থেকে

বুঝে নিত; এবং সেখান থেকে বয়ে নিয়ে খানা টেবিলে অপেক্ষমানা যুবতী পরিবেশিকাদের হাতে তুলে দিত। খানা ও পানীয় পরিবেশন করতো অনেকগুলি বালিকা ও অল্প বয়স্ক যুবতী।

আকবর সাধারণতঃ একাকী আহার করতেন। মান্যগণ্য অতিথি অভ্যাগতও মাঝে মাঝে সম্রাটের সঙ্গে একই টেবিলে আহার করতেন। তিনি কদাচিৎ মদ্যপান করতেন। তাঁ'র সাধারণ পানীয় ছিল পোস্ত-ভিজানো জল। যেদিন তিনি এই পানীয় বেশি পরিমাণে গ্রহণ করতেন সেই সব দিন চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় আচ্ছন্নের মতো অনেকক্ষণ প'ড়ে থাকতেন। তখন তাঁ'র শরীর কাঁপতে থাকতো।

আকবরের প্রাসাদ ইয়োরোপীয় রাজাদের মতোই আড়ম্বর-পূর্ণ ছিল। ভিৎ থেকে প্রাসাদের কার্নিস পর্যন্ত ইমারৎগুলি সুনির্বাচিত পাথরে তৈরী। ভিতরের দেওয়ালগুলি ফ্রেস্কোয়মণ্ডিত এবং কারুখচিত। ভারতের অন্যান্য রাজাদের বাড়ীগুলির তল সুউচ্চ নয়; সম্রাটের প্রাসাদ সে রকম নয়। প্রত্যেকটি তলই সুউচ্চ। গ্রীষ্মকালেও প্রাসাদের কক্ষগুলি ঠাণ্ডা থাকে। প্রাসাদটি চার অংশে নির্মিত। প্রথম অংশটিই সর্ববৃহৎ ও সর্বোত্তম; এইটি হচ্ছে সম্রাটের খাশমহল। দ্বিতীয় অংশে থাকেন সম্রাটের মহিষীরা। তৃতীয় অংশে শাহ্‌জাদা শাহজাদীরা এবং শেষ অংশে আছে ভাঁড়ার ঘর, বারুদখানা ও অস্ত্রাগার। প্রাসাদের ছাদ গম্বুজাকৃতি। প্রতিকক্ষই সু-আলোকিত এবং বায়ু চলাচলও সর্বত্র উত্তম। পাথরের দেওয়ালের উপর একরকম পুরু পলস্তরা দেওয়া আছে; তা'র জন্য কক্ষের ভিতরে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হয় না।

নিজ প্রাসাদ ছাড়া রাজধানীর অন্য অনেক স্থানেও সম্রাট অনেক সদৃশ্য বাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন। তা'র মধ্যে সেলিম চিস্তি বা পীর শেখ্-উল্-ইস্লাম সাহেবের কবর উল্লেখযোগ্য। রাজধানীতে আর একটি বিরাট ইমারৎ আছে; তা'র ভিতরে তিনশ'ফুট ব্যাস-বিশিষ্ট একটি জলাধার ছিল, সম্রাট সেখানে স্নান করতেন। প্রাসাদ ও বাড়ীঘর তৈরী ও তা'দের পরিকল্পনায় সম্রাটের বিশেষ অনুরাগ ও দখল ছিল। দিন-মজুরদের সঙ্গে সমান তালে তিনি পাথরও কাটতে পারতেন। তাঁ'রই পরিকল্পনা ও নির্দেশ অনুযায়ী প্রাসাদের বক্রখিলান (আর্চ) ও অন্যান্য অংশ নির্মিত হোত। স্থাপত্যের অলঙ্করণের কাজও তাঁ'রই নির্দেশে হোত। বাদ্শাহ্‌র মঞ্জুরী পেলে মিস্ত্রী কারিগররা স্থাপত্যের অংশগুলি নক্শা-মাফিক যথাস্থানে লাগিয়ে দিত। যেরুসালেমের প্রধান গীর্জাও এই রকমই পূর্বকল্পিত নকশা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছিল। আকবর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাস্তুকার মিস্ত্রী মজুরদের সঙ্গে মিশে কাজের তদারকী করতেন; নিজেও তা'দের কাজ করতে পারতেন। প্রাসাদের কাছেই একটি কারখানা স্থাপন করিয়েছিলেন। সেখানে সোনার সূক্ষ্ম কাজ, পর্দা ও কার্পেট বুনন, উৎকৃষ্ট তাঁতের কাজ হোত এবং এই সব কাজের জন্য সুদক্ষ শিল্পী ও কারিগর নিয়োজিত ছিল। আলেখ্য এবং ফ্রেস্কো আঁকার জন্য দক্ষ চিত্রকর ছিল। সময় পেলেই আকবর এই সব শিল্পী কারিগর এবং পটুয়াদের কাজ দেখতে আসতেন এবং অনেক সময় তা'দের সঙ্গে বসে তা'দের কাজ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতেন।

আকবর নিজ লিখতে পড়তে পারতেন না, কিন্তু অসাধারণ বিদ্যানুরাগী ছিলেন। দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি সম্মান করতেন। তাঁ'র রাজ-

সভায় এরূপ একটি স্থায়ী পণ্ডিতমণ্ডলী ছিল। প্রায়ই কোনও না কোন বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা হোত। সম্রাটের স্মরণ শক্তিও ছিল খুব প্রখর। সর্ব বিষয়েই তিনি যথাযথ বিচার ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিদের আলোচনা শুনে তিনি প্রভূত জ্ঞানঅর্জন করেছিলেন। সম্রাটের সঙ্গে কথা বললে কখনই বোঝা যেত না যে তিনি অক্ষর জ্ঞান শূন্য। নিজেও পণ্ডিতদের আলোচনায় যোগ দিতে পারতেন। তাঁ'র বাগ্মিতাও ছিল যথেষ্ট। ভাঁড় ও পরিহাসপ্রিয় লোকজনের কথাবার্তা শুনতে খুব ভালবাসতেন। বলতেন যে এর ফলে তাঁ'র ভাষাজ্ঞান এবং বাগ্মিতা বেড়েছে। কিন্তু, অভিনয় পছন্দ করতেন না; এ ব্যাপারে তিনি সাচ্চা মুসলমান ছিলেন।

মুসলমান রীতি অনুযায়ী এক সঙ্গে চারটি বিবাহিতা স্ত্রী থাকতে পারে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই চারটি স্ত্রী গ্রহণ করা যায়। তবে, ধনী ও ভরণ পোষণে সক্ষম হ'লে আর এক শ্রেণীর স্ত্রীও গ্রহণ করা যায়। তা' সামাজিক ও ধর্মীয় বিচারে দোষাবহ নয়। সাম্রাজ্যের শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে, সামন্ত নরপতি-দের বন্ধুত্ব ও আনুগত্য অর্জনের জন্য এবং নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিকল্পে মুসলমান সম্রাটগণ পূর্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রী প্রচুর সংখ্যায় গ্রহণ করতেন। সম্রাটের এই শ্রেণীর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল তিনশ' এরও বেশি। এত সংখ্যক স্ত্রী থাকা সত্বেও সম্রাটের মাত্র পাঁচটি সন্তান: তিন পুত্র ও দুই কন্যা (*)।

আকবরের তিন পুত্রের নাম: সেলিম (পরবর্তীকালে সম্রাট জাহাঙ্গীর) মুরাদ ও ড্যানিয়েল। দুই কন্যা,—খাতুম ও শহরুউন্নিসা। মোন্সা-রেট এই পাঁচ জনের নামোল্লেখ করেছেন। আরও একটি শিশু

সম্রাটের মন্ত্রী, সেনাপতি এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ জন (†)। এই সব হিন্দু কর্মচারী সম্রাটের বিশ্বাসভাজন ও অনুগত ছিলেন। প্রাসাদের সর্বত্র তাঁ'দের গতিবিধি অবাধ ছিল। এই অধিকার মুসলমান কর্মচারীদের ছিল না। পুত্রদের লেখাপড়া ও রাজকার্যে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব বর্ষীয়ান পণ্ডিতদের উপর অর্পণ করেছিলেন। অস্ত্রচালনা,রণনীতি, ঘোড়ায় ও হাতীতে চড়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হোত। শাহ্‌জাদীদের শিক্ষার প্রতিও তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। বাদশাহের কন্যারা এবং অন্যান্য পুরস্ত্রী বাইরের কোনও পুরুষ মানুষের সমক্ষে আসতেন না; তাঁ'রা হারেমের বাইরেই বিশেষ বেরোতেন না।

মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি ছিল এই রকম: প্রত্যেক মন্ত্রীকে আলাদা আলাদা ডেকে তাঁ'দের মত জেনে নিতেন। সকলের মতামত জেনে নিয়ে নিজের বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী

কন্যার কথা লিখেছেন, নাম বলেন নি। কাবুল যাওয়ার সময় ড্যানিয়েল এবং এই শিশু কন্যাকে হামিদা বেগমের হেফাজতে রেখে যান। ঐতিহাসিকরা আকবরের তিন পুত্র ও চার কন্যার নামোল্লেখ করেন: সেলিম, মুরাদ, ড্যানিয়েল, এবং শাহ্‌জাদী খানুম, শহরুন্নিসা, আরাম বানু ও শুক্রউন্নিসা।

† আকবরের হিন্দু কর্মচারীর সংখ্যা, মোনসারেট লিখেছেন,—বিশ। পক্ষান্তরে, আবুল ফজল লিখেছেন, সেনাবাহিনীতে দুইশ' থেকে পাঁচ হাজারী মনসবদারের মোট সংখ্যা দুইশ' বাহান্নর মধ্যে হিন্দু ছিল একত্রিশ জন। দুইশ' থেকে পাঁচশ' সৈন্যের নায়ক মনসবদারের মোট সংখ্যা একশ' তেষট্টির মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ।

সিদ্ধান্ত নিতেন। বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ মন্ত্রীদের পরামর্শই তিনি মেনে নিতে নিতেন। নিজে মনস্থির ক'রে থাকলেও ধৈর্য্য ধ'রে মন্ত্রীদের মতামত শুনতেন। নিজের মতবিরুদ্ধ পরামর্শেরও মূল্যায়ন করতেন। সম্রাটের নিকট যাঁ'রা আর্জি পেশ করতো বা অভিযোগ শোনাতো, সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী একজন মন্ত্রী সম্রাটের হয়ে তা' গ্রহণ করতো এবং আবেদনকারীর নাম ধাম লিখে রাখতো। দর্শনপ্রার্থীদের প্রতি সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন, সঙ্গে ক'রে সম্রাটের নিকট আবেদনকারী বা দর্শনপ্রার্থীকে নিয়ে আসা, বিদায়ের সময় আবার ভদ্রতা প্রকাশ করা, প্রভৃতির জন্য একজন বিশিষ্ট রাজপুরুষ প্রত্যহই দরবারে উপস্থিত থাকতো।

আকবরের রাজসভায় বিদেশী রাজা ও রাজদূতদেরও আনাগোনা কম ছিল না। অনেক রাজাই রাজ্যচ্যুত হয়ে সম্রাটের সাহায্যপ্রার্থী হতেন। অনেক প্রার্থীকেই সৈন্য, অস্ত্র ও অর্থসাহায্য দিয়ে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রে দিতেন। এই ধরণের সাহায্যদানের একটি সর্ত থাকতো: সাহায্যপ্রাপ্ত রাজারা তা'দের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে তা'দের রাজ্যে আকবরের নামাঙ্কিত মুদ্রা এবং আকবর-নির্দিষ্ট ওজন-পদ্ধতি চালু করবেন।

অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তুক এবং বিদেশীদের সঙ্গে আকবরের ব্যবহার আশ্চর্য রকমের ছিল। সৌজন্য এবং সহৃদয় ব্যবহার ও আদর আপ্যায়নে সম্রাট অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা'দের মন জয় ক'রে নিতে পারতেন। বিদেশী রাজদূতদের সঙ্গে অদ্‌ভুত ব্যবহারও করতেন। তুরাণের সম্রাট আব্‌দাল্লা খাঁ কয়েকবার আকবরের নিকট দূত পাঠিয়েছিলেন, প্রত্যেকবারই সম্রাট তা'দের সাথে সসম্মানে কথাবার্তা বলেছিলেন। তুরস্ক থেকে যখন দূত আসে তখন ঘটনা অন্যরূপ হয়। তুর্কী মিশনের দাম্ভিক ব্যবহার ও

বোলচাল সম্রাটের নিকট বিরক্তিকর হয়েছিল। তিনি তা'দের প্রধান রাজদূতকে বন্দী ক'রে শেকল দিয়ে বেঁধে দীর্ঘকাল লাহোর দুর্গে আটকে রাখেন; তুর্কী মিশনের বাকী সদস্যরা 'ধোঁয়ার মতো আকাশে মিলিয়ে গেলো'। তুর্কী রাজদূত আকবরকে স্পেন ও পর্তুগালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার দাবী জানিয়েছিল।

আকবরের পিসী মক্কায় হজ ক'রে ফিরে এলে সিল্কের চাদর দিয়ে রাস্তা মু'ড়ে দিয়েছিলেন, নিজে গিয়ে তাঁ'কে ঐ সিল্ক-বিছানো পথের উপর দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে প্রাসাদে নিয়ে আসেন, এবং সমস্তটা পথ দুপাশে অপেক্ষমান জনতার উপর টাকা পয়সা ছড়া'তে থাকেন।

অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি সম্রাট খুব কঠোরতা দেখাতেন। তা'দের মান, মর্যাদা, বিত্ত, সম্পত্তি সবই যে সম্রাটের দয়া ও মর্জির উপর নির্ভর করে এই ধারণা তা'দের অন্তরে বদ্ধমূল ক'রে দেওয়া হোত।

প্রত্যহ একজন পদস্থ কর্মচারী সাধারণ দৈনন্দিন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ও সম্রাটের নির্দেশ গ্রহণের জন্য উপস্থিত থাকতো। চার পাঁচজন বকেয়া-নবীশ বা কেরাণী দরবারে উপস্থিত থেকে সে দিনের যাবতীয় রাজ আজ্ঞা লিখে রাখতো। প্রত্যহই উপদেষ্টা পদস্থ কর্মচারী এবং বকেয়া-নবীশ পরিবর্তিত হোত। একপক্ষ কাল পরে আবার তা'দের পালা আসতো। সম্রাটের দেহরক্ষীদেরও পালাক্রমে হাজিরা দিতে হোত। প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য প্রধান কর্মচারীরা সকলেই সম্রাটের স্থায়ী কর্মচারী ছিলেন। প্রাসাদের ভিতরেই বিভিন্ন কক্ষে তা'দের এজলাশ ছিল। কর্মে বহাল থাকা কালে কোনও পদমর্যাদাসম্পন্ন রাজপুরুষের মৃত্যু হলে সম্রাট নিজ ব্যয়ে তা'দের সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় বহন করতেন।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাজস্ব বাবদ প্রচুর অর্থাগম হোত। প্রত্যেকটি অঞ্চলই প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ। আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য বাবদ শুল্কও যথেষ্ট আদায় হোত। শত্রু রাজ্য অধিকার করার ফলেও ধন সম্পত্তি পাওয়া যেত। ধনী ব্যাক্তির মৃত্যু হ'লে উত্তরাধিকারীকে কর দিতে হোত। বিভিন্ন খাতে রাজকোষে প্রতি বছরই প্রভূত অর্থ সংগৃহীত হয়ে সম্রাট আকবরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী সম্রাট ক'রে তুলেছিল। বিদেশী মুদ্রার লেন দেন এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে সম্রাটের একচেটিয়া অধিকার ছিল। সোনার বিনিময়ে রৌপ্যমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রা একমাত্র সরকারী খাজাঞ্চীর নিকটই পাওয়া যেত। বিভিন্ন মুদ্রায় কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার রীতি ছিল।

সম্রাটের অনুমতি পত্র ব্যতিরেকে কা'রো ঘোড়া বিক্রী করা নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য, ঘোড়া বিক্রীর উপর কোনও কর ধার্য ছিল না। সবচেয়ে ভালো ঘোড়া সম্রাটকেই বেচতে হোত। নীলামে অন্য ঘোড়াগুলির দর উঠ্‌তো। সম্রাট ন্যায্য মূল্যেই ঘোড়া কিনতেন, এবং সর্বসমক্ষে স্বর্ণমুদ্রায় ঘোড়া-বিক্রেতা তা'র ঘোড়ার দাম পেতো। মূল নির্ধারণ ও মুদ্রা প্রদানে কোনও কারচুপি ছিল না।

আকবর খুব মিতব্যয়ী ছিলেন, তাই তাঁ'র ধনরত্নও প্রচুর সঞ্চিত হয়েছিল। দুই শতাব্দী কালের মধ্যেও আকবরের সমকক্ষ ধনী সম্রাট কেউ ছিল না। বছরে চারবার প্রাসাদের উঠানে সর্ব সমক্ষে বস্তাপূর্ণ মুদ্রা ঢেলে ফেলে পুনরায় গণনা ক'রে পুনরায় বস্তাবন্দী ক'রে রাখা হোত। দশফুট ব্যাস ও ত্রিশফুট উঁচু—মুদ্রা সাজিয়ে এই সাইজের মুদ্রা স্তম্ভ বানানো হোত। বিভিন্ন মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা নিজে গণনা ক'র থালার সাজিয়ে রেখে সম্রাট আনন্দ

পেতেন। পাদ্রী এই রকম স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ দেড়'শ থালা একবার দেখেছিলেন।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতের নিমিত্ত সরকারী পরিচয় পত্রের রেওয়াজ ছিল। অনেক শ্রেণীর চুক্তিও সম্রাটের অনুমতি ভিন্ন বৈধ হোত না। এই সব অনুমতি পত্রকে 'ফর্মাণ' বলা হয়। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং অনেক আমলা কেরানী ফর্মাণ জারীর কাজে ব্যস্ত থাকতো। ফর্মাণ লেখা হওয়ার পর তা সম্রাটের জনৈকা বেগমের নিকট নিয়ে যাওয়া হোত। তিনি তা'র উপর সম্রাটের মোহর এবং নিজ অঙ্গুরীয়ের ছাপ দিয়ে ফেরৎ পাঠাতেন। সম্রাট কাউকে উপাধি সনদ বা সম্পত্তিদান করলেও পূর্বোক্ত মোহরাঙ্কিত ফর্মাণে তা' উল্লেখ ক'রে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হোত।

আদালতের বিচার খুব নিরপেক্ষ কঠোর ও ন্যায়সঙ্গত ছিল। জনসাধারণের ক্ষতিকর অপরাধে কঠোর শাস্তিই দেওয়া হোত। অপরাধী সরকারী কর্মচারী হ'লে তা'র শাস্তি হোত কঠোরতর। প্রাণদাণ্ডযোগ্য অপরাধের বিচার সম্রাট স্বয়ং করতেন। বিশেষ জটিল দেওয়ানী মামলাও সম্রাটের সমক্ষেই নিষ্পন্ন হোত।

সামান্য কারণেই সম্রাট উত্তেজিত হতেন, এবং অল্পেই উত্তেজনা প্রশমিত হোত। কাবুল অভিযানের সময় কয়েকজন সৈন্য মূলবাহিনী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল; তা'দের অনেককেই বন্দী ক'রে সম্রাটের নিকট নিয়ে আসা হয়। কয়েকজনের অপরাধ গুরুতর বলে' প্রমানিত হওয়ায় তা'দের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। যখন প্রহরীরা হতভাগ্য বন্দীদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, তা'দের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে বল্লো, "জাঁহাপনা আমাকে

হাঁড়িকাঠে চাপাবেন না, আমার গর্দান নেবেন না। খোদার দয়ায় আমার এক বিশেষ গুণ আছে।"

সম্রাট একটু কৌতূহলী হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কি সেই গুণ?"

লোকটি উত্তর দিল, "জাঁহাপনা, আমি খুব ভালো গাইতে পারি।"

সম্রাট ততক্ষণে রহস্যপ্রিয় হয়ে গিয়েছেন। বললেন, "তাই নাকি? বেশ শোনা তোর গান।"

বন্দী তখন গান শুরু করলো। আসলে সে গান গাইতেই জানতো না। কর্কশ কণ্ঠস্বরে চীৎকার করে' সে গান শুরু করলো। গানের নামে বেতালা চীৎকার শুনে উপস্থিত কেউই হাসি চাপতে পারলো না। হতভাগাটা তখন সম্রাটের দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে হাত জোড় ক'রে বললো, "জাঁহাপনা, আপনি হাসবেন না। সত্যিই আমি গান জানি, আমার গলার স্বরও ভালো। কিন্তু ফাটকে থাকার সময় প্রহরীদের অত্যাচার ও এখানে নিয়ে আসার সময় টানা হ্যাঁচড়া করার ফলে আমার গলার স্বর খারাপ হয়ে গিয়েছে। ফাটক থেকে নিয়ে আসার সময় সিপাহীরা আমাকে কিল চড় মারতে মারতে রোদের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছে। এ অবস্থায় কি গলা থেকে গান বেরোয়?"

লোকটার বুদ্ধিমত্তায় সম্রাট এতটা খুশী হয়েছিলেন যে শুধু ঐ লোকটাকেই নয়, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত সকল আসামীকেই মুক্তি দিলেন।

গর্হিত অপরাধে যা'দের প্রাণদণ্ডের আদেশ হোত, হাতীর পায়ের নীচে ফেলে তা'দের নিষ্পেসিত করা হোত। অনেক ক্ষেত্রে ফাঁসী অথবা মুণ্ডচ্ছেদও হোত। নারীহরণ, লাম্পট্য,

বলাৎকার প্রভৃতি যৌন অপরাধের শাস্তি ছিল গলায় ফাঁস পরিয়ে দড়ির দুই প্রান্ত টেনে শ্বাসরোধ ক'রে মেরে ফেলা। একটি ব্রাহ্মণ যুবতীকে ধর্ষণ করার অপরাধে সম্রাটের এক বিশিষ্ট মুৎসদ্দী কর্মী খাঁর গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধসত্ত্বেও সম্রাট দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করেন নি (২৮)।

বিচার কার্যের জন্য দুই জন মন্ত্রী নিযুক্ত ছিল। একজন শোনেন প্রাথমিক আর্জি; অপর জন শোনেন আপীল। ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির জন্য ছিলেন কাজী বা প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট। ফৌজদারী মামলার আসামীকে সাধারণ ফাটকে বা জেলে রাখা হোত না, হাতে পায়ে শিকল বেঁধে তা'দের দিয়ে কায়িক শ্রম করানো হোত। রাজ পরিবারের বা সম্রাটের নিকট কোনও আত্মীয় যদি অপরাধী সাব্যস্ত হোত তবে তা'কে গোয়ালিয়রের নরক সদৃশ দুর্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বন্দী জীবনযাপন করতে হোত। বিশিষ্ট পরিবারের অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ভার দেওয়া হোত অপর কোনও অভিজাত পরিবারের লোককে। সাধারণ অপরাধীকে শাস্তি পেতে হোত প্রাসাদের প্রধান জল্লাদের হাতে। বহু প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও অল্প কয়েক রকম শাস্তি দেওয়া হোত। কিন্তু লোকের মনে ভীতি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বহুবিধ শাস্তির সাজ সরঞ্জাম ও হাতিয়ার দুর্গদ্বারে সাজানো থাকতো। দুর্গের এই দরজার প্রহরায় নিযুক্ত থাকতো প্রধান জল্লাদ। অপর তিনটি প্রবেশদ্বারের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল যথাক্রমে দুর্গের প্রধান দ্বাররক্ষক, প্রধান পত্রবাহক ও প্রধান ক্রীড়ারক্ষক।

একটি কাঁসার পাত্রে অন্য একটি জলপূর্ণ পাত্র থেকে আস্তে আস্তে জল পড়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রতি পনেরো মিনিটে উপরের

পাত্রটির জল নিঃশেষ হয়ে নীচের পাত্রটিকে পূর্ণ ক'রে দিত। নীচের পাত্রটি পূর্ণ হলেই একটি লোক একটা ঝুলন্ত কাঁসার পাত্রে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করতো। এই শব্দ শুনেই সময়ের হিসাব হোত। এই পেটা ঘড়ির আওয়াজের সঙ্গে তাল রেখে প্রাসাদের সমুদয় কাজ নির্বাহ হোত। জলপাত্র ঠিক রাখা ও কাঁসার পাত্র পেটাবার জন্য লোক দিবারাত্রি মোতায়েন থাকতো। সূর্য ওঠার অনেক আগে, মোরগ ডাকার সাথে সাথেই এবং সূর্যাস্ত থেকে একঘণ্টা ধ'রে প্রাসাদের নহবৎখানায়, ঢাক ঢোল ভেঁপু প্রভৃতির সমবেত এক নারকীয় আওয়াজ প্রত্যহ শোনা যেতো; বর্বরতায় তা'র তুলনা মেলে না।

প্রধান পত্রবাহকের অধীনে যা'রা কাজ করতো তা'দের খুব দ্রুত দৌড়তে হোত। দৌড়ে কৃতিত্বের নিরীখেই এদের চাকুরী প্রাপ্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করতো। একটা ঘোড়া সারাদিনে যতোটা পথ দৌড়তে পারে, সম্রাটের এক একজন পত্রবাহকও ততটা পারে। শোনা যায় শিশু বয়সেই এদের শরীর থেকে 'লিভার' তুলে ফেলা হয়; সেইজন্যই এরা প্রচুর দৌড়লেও হাঁপিয়ে পড়ে না। অনেক-দিন ধ'রে এরা সীসায় তৈরী জুতো পায়ে দিয়ে দৌড় অভ্যাস করে। দৌড়বার সময় পায়ের গোড়ালী দিয়ে নিজের নিতম্ব স্পর্শ করতে পারে। এদেরই মারফৎ সাম্রাজ্যের দূর দূরান্তে সংবাদ আদান প্রদান হয়, ফর্মাণ পাঠনো হয়।

আকবরের সাম্রাজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে হিমবাহ,—স্থানীয় নাম কুমায়ুন,—সিন্ধুনদের উৎপত্তি অঞ্চল থেকে কাবুল রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত এই পর্বত প্রলম্বিত। দক্ষিণে গাঙ্গেয় উপসাগর, বিশনাগ ও নরসিংদের রাজ্যসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত আক-

বরের সাম্রাজ্য (*)। পশ্চিমে সমুদ্র এবং গেড্রোসিয়া (†)। পশ্চিম উপকূলে রয়েছে আরিয়াকদের রাজ্য (‡)। সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে এমোডি (২৯), যা' কি না সূর্যোদয়ের প্রান্ত অবধি প্রসারিত। সমগ্র সাম্রাজ্যের পরিধি বিশ হাজার মাইলের কম নয়। একমাত্র দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ছাড়া আর কেউই এত বড়ো সাম্রাজ্যের অধিপতি হ'তে পারেনি।

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যও আকবরের সাম্রাজ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র জলবায়ু একরকম নয়। বহুপ্রকার শস্য, ফুল ও ফল পাওয়া যায়। তুলা, আফিম এবং নীলের চাষ প্রচুর হয়।

তুর্কীরা এদেশকে হিন্দুস্তান বলে। অতীতে এক সময় এ দেশে খৃষ্টানরা রাজত্ব করতো, সে কথা আগেই লিখেছি। পর্তুগীজদের আগমনের অনেক আগেই তা'রা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তা'দের সম্বন্ধে নানাবিধ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কাশ্মীর এবং হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে খৃষ্টানদের গীর্জা এখনও দেখা যায়। হিন্দু যোগী, অন্যান্য সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীরা বলে যে মানস-সরোবরের তীরে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সেখানে যা'রা থাকে তা'রা ভারতের কোনও সম্প্রদায়ের মতো নয়। প্রতি অষ্টম দিনে তা'রা একটি অদ্ভুত আকারের ঘরে সমবেত হয়ে আরাধনা করে। একজন পুরোহিত লম্বা শাদা আলখাল্লা প'রে উঁচু বেদীতে বসে' একটি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করার পর আরাধনা শুরু হয়। এটি কিম্বদন্তী হলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।•

---

* বিজয়নগর ও তামিল দেশ।

† গুজরাট।

‡ টলেমির বর্ণনায় 'আরিয়াক' হচ্ছে মারাঠীদের দেশ।

ভারতের নগরীগুলি দূর থেকে ভারী সুন্দর দেখায়। সুউচ্চ অট্টালিকা ও অর্ধগোলাকার মন্দির ও প্রাসাদ-শীর্ষ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু পরিকল্পনাহীন নগর-বিন্যাস ও সরু বাঁকা-চোরা অলিগলি বিশেষ পীড়াদায়ক। আকারে বিরাট হলেও বাড়ীগুলিতে গবাক্ষ নেই বললেই চলে। রাস্তার আবর্জনার দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই বোধ হয় বাড়ীর জানলা না থাকাটা রেওয়াজ হয়েছে। ধনীরা তা'দের বাড়ীর বাইরের দেওয়ালে রঙীন্ পলস্তরা দিয়ে থাকে। ভিতরে দেওয়ালগুলিতে রঙীন প্রাচীর চিত্র আঁকা হয়। অনেকের বাড়ীতে সুন্দর ভাস্কর্যও দেখা যায়। ব্রাহ্মণদের বাড়ীর ভিতরে এবং বাগানে উপকথায় বর্ণিত বীর ও সাধু সন্তদের মূর্তি ভাস্কর্য সাজিয়ে রাখা হয। সাধারণ অধি-বাসীরা নীচু বাড়ীতে থাকে ; অনেকেই সারাজীবন কাটায় পর্ণ-কুটীরে। এদেশে অনেক সামন্ত রাজা আছে, হিন্দু ও মুসলমান দুইই। হিন্দুরাজাদের আছে মন্ত্রণাপরিষদ, এরা প্রায়ই উদারচেতা। পক্ষা-ন্তরে মুসলমান নবাবদের কোনও মন্ত্রীপরিষদ থাকে না। তা'রা নিজেদের মর্জিমাফিক রাজত্ব করে। আরব দেশে বন্দী অবস্থায় থাকাকালে এবং মুক্তি পেয়ে এই ডায়েরী লেখা সম্পূর্ণ করি।

—:—

পরিশিষ্ট

(নোট ও ভাষ্য)

১। নভসারি বা নওসারি

'নওসারিকম', নভসারি বা নওসারি বোম্বাই থেকে ১৪৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি ছোট শহর। মুসলমানদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে পার্শীরা বা জরথুস্ট্রের অনুগামীরা পারস্যের পশ্চিমাঞ্চল থেকে চ'লে এসে ভারতে আশ্রয় নেয়। পার্শীদের ভারত আগমন কয়েক শতাব্দী ধ'রেই অব্যাহত ছিল। জরথুস্ট্র ছিলেন পারস্যের পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী। তাঁ'র জীবৎকাল সম্পর্কে সকলে একমত নয়; সর্বাপেক্ষা গ্রহনীয় মত হচ্ছে এই যে, তিনি খৃষ্টপূর্ব ৬৬০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৫৮৩ অব্দকাল জীবিত ছিলেন (*)। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পারস্যে মুসলমান আধিপত্য শুরু হয়, এবং সেই সময় থেকেই জরথুস্ট্রের অনুগামীরা পারস্য থেকে চ'লে আসতে থাকে। জরথুস্ট্রের অনুগামীরা বর্তমান কালে পার্শী সম্প্রদায় নামে পরিচিত, এবং শুধু ভারত ছাড়া অন্যত্র কোথায়ও এই ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় নেই। পশ্চিম ভারতের দিউ অঞ্চলে পার্শীরা প্রথমে বসবাস করতে থাকে; প্রথম পার্শী শরণার্থীরা ভারতে এসেছিল ৭৬৬ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয় উদ্‌বাস্তু দল আসে ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে; বোম্বাইএর ষাট মাইল উত্তরে জয় রাণা নামক জনৈক হিন্দু জায়গীরদারের রাজ্য সঞ্জাম নামক স্থানে এই দ্বিতীয় দল উপনিবেশ স্থাপন করে। নভসারিতে পার্শী উদ্‌বাস্তুরা আসে ১১৪২ খৃষ্টাব্দে কামদীন জরথোষ্ট নামক জনৈক পার্শীর নেতৃত্বে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে 'চাঙ্গা আশা' নামক জনৈক পার্শী বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। তিনিই উদ্‌বাস্তু পার্শীদের জন্য 'পবিত্র বহ্নি' বহন ক'রে নিয়ে আসেন এবং নভসারিতে পার্শী ভজনালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পার্শীদের ধর্ম অনুষ্ঠানে পরিধেয় পোষাক—সুরদা ও কুসতি—পার্শীদের পক্ষে অবশ্য পরিধেয় ব'লে তিনিই প্রথম প্রচলিত করেন।

ইহুদীরা জরথুস্ট্রের প্রচারিত ধর্মমত ও ধর্মীয় আচারবিশ্বাস অনেকটাই গ্রহন করেছিল। জরথুস্ট্রের প্রভাব বাইবেলে প্রচুর লক্ষ্য করা যায়।

---

* Zoroaster, the Prophet of Ancient Iran (1901) by Prof. A. V. Willilams Jackson.

২। সুরাট

কিম্বদন্তী এই যে গোপী নামক জনৈক রাজা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে সুরাট নগরীর প্রতিষ্ঠা করে। প্রথমে এই নগরীর নাম ছিল 'সূরয'; পরে হয় 'সূরযপুর', মুসলমানদের অধিকারে আসার পর নাম হয় 'সুরাত্'। মোনসারেট মনে করেছিলেন কোরাণের 'শরিয়ত্' শব্দের অপভ্রংশ হচ্ছে 'সুরাট'। অবশ্য, একথাও লিখেছেন যে রাজা গোপীই এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (J.B. BRAS 1908, 245) জনৈক পর্তুগীজ পর্যটক Duarte Barbos (1514AD) কর্তৃক লিখিত এক ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদ মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে তিনি সুরাট গিয়েছিলেন, এবং তাঁর সময়ই সুরাট খুব সমৃদ্ধ নগরী ছিল। এই পর্যটন হয়েছিল কিম্বদন্তীর রাজা গোপীর সময়ের আগে। সম্ভবতঃ প্রাচীন এই শহরে রাজধানী স্থাপিত ক'রে রাজা গোপী এর উন্নতি সাধন করেন।

৩। খাজা জাফর

মোন্সারেট যা'কে খাজা সোফোরিস্ ব'লে পরিচিত করেছেন; তাঁ'র আসল নাম খাজা জাফর বা সফর আগা। গ্রীক পিতা ও তুর্কী মাতার সন্তান খাজা জাফর জন্মেছিলেন তুরস্কে। বীভারিজ এঁর নাম লিখেছেন রুমীখাঁ; গ্রীকদের মতো গায়ের রঙ ছিল তাই একে সবাই 'সফর' জাফর ব'লে ডাকতো। ইনি সুরাটের শাসনকর্তা ছিলেন, এবং সুরাটের দুর্গও এঁর তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়। দিউ'র পতনের পর ইনি পর্তুগীজদের হাতে বন্দী হ'ন, কিন্তু এঁর কর্মদক্ষতা এবং প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার পর পর্তুগীজরা এঁকে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্টিত করেন। ইনি কিন্তু পর্তুগীজদের পক্ষপাতী ছিলেন না; দলত্যাগ ক'রে মুসলমানদের পক্ষেই যোগ দেন। দিউ'র দ্বিতীয় যুদ্ধে (জুন, ১৫৪৬) সফর আগা নিহত হ'ন। সুরাটে তাঁ'র দেহ প্রোথিত হয়। হোয়াইট্ওয়ে এঁকে 'সিফ্র্ আগা' নামে অভিহিত করেছেন। বলেছেন ইনি 'দলত্যাগী ইতালীয়ান'। এঁর সম্পর্কে হোয়াইটওয়ে অনেকটা বিবরণ দিয়েছেন (Rise of Portugese Power in India. 1967, pp. 186, 227-315).

৪। রাজা হেন্‌রী

পর্তুগালের রাজা হেন্‌রীর মৃত্যু হয় ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ৩১ জানুয়ারী। তাঁ'র মৃত্যু সংবাদ ভারতে পৌঁছয় প্রায় এক বছর পরে। ঐ দিন চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, মোনসারেট সেকথা লিখেছেন। রাজা হেনরী ছিলেন ধর্মানুরাগী এবং একজন যেজুইট কার্ডিনাল। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে পর্তগালের রাজা সেবাষ্টিয়ান মরক্কো যুদ্ধে প্রাণ হারায়। তাঁ'র কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় সেবাষ্টিয়ানের খুল্লতাত হেন্‌রীকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়। বৃদ্ধ, অবিবাহিত এবং ধর্মযাজকতায় নিয়োজিত হেন্‌রী সিংহাসন গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, দেশব্যাপী অনুরোধের পর তিনি রাজা হ'ন। এক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই তাঁ'র মৃত্যু হয়। পর্তুগালের সিংহাসন দাবী করেন সেন্ট্‌ জন্‌ পাদ্রী সম্প্রদায়ভুক্ত অ্যান্টোনিও এবং স্পেন সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ সমারোহ সহকারে পর্তুগালের রাজধানী লিজবন শহরে প্রবেশ করেন। সেই থেকে দীর্ঘকাল পর্তুগাল স্পেনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। পর্তুগালকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় মুক্তবাহিনীও গঠিত হয়। স্পেন সম্রাটের প্রতিনিধি ডিউক অব্‌ ব্রাগাঞ্জা পর্তুগাল শাসন করতেন। ফ্রান্সের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কার্ডিনাল রিশ্‌লুর কূটনীতির ফলে ইংলণ্ড পর্তুগালের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে, এবং ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ভিকিওসার যুদ্ধে স্পেনীয় সৈন্যবাহিনীর চরম পরাজয় ঘটায়। দীর্ঘ পঁচাশী বছর পর পর্তুগাল স্বাধীনতা পুনর্জন করে। অবশ্য এই সময়ে পর্তুগীজদের বিদেশে ধর্মপ্রচার, বাণিজ্য বিস্তার, লুণ্ঠন ও বোম্বেটেগিরি অব্যাহতই ছিল।

৫। মাণ্ডু

পারমার রাজবংশের প্রতিপত্তির সময় মালব দেশের অন্যতম বিশিষ্ট নগরী রূপে মাণ্ডুর খ্যাতি হয়। আলাউদ্দীন খিল্‌জীর সেনাপতি আইন-উল্‌ মুল্‌ক্‌ ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে মালব জয় ক'রে দিল্লীর সুলতানদের অধীনে আনেন। ১৪০১ খৃষ্টাব্দে তৈমুর কর্তৃক দিল্লী আক্রান্ত হলে সেই সুযোগে দিলাওয়ার খাঁ ঘোরী মালব দেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তা'র পুত্র

হোসাঙ্ শাহ ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে ধাড় থেকে মাণ্ডুতে রাজধানী স্থানান্তরিত করে। আকবরের সিংহাসন আরোহণের দু'বছর আগে, ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে, শের শাহের প্রতিনিধি সুজা খাঁর মৃত্যু হ'লে তা'র পুত্র মালিক বয়াজিদ্ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মালিক বয়াজিদ্ 'রাজ বাহাদুর' নামে বিশ্রুত কীর্তি হয়েছিলেন। নিকটবর্তী সরঙ্গপুরের জায়গীরদারের রাণী রূপমতীর সঙ্গে তাঁ'র প্রেমকাহিনী রাজপুত চিত্রশিল্পে অম্লান হয়ে আছে। রূপমতী ছিলেন 'মালবের ক্লিওপাট্রা' —অপূর্ব সুন্দরী, অসমসাহসিনী এবং অসাধারণ বুদ্ধিমতী। পাঠান আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন প্রেম নিবেদনের ছলাকলায়। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতি রাজবাহাদুরকে যুদ্ধে নিহত করে এবং রূপমতীকে বন্দিনী ক'রে সম্রাটের নিকট পাঠাবার উদ্যোগ করে। রূপমতী বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। সরঙ্গপুরে (উজ্জয়িনী থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পূর্বে কালি সিন্ধ নদীর পূব পারে বর্তমান Dewas এর সন্নিকটে) 'রূপমতীকা গম্বুজ' নামক সমাধির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতকে সরঙ্গ সিং খীচি এই নগরীর সমূহ উন্নতি হয়।

মালবের প্রাচীন রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী; রাজধানী স্থানান্তরিত ক'রে সুলতান হোসাঙ্ই মাণ্ডুকে মুসলমানী রূপ প্রদান করে। মাণ্ডুর পুরাকীর্তি সমূহের মধ্যে হিন্দোল প্রাসাদ, জাহাজ মহল, সুলতান গিয়াসউদ্দীনের বেগমদের হারেম, চম্পা বাওরী, দিলওয়ার খাঁ ও হোসাঙ্ শাহের কবর, রূপমতীর প্রমোদ বিহার রেওয়া কুণ্ড প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর একটি দ্রষ্টব্য হর্ম্য হোল খৃষ্টীয় গীর্জার আদলে নির্মিত একটি জয়স্তম্ভ মামুদ খিল্জী চিতোর জয় ক'রে ঐ স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করেন। মাণ্ডু থেকে নিবিড় অরণ্য ও পার্বত্য পথে চল্লিশ মাইল পশ্চিমে ভারত শিল্পের ইতিহাসে বিখ্যাত 'বাগ' গুহা অবস্থিত।

৬। উজ্জয়িনী

যেজুইট পাদ্রী মিশন গোয়া থেকে ফতেপুরসিক্রি যে পথ ধ'রে গিয়েছিলেন, তা' পশ্চিম ও মধ্যভারতের বহু ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রসারিত। বরোদা থেকে এই পথ ধরেই মার্কোপলো, ইবন

বতুতা প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকরা পশ্চিমোপকুল থেকে দিল্লী ও উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থানে গিয়েছিলেন। মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, সরঙ্গপুর, নারোয়ার, গোয়ালিয়র প্রভৃতি শহর পাদ্রীরা অতিক্রম করেছিলেন। বাগগুহা, সাঁচী, বিদিশা এবং আরও অনেক পুরাতাত্ত্বিক স্থান তাঁদের যাত্রাপথের অনতিদূরেই ছিল। প্রত্যেকটি স্থানেই ইতিহাসবিশ্রুত কীর্তি কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে। মন্দির, দুর্গ, প্রাসাদ, মসজিদ, ভাস্কর্য ও পূর্ত কর্মের নিদর্শন দর্শকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। একমাত্র গোয়ালিয়রের দুর্গ ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থান বা বিষয়ই পাদ্রীদের মনে ইতিহাস জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে নি। গোয়ালিয়রের জৈন ভাস্কর্যকে খৃষ্ট ও তাঁর দ্বাদশ অনুচরের প্রতিমূর্তি ব'লে তাঁ'রা মনে করেছিলেন। সর্বত্রই তাঁ'রা 'হিথেন্' বা অবিশ্বাসীদের 'ঈশ্বরের করুণা থেকে বঞ্চিত বর্বরতার নিদর্শন' দেখেছেন। খৃষ্টধর্মের প্রচারকদের দ্বারা স্বর্গীয় আলোকপাতে আলোকিত না হ'লে কারও আত্মার পরিত্রাণ নেই, এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হিথেনদের নিকট প্রভুর আলোক বর্তিকা বহন ক'রে নেওয়ার পবিত্র দায়িত্ব খৃষ্টান পাদ্রীরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, মোনসারেটের ভারত ভ্রমণের বৃত্তান্তে এই কথাটাই প্রধান। ভারতের ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম ও সমাজ চেতনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন পাদ্রীরাই ভারতীয়দের নিকট থেকে যীশুকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অবশ্য সত্যিকার মানবপ্রেমিক পাদ্রীও এদেশে অনেকেই এসেছেন; খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে আমরা যতোটুকু জানতে পেরেছি তা' এঁদের জন্যই সম্ভবপর হয়েছে।

উজ্জয়িনীর বর্ণনায় মোন্সারেট লিখেছেন যে এই নগরীর 'প্রতিষ্ঠাতা' বিক্রমাদিত্য 'একজন ক্ষমতাশালী ধনী রাজা ছিলেন' 'শিল্প ও কারিগরী বিদ্যায় তাঁ'র খুব নৈপুণ্য ছিল, 'তিনি অনেক মন্দির নির্মান করেছিলেন, 'এই সব অট্টালিকা যদিও বৈশিষ্ট্যের দাবী করে, তথাপি তা' রোমক স্থাপত্য-কৌশলের সমকক্ষ নয়'। মোন্সারেট জানতেন না যে বিক্রমাদিত্যের হাজার বছর আগেও উজ্জয়িনী ভারতের এক বিশিষ্ট ও ঐতিহ্যপূর্ণ নগরী ছিল। সম্রাট অশোক উজ্জয়িনীর এক বৈশ্য পরিবারে বিবাহ করেছিলেন, পত্নীর বুদ্ধপূজার জন্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন, 'বৈশ্যের টেক্‌রি' নামে

তা' আজও পরিচিত। পুরী, বারাণসী, মথুরার মতোই উজ্জয়িনীও ভারতের অন্যতম সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানালোচনার কেন্দ্র। স্থাপত্যে, পূর্তকর্মে ও নগর পরিকল্পনায়, বিদ্বজ্জন সমাগমে উজ্জয়িনী অতুলনীয়।

হৈহয় রাজ বংশের রাজত্বকালে উজ্জয়িনীর সমধিক প্রসিদ্ধি হয়। খৃষ্ট জন্মের ছয় শতাব্দী আগে প্রদ্যোৎ রাজবংশের রাজধানী উজ্জয়িনী পশ্চিম ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী ছিল। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মৌর্য রাজবংশের প্রান্তীয় রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী ; যুবরাজ অশোক (পরবর্তীকালে সম্রাট) ছিলেন এখানকার রাজ্যপাল।

১২৩৫ খৃষ্টাব্দে পাঠান হানাদার আলতামস্ উজ্জয়িনী জয় করে, এবং সুবিখ্যাত মহাকাল মন্দির ও অন্যান্য অনেক স্থাপত্য কীর্তি ধ্বংস করে।

উজ্জয়িনীর বিখ্যাত 'যন্ত্র মহল' (মান মন্দির) নির্মিত হয় ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে মুঘল রাজ্যপাল (সুবাহদার) জয়সিংহের সময। উজ্জয়িনীকে 'ভারতের গ্রীণউইচ্' বলেও বর্ণনা করা হয় ; জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন উজ্জয়িনীতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছিল এবং তা' উন্নত ছিল বলেই মুঘল সম্রাটরাও উজ্জয়িনীতেই মান মন্দির স্থাপনায় উৎসাহী হযেছিলেন।

৭। *গোয়ালিয়র*

গোয়ালিয়রের প্রাচীন নাম গোপাচল বা গোপগিরি। কচ্ছবাহ রাজবংশের সুরয সেন নামক এক রাজা এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। কিম্বদন্তী এই যে সুরয সেন ছিলেন কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্ত। গোপগিরির নিকটে শিকার করতে গিয়ে একদিন তৃষ্ণার্ত হয়ে পাহাড়ের একটি গুহার নিকটে গেলেন। গুহায় থাকতেন গোয়ালিপ নামে এক সাধু। তিনি নিজ কমণ্ডলু থেকে রাজাকে জল দিলেন। জলপান করা মাত্রই রাজার ব্যধি-মুক্তি হয়ে গেল। কিভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন জানতে চাইলে সাধু রাজাকে পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ নির্মান করতে বলেন। রাজা তাই করলেন এবং দুর্গের নাম দিলেন গোয়ালিয়র, সাধুর নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই নামকরণ হোল। মুঘল আমলে গোয়ালিয়র

দুর্গের বিশেষ দুর্নাম হয়। রাজ পরিবারের অবাধ্য ও অবাঞ্ছিতদের আমৃত্যু বন্দী নিবাস ছিল গোয়ালিয়র দুর্গ। আওরংজেব মুরাদকে গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন। মুরাদকে মুক্ত করার এক ষড়যন্ত্র হয়। নির্ধারিত রাত্রে মুরাদ দড়ি বেয়ে দুর্গের প্রাচীর টপকে নীচে অপেক্ষমান ঘোড়ায় চ'ড়ে পালাবেন, এই ব্যবস্থা ছিল। বন্দী থাকার সময়েও তাঁ'র সঙ্গে ছিল সরস্বতী বাই নামে এক রক্ষিতা। তাঁ'র কাছে বিদায় নিতে গেলে স্ত্রীলোকটি ব্যাকুল কণ্ঠে কেঁদে ওঠে। কান্নার শব্দ শুনে দুর্গের রক্ষীরা ছুটে আসে এবং দুর্গ প্রাচীরে ঝুলন্ত দড়ি দেখে ফেলে। বন্দীদশা থেকেই নয়, আওরংজেবের আদেশে (কাজী মারফৎ) ইহজীবন থেকেই ঘাতকের তলোয়ার মুরাদকে চিরমুক্তি দিয়েছিল। (মুরাদ সম্পর্কিত তথ্য : History of Aurangzib by Sir Jadunath Sarkar Vol I & II 270—273)।

৮। ভাস্কর্যে জৈনমূর্তি

একসঙ্গে তেরোটি নগ্ন পুরুষমূর্তি'র ভাস্কর্য দেখে মোন্সারেট ধ'রে নিয়েছিলেন যে, তা' যীশু ও তাঁ'র দ্বাদশ অনুচরের প্রতিমূর্তি। অতীতে কোনও ভারতীয় খৃষ্টান নরপতি মূর্তিগুলি ইয়োরোপ থেকে আনিয়েছিল, পাদ্রীরা এই রকম অনুমান করেন। উইলফোর্ড নামক জনৈক ইয়োরোপীয় লেখক তাঁ'র রচিত 'এশিয়াটিক্ রিসার্চেস' পুস্তকে এই উক্তির প্রতিধ্বনি করেন। কানিংহাম এই ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। মূর্তিগুলি বড়ো পাথরের Plaque-এ অল্পোন্নত খোদাই করা (basso relievo) ভাস্কর্য। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে যে তোমর নরপতি ডাঙ্গের সিং এর রাজত্বকালে (১৪৫০ ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দ) এই মূর্তিগুলি খোদিত হয়েছিল। মধ্যস্থলের মূর্তিটি অন্যগুলির তুলনায় বড়ো। খুব সম্ভবতঃ এই মূর্তিগুলি অজ্ঞাত পরিচয় কোনও জৈন তীর্থঙ্কর ও তাঁ'র শিষ্যদের প্রতিরূপ।

৯। লেন্ট

খৃষ্টীয় ইষ্টার পর্বের রবিবারের আগের চল্লিশ দিনকে 'লেন্ট' বা পুণ্য

সহভাগ অথবা শোকের সময় হিসাবে গণ্য করা হয়। খৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দিনকে 'গুড ফ্রাইডে' বা পবিত্র শুক্রবার বলা হয়, কারণ ঐ দিনে ঈশ্বরের প্রেরিত পুত্র যীশুকে ক্রুশ কাঠে হত্যা করা হয়। যীশু কবর থেকে পুনরুত্থান করেন পরবর্তী রবিবার, যা'র নাম 'ইষ্টার সানডে'। সর্বপ্রকার আনন্দ উৎসব এবং সাড়ম্বর খানাপিনা এই চল্লিশ দিন ধার্মিক খৃষ্টানের নিকট পরিহার্য। বাইবেল পাঠ, যীশুর জীবনী ও বাণী এবং উপদেশ পাঠে লেন্ট এর দিনগুলি অতিবাহিত করতে হয়। অনেকে এই সময় মাছ মাংসও খায় না, কেউ বা উপবাস করেন, অবশ্য এই রকম কঠোরতা পালনের কোনও ধর্মীয় নির্দেশ নেই।

১০। আকবরের শিল্পপ্রীতি

মোন্‌সারেটের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে তিনি ফতেপুর সিক্রিতে আকবরের খানা কামরায় মাতা মেরী, যীশু, মোজেস্ এবং মহম্মদের প্রতিকৃতি দেওয়ালে টাঙানো আছে দেখেছিলেন। মাতা মেরীর ছবি প্রাসাদ অলিন্দে টাঙিয়ে জনৈক আত্মীয় সম্রাটের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। প্রাসাদের কক্ষগুলির দেওয়ালে ও ছাদের তলদেশে নানা বর্ণে রঞ্জিত ফ্রেস্কো আঁকা ছিল, বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেও তা'র চিহ্নাবশেষ দেখা গিয়াছে আকবরের শিল্পপ্রীতি ইতিহাস বিশ্রুত। মুঘল স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের উদ্ভব এবং সাধারণভাবে সমগ্র অভিজাত সমাজে শিল্পপ্রীতি আকবরের সময়েই হয়েছিল।

> ভারত-শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা আনন্দ কুমারস্বামী লিখেছেন: আকবরের সময়েই ভারত শিল্পের নবজাগরণ হয়। তিনি নিজে লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু তাঁ'র রুচি, বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রতিভার যে পরিচয় আমরা পাই, তা'তে ভারতীয় আদর্শের বিচারে এবং রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ রূপে ভারতের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ শাসক রূপে তাঁ'কে চিহ্নিত করা যায়। ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদের গঠন নৈপুণ্য তাঁ'র উৎকৃষ্ট স্থাপত্য জ্ঞানের পরিচায়ক। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অনুরাগ নিম্নোদ্ধৃত তাঁ'র নিজের

কথাতেই ব্যক্ত হযেছে: 'অনেকে চিত্রশিল্পকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আমি এই সব সমালোচককে পছন্দ করি না। আমার মনে হয় চিত্রশিল্পীরা ঈশ্বরকে জ্ঞাত হওয়ার এক অপূর্ব ক্ষমতা আয়ত্ত করেছেন। প্রাণবান জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একের পর এক তুলি দিয়ে এঁকে যখন অঙ্কিত দেহে আত্মার সংস্থাপনে অপারগ হ'ন, তখন চিত্রকরকে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতেই বাধ্য হ'তে হয়। একমাত্র ঈশ্বরই জীবে প্রাণের সঞ্চার করতে পারেন। এই উপায়েই শিল্পীর পরমজ্ঞানের উদয় হয়।' (Modern Review. 1910 April)

১১। আগ্রা

আগ্রা শহর হযে ওঠার আগে ছিল বিয়ানা নামক একটি ছোট জায়গীরের নগণ্য একটি গ্রাম। সিকান্দার লোদীই এই গ্রামকে শহরের রূপ দেন। দিল্লীর অত্যধিক গরমে সৈন্যরা পীড়িত হয়ে পড়ে দেখে সিকান্দার শাহ্ লোদী যমুনার তীরে একটি উপযুক্ত স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করা মনস্থ করেন। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময়ে আগ্রা শহরের পত্তন হয়। নিযামত উল্লা এর একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন: কযেকজন বিশিষ্ট ওমরাহ যমুনার এক বাঁকের পাশে অবস্থিত বিযানা জায়গীরের অন্তর্গত একটি গ্রাম নির্বাচিত ক'রে সিকান্দার শাহ্‌কে জানায়। নির্বাচিত স্থান পরিদর্শনের অভিপ্রায়ে সুলতান সপারিষদ বজ্‌রায় চ'ড়ে দিল্লী থেকে নদী পথে রওনা হন। নির্বাচিত স্থানের কিছু দূরে যখন বজরা পৌঁছেছে, সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কত দূর ?" অমাত্য মিহ্‌তর মোল্লা খাঁ বললেন, "অগ্রে, আর একটু আগে ঐ যে বাঁকের পাশে উঁচু জায়গা দেখ্‌ছেন, ঐ খানেই।" সিকান্দার শাহ্ বললেন, "বেশ, তা' হলে জাযগাটার নাম দেওয়া যাক 'আগ্রা'।" কিন্তু সিকান্দার লোদীর আগ্রা ছিল নদীর বাঁ তীরে, বর্তমান আগ্রার বিপরীত পারে। নদীর ডান পারে সম্রাট আকবর ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে আগ্রার দুর্গ নির্মান করেন। আগ্রা দুর্গে সম্রাটের দুইটি কি তিনটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওযার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যায। অপদেবতারা দুর্গের উপর

দৃষ্টি ফেলেছে, এই আশঙ্কায় আকবর সপরিবারে অন্যত্র উঠে যাওয়ার চিন্তা করছিলেন। সেলিম চিস্তির উপদেশ ক্রমেই ফতেপুর সিক্রিতে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়; এখানে আকবরের কোন সন্তানের মৃত্যু হয় নি।

১২। ভারতে খৃষ্টান রাজত্ব

মোন্‌সারেট বারে বারেই লিখেছেন যে মুসলমান আধিপত্যের আগে দিল্লী তথা ভারতে খৃষ্টানরা রাজত্ব করতো। এর কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। অধ্যাপক হয়ল্যাণ্ড ও অধ্যাপক ব্যানার্জী এই জন্যই মোন্‌সারেটের উক্তিকে গাঁজাখুরী গল্প বা winter's tale বলেছেন। কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলে এমন কয়েকটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে যা' খৃষ্টীয় গীর্জার আমলে তৈরী। মালাবারে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকেই খৃষ্টধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। পারস্য থেকে জরথুস্ত্রের অনুগামীদের সঙ্গে খৃষ্টধর্মাবলম্বীরাও অনেকে হয়তো মুসলমানদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতে শরণাগত হয়ে এসেছিল। রাজপুত ইতিহাস প্রণেতা জেম্‌স্ টড্ লিখেছেন যে মেবারের রাণা পরিবার সম্ভবতঃ পারসিক বংশোদ্ভূত অথবা বিদেশাগত খৃষ্টান। আবুল ফজল লিখেছেন যে মেবারের রানা বংশ পারস্যের সম্রাট নওশিরোয়ান-এ-আদিলের বংশধর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে নানা সম্প্রদায় ও নানা ধর্মাবলম্বী বিদেশাগত মনুষ্যগোষ্ঠী ভারতে এসেছে, বিশাল ভারতীয় সমাজের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ভারতের ধর্ম ও সমাজ চিন্তার বিবর্তনের অভ্রান্ত তথ্য অদ্যাবধি লিখিত হয় নি। মোন্‌সারেট তাঁ'র ধারণার উৎস সম্পর্কে কিছুই লেখেন নি, সেই জন্যই তাঁ'র উক্তিকে নিছক কাল্পনিক উক্তি বলা হয়। খৃষ্ট জন্মাবার অনেক আগেই ইন্দো-গ্রীক ও ইন্দো-সীথিয়ান জনগোষ্ঠী গান্ধার ও পশ্চিম পাঞ্জাবে রাজত্ব করেছিল, কালক্রমে তা'রাও ভারতীয় সমাজের অন্তর্গত হয়ে যায়। খৃষ্ট পূর্ব ১২৬ অব্দে গ্রীক হেলিওডোরা বিদিশায় গরুড়স্তম্ভ নির্মান করিয়াছিলেন, নিজেকে বৈষ্ণব ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। অষ্টম থেকে

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত কাশ্মীরে এমন কয়েকটি হিন্দু মন্দির নির্মিত হয়েছিল যা ইয়োরোপীয় স্থাপত্য রীতির নিদর্শন। মানস সরোবরের নিকটে এমন এক উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ মোন্‌সারেট দিয়েছেন যা' পড়লে মনে হয় এরা সম্ভবতঃ কোন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়। এ বিষয় নিয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না।

কাশ্মীরের স্থাপত্য সম্পর্কে কুমারস্বামীর History of Indian and Indonesian Art, 1965, p. 143 দ্রষ্টব্য।

১৩। ধর্মগ্রন্থের অগ্নিপরীক্ষা

অগ্নি পরীক্ষার মাধ্যমে ধর্মগ্রন্থের অভ্রান্ততা ও ধর্মযাজকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের নজীর অন্যান্য দেশের অন্যান্য সময়ের ইতিবৃত্তও পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাশ্যপ মাতঙ্গ নামক জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত হান্‌ বংশীয় দ্বিতীয় সম্রাট মিঙ্‌-তি'র আমন্ত্রণে চীনদেশে গিয়েছিলেন। সম্রাট তাঁ'কে প্রচুর সমাদর করেন। এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাও ধর্মীয় পুরোহিতরা তাও শাস্ত্র বৌদ্ধ পুঁথির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তা' প্রমাণ করার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করেন। অনুরোধ রক্ষিত হয়। তাও পুঁথিগুলি ভস্মীভূত হয়, কিন্তু বৌদ্ধ পুঁথিগুলি অক্ষত থাকে। S Beal এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৪। শেখ্ আবুল ফজল

আবুল ফজলের পিতার নাম শেখ মুবারক; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম আবুল ফৈজ, ডাক নাম ফৈজী। সিন্ধু দেশ থেকে এসে মুবারক পরিবার আজমিরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত নাগর নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন সেখান থেকে শেখ মুবারক সপরিবারে আগ্রার বিপরীত দিকে যমুনার ওপারে ওঠে আসেন। ছেলে দুইটিরও এখানেই জন্ম হয়। হিজরা দশম শতকে আগ্রা অঞ্চলে 'মাহদবী' আন্দোলন দেখা দেয়। ইমাম মাহ্‌দি বা যুগাবতার অচিরেই আবির্ভূত হয়ে ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও ধর্মহীনতা

থেকে মানুষকে পরিত্রাণ করবেন এই কথা প্রচার হতে থাকে। জৌনপুরের মীর সৈয়দ মহম্মদ এবং বিয়ানার (আগ্রার বিপরীত দিকে, যমুনার পূব পারে) শেখ আলাই এই আন্দোলন পরিচালিত করে। মাহ্‌দবী চিন্তাধারার বিরোধিতা করেন সুলতানপুরের মখদুম-উল্‌-মুল্‌ক্‌ মৌলানা আব্দুল আন্‌সারি। শের শাহের সময় থেকে আকবরের রাজত্বের প্রথম বিশ বছর ইনিই উত্তর ভারতে মুসলমান সমাজে সর্বপ্রধান ধর্মীয় নেতা ছিলেন। মাহ্‌দবী আন্দোলনের নেতারা সম্রাটের দরবারে মৌলবী মোল্লাদের বিরুদ্ধে ধর্মহীনতার অভিযোগ এনে বক্তৃতা করতো। শেখ মুবারক মাহ্‌দবী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন, এই জন্য তিনি মখ্‌দুম-উল্‌-মুল্‌কের বিষদৃষ্টিতে পড়েন। পাঠান রাজত্বকাল শেষ হ'লে মুঘলদের সময়, বিশেষতঃ আকবরের রাজত্বকালে মাহ্‌দবীদের উপর কট্টর মোল্লাদের উৎপীড়ন নিপীড়ন কমতে থাকে। শেখ মুবারক ছিলেন পণ্ডিত ও প্রগতিশীল মানুষ; মুসলমান সমাজ সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত হোক, এই ছিল তাঁ'র কামনা। আকবরের অন্যতম বৈমাত্র ভাই আজিজ কোকাহ্‌ শেখ মুবারককে মোল্লাদের শত্রুতা থেকে রক্ষা করেন।

মুবারক ও তাঁ'র দুই ছেলের পাণ্ডিত্য ও উদার মনোভাবের খ্যাতি ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে আকবর চিতোর অবরোধ করেন, সেই সময় ফৈজী আকবরের সঙ্গে পরিচিত হ'ন। ফৈজীই কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবুল ফজলকে সম্রাটের নিকট নিয়ে আসেন। দুইটি ভাইই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধে ছিলেন। এদের উদার মনোভাবই সম্রাটের আকর্ষণের হেতু হয়েছিল। সেই সময় প্রত্যেক আমীর ওম্‌রাহ কিছু সংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ক হতেন; কে কতো সৈন্যের অধিনায়ক বা মন্‌সবদার, তা'র নিরীখেই মন্‌সবদারের কৌলিন্য নিরূপিত হোত। আবুল ফজল ছিলেন আড়াই হাজার সিপাহীর মন্‌সবদার। তৎসত্ত্বেও আকবর তাঁ'কে মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। গোঁড়া মোল্লাদের সঙ্গে তর্কাতর্কি ক'রে সুকৌশলে তা'দের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব উদ্‌ঘাটন করাই তাঁর অন্যতম কাজ ছিল।

শেখ্‌ মুবারক একটি দলিলের মুসাবিদা করেন, এবং বহু আলোচনার

পর দরবারের যাবতীয় মোল্লা ও উলেমাগণ তা' অনুমোদন করে। এই দলিলে আকবরকে মুসলমান সমাজের ও ইস্‌লামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা বলে স্বীকার করা হয়। দলিলে দরবারের সকল উলেমা ও মোল্লাই দস্তখত দিয়েছিল। এই দলিল সম্পাদিত হয় ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে। এর পরে মুবারক ও ফৈজী রাজসভায় আর কোনও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। মুবারক মারা যা'ন ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে, ফৈজী ১৫৯৫ তে। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে আকবর ফৈজীকে 'রাজকবি' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে আবুল ফজলকে দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। শাঠ্য স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতা তখনকার সেনানায়কদের মধ্যে ব্যাপক ছিল। এরই ব্যত্যয় হিসাবে রাজানুগত্য ও সততার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রযোগের দ্বারা আবুল ফজল এক বিরল ও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। খান্দেশের তৎকালীন অধিপতি বাহাদুর শাহ্ স্বীয় কন্যার সঙ্গে আবুল্ ফজলের বিবাহের প্রস্তাব করেন। আবুল ফজল সেই প্রস্তাব এই ব'লে প্রত্যাখ্যান করেন, "সম্রাটের বদান্যতা আমার অন্তর পূর্ণ ক'রে রেখেছে, সেখানে অন্য কারও কাছ থেকে উপহার রাখার স্থান নেই।"

আবুল ফজলের মৃত্যু (আগষ্ট ১৬০২) খুব দুঃখজনক। শাহ্‌জাদা সেলিমের ধারণা হয়েছিল যে আবুল ফজল তাঁ'র সিংহাসন প্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে আছেন। সম্রাট তাঁ'র কথায় কান দিয়ে হয়তো অন্য কোনও ভাইকে সিংহাসন দিয়ে যাবেন। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনের পথে, ঝাঁসী থেকে ষোল মাইল পূবে অবস্থিত ওর্ছার জায়গীরদার বুন্দেলা রাজা বীরসিং এর অতিথি হয়ে কয়েকদিনের জন্য আবুল ফজল প্রভৃতিকে বিশ্রাম করতে হয়। সেলিমের প্ররোচনায় বীরসিং আবুল ফজলকে হত্যা করে। আকবর এই সংবাদ পেয়ে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করেন; সখেদে বলেছিলেন, "সম্রাট হওয়ার জন্য সেলিম আবুল ফজলকে হত্যা করলো কেন? তা'র পরিবর্তে আমাকেই তো হত্যা করতে পারতো!"

খাঁ খানান্, খাঁ আজম ও খাঁ জাহান, —এই তিন শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন জঙ্গী ওম্‌রাহরাই আকবরের সাম্রাজ্য রক্ষা ও তা'র পরিসর বৃদ্ধির সহায়ক ছিল। কিন্তু আবুল ফজলের এমন এক স্বাতন্ত্র্য ছিল যা'

তুলনাহীন। ধর্ম ও নীতিবোধ, প্রগতিশীল উদার মনোভাব এবং নিরপেক্ষ বিচারবোধ, —যে সব গুণের জন্য আকবর ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন, তা'র অনেকটাই যে আবুল ফজলের প্রেরণা ও পরামর্শদানের ফলে হয়েছিল, তা'তে সন্দেহ নেই। বুদ্ধি, চাতুর্য, সমর নৈপুণ্য, প্রশাসন দক্ষতা প্রভৃতিতে আবুল ফজলের চেয়ে অধিকতর অবদান অনেকেই দিয়েছেন, কিন্তু নিঃস্বার্থ সৎ বিবেচনা ও অকুণ্ঠ পরামর্শ দানে আবুল ফজলের সমকক্ষ আকবরের সমকালীন ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে লিখিত না হ'লে আকবরের নাম অন্য অসংখ্য মুসলিম নবাব বাদশাহ্‌র নামের সঙ্গে এক-নিঃশ্বাসেই আমরা উচ্চারণ করতাম, ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে আকবর যে কী অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সে সংবাদ আমাদের অগোচর থাকতো। মুঘল বাদশাহরা তাঁ'দের রাজত্বকালীন ইতিবৃত্ত লেখার জন্য লোক নিযুক্ত করতেন; আওরঙ্গজেবের সময়ে রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও সামরিক ইতিহাস আমরা 'আলমগীর নামা' থেকে জানতে পারি। কিন্তু মানুষ আওরঙ্গজেবকে শেষোক্ত গ্রন্থ পাঠে যতোটা জানতে পারি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পাঠে মানুষ আকবরকে তা'র তুলনায় অনেক বেশি ক'রে জানতে পারি।

১৫। সাপ্তাহিক ধর্মসভা

মুসলমানী রীতি অনুযায়ী শুক্রবার হচ্ছে ধর্মদিবস। সপ্তাহান্তিক ধর্মানুষ্ঠান বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই শুরু হয়। এই সময়, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার রাত্রি পর্যন্ত, ধর্ম সংক্রান্ত তর্কাতর্কি ও অন্যান্য সাধারণ ব্যবহারিক কাজকর্ম করতে নেই। সপ্তাহের অন্যান্য দিন তিনবার নামাজ পড়লেই হয়, কিন্তু শুক্রবার নামাজ করা কর্তব্য পাঁচ বার। নামাজ ও কোরাণ পাঠেই শুক্রবার—জুম্মাবার—অতিবাহিত করতে হয়। আকবরকে মুসলমান সমাজের নেতারূপে স্বীকার করার

পর থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধর্মীয় নির্দেশ মেনে চলার প্রথা রহিত হয়। প্রাসাদের এক অংশে, যা' 'ইবাদৎখানা' নামে পরিচিত ছিল, ইতিপূর্বে শেখ সৈয়দ উলেমা ও আমীর ওম্‌রাহবর্গ এবং ব্রাহ্মণ, জৈন, পার্শী সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ও ধর্ম নেতাগণ ধর্ম সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা করতেন। আকবরকে মুসলমান সমাজের ধর্মীয় নেতা (মুজতাহিদ্') রূপে স্বীকৃতি দেওয়ার পর অন্য একটি কক্ষে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দর্শন ও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক হোত। ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা সীমিত হয়ে গিয়েছিল; কারণ, ধর্ম সম্পর্কে মুজ্‌তাহিদ্ যে ফর্মান দিতেন তা'র উপর তর্ক বা আলোচনা চল্‌তো না।

১৬। আকবরের জন্মকাল ও জন্ম তারিখ

ভিনসেন্ট্ স্মীথ্ আকবরের জন্মকাল ও জন্মতারিখ সম্পর্কে লিখেছেন :— রাজপুতানার মরুভূমিতে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর পূর্ণিমার রাত্রে আকবরের জন্ম হয়। নবজাতকের নামকরণ হোল—বদরুদ্দীন মহম্মদ আকবর। বদরুদ্দীন শব্দের অর্থ হচ্ছে ধর্মের পূর্ণচন্দ্র। মহম্মদ একটি পবিত্র শব্দ, ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠাতার নাম। আকবর শব্দের অর্থ হোল মহান্। মাতামহের নাম ছিল শেখ আলী আকবর জামী, তাঁ'র নাম থেকেই 'আকবর' শব্দ গৃহীত হয়। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন কাবুল অধিকার করেন, সেই সময় আকবরের ছুন্নৎ হয়, এবং তাঁ'র জন্ম সময় তারিখ ও নাম বদ্‌লে দেওয়া হয়। হুমায়ুনের আত্মীয়রা তৎকালীন কুসংস্কার বশতঃ মনে করতেন যে বালকের প্রকৃত নাম ও জন্ম সময় জানতে পারলে জ্যোতিষী গণৎকার প্রভৃতির সাহায্যে শত্রুরা বালকের ক্ষতি করতে পারে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন পত্নী হামিদা বানুকে নিয়ে রাজপুতানা হয়ে কাবুল অভিমুখে পলায়ন করছিলেন। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে জনৈক বন্ধুভাবাপন্ন রাজপুত জাগীরদারের আশ্রয়ে রেখে হুমায়ুন সিন্ধু দেশ হয়ে কাবুল অভিমুখে যান। অতি অল্পসংখ্যক লোকই আকবরের জন্মকালে উপস্থিত ছিল। নবজাতকের জন্মসময় ও নাম সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য বদ্‌লে দিলে প্রতিবাদের সম্ভাবনা

বিশেষ ছিল না। ছুন্নৎ-এর সময় আকবরের নাম দেওয়া হোল জালালুদ্দীন; বদরুদ্দীন শব্দেরই সমার্থবাচক। ঘোষণা করা হোল যে বালকের জন্ম হয়েছিল ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ অক্টোবর তারিখে।

আকবরের বাল্যকালীন গৃহশিক্ষক আবদুল লতিফের বর্ণনায় আকবরের জন্ম হয়েছিল ১৫ অক্টোবর ১৫৪২ খৃষ্টাব্দেই। স্মীথ-পরিবেশিত তথ্য ঠিক নয়। (A. L. Srivastava প্রণীত The Mughul Empire, 1959Ed. P. 136 দ্রষ্টব্য)।

১৭। খাজা শাহ্ মন্‌সুর

সম্রাট পরিবারের ব্যবহার্য আতর ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্যের হিসাব রক্ষক রূপে খাজা শাহ্ মন্‌সুর সরকারী চাকরীতে প্রথম প্রবেশ করেন। কর্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁ'কে উজীর বা খাজাঞ্চীর পদে উন্নীত করা হয়। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ই ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁ'র ফাঁসী হয়। খাজাঞ্চীর কাজ তিনি সুষ্ঠুভাবেই পরিচালন করতেন। আবুল ফজল লিখেছেন, "এরূপ নিখুঁত হিসাব রক্ষক, এরূপ পরিশ্রমী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি নিতান্তই বিরল"।

শাহ্ মন্‌সুরের ফাঁসীর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ভন্ নোয়ের লিখেছেন, "এই মৃত্যু দণ্ডাদেশকে judicial murder বলা যায়।" অ্যানেট বিভারীজ লিখেছেন, 'মনসুরের দণ্ডাদেশের পেছনে দরবারের একদল পদস্থ ওমরাহের চক্রান্ত ছিল'। আবুল ফজলের উক্তির উপর নির্ভর ক'রে ভিন্‌সেন্ট্ স্মীথ লিখেছেন, "খাজা মন্‌সুর তাঁ'র কাজ কর্মে খুব কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁ'র অধস্তন কর্মী'রা এবং অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানরা তাঁ'র ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিল না। রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁ'র মৃত্যুদণ্ড হয়। নিয়তিই তাঁ'র কঠোরতার জন্য তাঁ'কে কবরের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।"

আবুল ফজল লিখেছেন, "নিজের দায়িত্ব পালন এবং অর্থগৃধ্নুতা তাঁ'কে যাবতীয় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় ক'রে তুলেছিল। সেনাদারদের প্রতি তাঁ'র বিন্দুমাত্রও দয়া ছিল না।

টাকা খাটিয়ে প্রচুর ধনি হয়েছিলেন, অধমর্ণদের নিঃশেষ ক'রে নিজের পুঁজি বাড়িয়েছিলেন। কথাবার্তায় খুব সাধুতার ভান করতেন, ব্যবহারে ছিলেন নিতান্ত অসৎ। কঠোরতা ও আপোষের মধ্যে তিনি কোনও যোগসূত্র দেখতে পান নি। কালোপযোগী বিচারের মনোভাবও তাঁ'র ছিল না। যদি আল্লার প্রতি তা'র প্রকৃত অনুরাগ থাকতো, যদি জনগণের প্রতি সামান্য সহানুভূতিও দেখাতে পারতেন, যদি তাদের ক্ষতিসাধনে ও ব্যক্তিগত লোভ চরিতার্থতায় অপেক্ষাকৃত কম তৎপর হ'তেন, তবে আল্লার ক্রোধ তাঁ'র উপর নেমে আসত না।" আবুল ফজল এই সূত্রে একটি রাজনৈতিক প্রত্যয়ের কথা লিখেছেন : "যদি রাজা রাজডার খোসামোদ করতে গিয়ে কেউ সত্যভ্রষ্ট হয় এবং অন্যায়ভাবে সৈন্যদের ও জনগণকে উৎপীড়ন ক'রে রাজার কৃপা লাভে সচেষ্ট হয়, অন্যান্য উপায়ে রাজস্ব বাড়িয়ে ও অসত্য উক্তি ক'রে রাজানুগ্রহ লাভে তৎপর হয়, তা'হলে ভাগ্যই বিমুখ হয়ে তা'র পতন ত্বরান্বিত করে। খাজা মনসুরই তা'র প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত "

বদায়ুনী ও নিযামুদ্দীন দুজনেই লিখেছেন, খাজা মনসুরের রাজদ্রোহ প্রমাণের জন্ত কয়েকটি চিঠি, —যা' তিনি নিজে লিখেছিলেন ব'লে অভিযোগ আনা হয়েছিল, —বিচারের সময় পেশ করা হয়। ঐ চিঠিগুলি জাল ছিল। অবশ্য সব চিঠিই যে জাল ছিল একথা কেউ বলেন নি। আকবরও খাজা মনসুরের অপরাধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন, বলা যায় না। বীরবল ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট অমাত্যের চাপে প'ড়েই আকবর খাজা মনসুরের প্রাণদণ্ড দেন। মনসুরের অপসারণের উদ্দেশ্যে টোডর মলের নামও সংশ্লিষ্ট ছিল মনসুরের অপসারণের ফলে টোডরমলের অনেকটা সুবিধা হয়েছিল সন্দেহ নেই।

সমকালীন মুসলমান ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে যা' লিখেছেন, তা' বিশ্লেষণ করলে এই তথ্য পাওয়া যায় : আকবরের বৈমাত্র ভাই হাকিম যে কোন কারণেই হোক বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে লাহোর আক্রমণ করেন। হাকিমের অন্যতম সেনাপতি শাদ্‌মানকে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর বা ওর কাছাকাছি কোনও তারিখে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ যুদ্ধে

পরাজিত করেন। শাদ্মানের হাতব্যাগে তিনটি চিঠি পাওয়া যায়। চিঠিগুলির প্রাপক ছিল শাহ্ মন্সুর, মহম্মদ কাশিম এবং হাকিম-উল্-মুল্ক্। মানসিংহ চিঠি তিনটি আকবরের নিকট পাঠিয়ে দেন।

সম্রাট কাবুল অভিযানে যাওয়ার সময় শাহ্মন্সুরকে রাজধানীতে রেখে যাওয়া যুক্তি সঙ্গত মনে করেন নি। তিনি শাহ্মন্সুরকে সঙ্গে নিলেন। দিল্লী ছাড়িয়ে পাণিপথে পৌঁছলে মীর্জা হাকিমের পূর্ব্বতন দেওয়ান মালিক সানি এসে মন্সুরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। মন্সুরের মাধ্যমে সানি আকবরের সাক্ষাতে এসে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এতে আকবর সন্দিগ্ধ হ'ন। সম্রাট বাহিনী আম্বালা জেলার শাহাবাদে উপস্থিত হলে স্থানীয় কোতোয়াল মালিক আলী কয়েকটি চিঠি সম্রাটের হাতে দেয়; চিঠিগুলি শরফ্বেগ নামক জনৈক পত্রবাহকের নিকট পাওয়া গিয়েছিল। চিঠিগুলি ছিল মনসুরের ফিরোজপুরস্থ প্রতিনিধির লেখা। একটি চিঠি ছিল শাহ্ মনসুরের উদ্দেশ্যে লিখিত; মীর্জা হাকিম পত্রবাহক শরফ্বেগের প্রতি আনুকূল্য করতে পারেন, শাহ্মনসুর যেন এরূপ ব্যবস্থা করেন, চিঠিতে এই অনুরোধ ছিল। এই চিঠিগুলিই মনসুরের ভাগ্য নির্ধারিত করে। পরের দিনই, কচ্ওয়াহা নামক একটি অখ্যাত গ্রামের উপান্তে শেখ শাহ্মন্সুরের ফাঁসী হয়। তারিখটা ছিল ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৫৮১ খৃষ্টাব্দ। এর বছর চারেক আগে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৬ অক্টোবর একটি দীর্ঘপুচ্ছ ধূমকেতু আকাশে দেখা গিয়েছিল। শেখ মনসুরের ছিল দীর্ঘ পাগ্ড়ি, লম্বা প্রান্তদেশ পোষাকের উপর দিয়ে প্রায় মাটি অবধি পৌঁছত। শেখ মনসুরের নাম হোল—ধূমকেতু'। ফাঁসীর সঙ্গে মানুষ ধূমকেতু ও তা'র দীর্ঘ পাগ্ড়ি অস্তমিত হোল।

নিজামুদ্দীন আহ্মেদ এবং অল্ বদায়ুনী, দুজনেই লিখেছেন যে আকবর কাবুল পৌঁছেই বিদ্রোহের কারণ এবং হাকিম ও মনসুর ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধান করেছিলেন। ষড়যন্ত্রের কোনও ভিত্তি পান নি; অন্ততঃ ফাঁসীযোগ্য কোনও অপরাধ শেখ্ মনসুর করেছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বীরবল, টোডরমল, মানসিংহ প্রভৃতিই ছিলেন শাহ্মন্সুরের বিরোধী।

তাঁ'র অপসারণের ষড়যন্ত্র এঁরাই করেছিলেন। আবুল ফজল নিশ্চয়ই সে খবর রাখতেন; তিনি প্রতিবাদ করেন নি, মনসুরের অপসারণ তাঁ'রও কাম্য ছিল, তবে সক্রিয় সহযোগিতা না ক'রে তিনি ছিলেন নীরব দর্শক। শাহ্ মনসুরের অপরাধ সম্পর্কে আকবরও নিঃসন্দেহ ছিলেন না। তথাপি প্রাণদণ্ডের আদেশ তাঁ'কে দিতে হয়েছিল। মনসুরের বিরোধীরা ছিলেন আকবরের সাম্রাজ্য প্রভাব ও প্রতিপত্তির স্তম্ভবিশেষ: সম্রাট তাঁদের বিরুদ্ধে যেতে সাহস পান নি। তা' ছাড়া, সেনাবাহিনী ও জনসাধারণও শাহ্ মনসুরকে বরদাস্ত করতে পারতো না। অশ্বারোহী সৈন্যের ঘোড়া ম'রে গেলে তা'র কাটা লেজ দেখিয়ে ঘোড়ার মৃত্যু রেকর্ড্ করানোর রীতি শাহ্ মনসুরই প্রচলন করেন। খাজনা ও ঋণের দাবী মেটাতে বহু লোক সর্বস্বান্ত হয়েছিল। এর জন্যও শাহ্ মনসুরই ছিলেন দায়ী। সুতরাং তাঁ'র মৃত্যুদণ্ড ন্যায্য না হলেও কোনও দিক থেকেই কোন প্রতিবাদ ওঠে নি।

সর্বধর্মের প্রতি সমদৃষ্টি; বহুঘোষিত এবং নিত্য আচরিত এই নীতি সত্ত্বেও আকবর যে তাঁর হিন্দু প্রধানদেরই পক্ষপাতী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। নিকট আত্মীয় আজিজ্ কোকাহ্ অপেক্ষা রাজা ভগবান দাসকেই তিনি প্রিয়তর জ্ঞান করতেন। ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে তিনি ইস্‌লাম-বিরোধিতা করেছিলেন। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঐস্লামিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হয়েও হয়তো বা সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁ'র পর তিন পুরুষ অতিক্রান্ত হ'তে না হতেই সেই সাম্রাজ্য ইতিহাসের পাতায় বিলীন হয়ে গেলো।

(ভিন্‌সেন্ট্ স্মীথ্: আকবর দি গ্রেট। ভন্ নোর: এম্পেরর আকবর অ্যানেট্ বিভারীজ কৃত অনুবাদ। আইন-ই-আকবরী: ব্লকম্যানকৃত অনুবাদ। অল্ বদায়ুনী: মুণ্ডখাব্-উত্-তওয়ারিখ্, দ্বিতীয় খণ্ড; লো এবং র‍্যাঙ্কিং কৃত অনুবাদ।)

১৮। মুঘল সৈন্যবাহিনীর গঠন

চেঙ্গিস খাঁ সৈন্যবাহিনী গঠনের যে রীতির উদ্ভাবন করেছিলেন,

নিজ সৈন্যবাহিনী গঠনে আকবর সেই রীতিই অনুসরণ করেন। আকবরের পরবর্তী মুঘল সম্রাটরাও সেই পদ্ধতিই বলবতী রাখেন। একে বলা হয় 'মনসবদারী'। আরবী ও পারসীক ভাষায় মনসব শব্দের অর্থ হচ্ছে চাকুরীর পদ; মনসবদার মানে হচ্ছে চাকুরিয়া, তথা সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী। মুঘল আমলে প্রত্যেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকেই সেনা-নায়ক হ'তে এবং যুদ্ধে যেতে হোত। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় থেকেই মনসবদার হোত। পক্ষান্তরে, ওম্‌রাহরা ছিলেন আধুনিক কালে যা'দের বলা হয় অভিজাত সেই শ্রেণীর। সম্রাটের আত্মীয় এবং পারিসিকরাই ওম্‌রাহ পদবাচ্য হতে পারতেন। আবুল ফজল লিখেছেন, আকবরের সময় ছেষট্টি শ্রেণীর মনসবদার ছিল; এরা সকলেই সেনানায়ক, সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর অঙ্গ। শান্তি এবং যুদ্ধ, দুই সময়েই এদের সম্রাটের নিকট নিয়মিত হাজিরা দিতে হোত; রাজধানীতে থাকার সময় প্রত্যহ দুইবার, মফঃস্বলে থাকার সময় বছরের কোন সময় কিছুদিন রাজধানীতে থেকে প্রত্যহ দুইবার দরবারে হাজিরা দিতে হোত। নিজের বেতন, নিজস্ব সৈন্যদের বেতন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জায়গীর,—এই ছিল এদের উপার্জনের পন্থা। বার্নিয়ার লিখেছেন যে আকবরের পরবর্তীকালে রাজসরকার থেকে টাকা নেওয়ার ব্যাপারে বহু দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল।

আকবরের সময় সর্বোচ্চ মনসবদার ছিল দশ হাজার সৈন্যের নায়ক, সর্বনিম্ন মনসবদার ছিল দশ সৈন্যের। আজিজ্ কোকাহ্ এবং মানসিংহ ছিলেন দশহাজারী মনসবদার।

(আইন-ই-আকবরী: আবুল ফজল, ব্লকম্যান কৃত অনুবাদ। ট্রাভেলস্ ইন দি মোঘল এম্পায়ার: বার্নিয়ার, কনস্টেব্‌ল্ কৃত অনুবাদ)।

১৯। রোটাস দুর্গ

১৫৪২ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ্ পাঞ্জাবে এই দুর্গটি নির্মান করান। দিল্লী থেকে পাঞ্জাব ও কাবুল হয়ে মধ্য এশিয়ায় যাতায়াতের পথের পাশে অবস্থিত এই দুর্গের তৎকালীন সামরিক গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। শের-

শাহের রাজধানী ছিল দক্ষিণ বিহারের শাহাবাদ জেলার রোটাস্ শহরে, সেই নামেই পাঞ্জাবের দুর্গেরও নামকরণ হয়। দুর্গ নির্মানকালে স্থানীয় 'গক্কর' গোষ্ঠীর অধিবাসীরা ছিল আকবরের দিনে যাদের বলা হয় 'স্বভাব দুর্বৃত্ত' সেই শ্রেণীর। পাঠান, মোঘল কারো প্রতিই এরা সন্তুষ্ট ছিল না। এদের গোষ্ঠীপতি রাই সাইরাং শের শাহের বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, প্রকাশ্য লড়াই কমই হোত, অধিকাংশই ছিল প্রতিপক্ষকে অতর্কিত আক্রমণে নাস্তানাবুদ করার করার আক্রমণ। ঝিলামের একটি উপনদীর নাম কাহান্। কাহান্ নদীর পারে এই দুর্গের নির্মণের ভার দেন টোডর খেত্রী নামক এক বাস্তুকার ঠিকাদারকে। ঐতিহাসিক নিয়ামত উল্লা লিখে ছন্ "টোডর খেত্রী শেরশাহকে বুঝিয়েছিল যে গক্কররা অর্থলোভে নিজের গোষ্ঠী থেকে কাউকে নির্মাণ কালীন মজুরী করতে দেবে না।" প্রত্যুত্তরে শেরশাহ্ তা'কে বলেন যে সরকারী কাজের ঠিকাদার যেন কঞ্জুস না হয়ে দরাজ হাতে মজুরী দেয়। মজুরীর হার বাড়ানো হোল, পাথরের এক একটি চাক মাপ অনুযায়ী কেটে যথাস্থানে বসিয়ে দেওয়ার জন্য এক স্বর্ণ আশরফী মজুরীর হার হোল। সোনার লোভে দলে দলে গক্কর শ্রমিক কাজে যোগ দিল। মজুরীর হারও কমিয়ে দেওয়া হোল, এক মোহর থেকে পাঁচ টঙ্কায় নেমে গেলো। (বিশ টঙ্কায় তখনকার এক টাকা)। শাহ্জাহানের সময় থেকেই রোটাস্ দুর্গের সামরিক গুরুত্ব হ্রাস পায়।

(রোটাস দুর্গ নির্মাণের কাহিনী নিয়ামত উল্লার 'তারিখ্-ই-খান জাহান লোদী' গ্রন্থ থেকে হুয়ল্যাণ্ড ও ব্যানার্জী কর্তৃক গৃহীত)।

২০। মির্জা আজিজ্ কোকাহ্

খান্-ই-আজম মীর্জা আজিজ্ কোকাহ্ ছিলেন আকবরের ধাত্রী জিজি আন্‌ঘা'র পুত্র। পণ্ডিত এবং আমোদপ্রিয় দিল্‌দার মানুষ ব'লে পরিচিতি ছিল। আকবর এবং জাহাঙ্গীর, দুই সম্রাটের দরবারেই তাঁ'র খুব নাম ডাক ও প্রতিপত্তি হয়। কি একটা কারণে একবার আকবর

তাঁ'র উপর খুব খাপ্পা হয়ে ওঠেন ; আজিজ্ কোকাহ্ পালিয়ে মক্কায় চ'লে যান। একে দিলদার মেজাজী মানুষ, তাঁ'র হিন্দুস্থানের বাদ্‌শাহ্ আকবরের আত্মীয়, —মক্কার সুযোগ সন্ধানী মোল্লারা তাঁ'কে পেয়ে বসে। হিন্দু তীর্থক্ষেত্রের কুখ্যাত এক শ্রেণীর পাণ্ডার মতো, মক্কার মোল্লারা আজিজ্ কোকাহ্‌কে সর্বস্বান্ত ক'রে দেয়। ব্লকম্যান লিখেছেন, 'তাঁ'র ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল' ("he was virtuallyfleeced") । উপায়ান্তর না দেখে তিনি ভারতেই ফিরে আসেন। সবাই দেখলো যে তিনি ভয়ানক আল্লাভক্ত হয়েছেন। হরবকৎ তিনি আল্লার নাম করছেন। আকবরের রাগ ততদিনে প্রশমিত হয়েছে, আজিজ্ কোকাহ্ পুনরায় বাদ্‌শাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হতে লাগলেন। ভয়ানক আল্লাভক্ত কোকাহ্ সাহেব প্রচার করলেন প্রত্যেক সৎ মুসলমানেরই আবশ্যিকভাবে চারটি বিবি থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এক বিবি হবে পারস্য দেশীয়, যা'র সাথে বিশ্রম্ভালাপ করা যায় ; দ্বিতীয় বিবি নিতে হবে খোরাসান থেকে, কারণ, গৃহস্থালীতে খোরাসানী মেয়েদের খুব সুনাম, তৃতীয় বিবি সংগ্রহ করতে হবে হিন্দু রমণীদের থেকে, যে কিনা বাচ্চাদের সাম্‌লা'বে ও মানুষ করবে, চতুর্থটি হবে ইরাকী ললনা, যা'কে দরকার মতো ঠেঙিয়ে অন্য বিবিদের শায়েস্তা করা যাবে। আজিজ কোকাহ্‌র মৃত্যু হয় ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে।

আজিজ কোকাহ্ সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় ব্লকম্যান কৃত আইন-ই-আকবরী, প্রথম খণ্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠায়।

২১। বীরবল

হিন্দু ব্রাহ্মণ, পিতৃদত্ত নাম মহেশ দাস, বীরবর নামেও খ্যাত। ইয়োরোপীয় রাজপরিবারের Lord Chamberlaine এর সমমর্যাদা সম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আকবরের প্রবর্তিত 'দীন-ই-ইলাহী' মতবাদের সমর্থক। বীরবল কবিতা লিখতেন, আকবরের বিবেচনায় সমকালীন কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বীরবল। তাঁ'র কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ আকবর তাঁ'কে 'কবিরায়' —শ্রেষ্ঠ কবি—উপাধীতে ভূষিত করেন। অত্যন্ত রসিক, পরিহাসপ্রিয়, ব্যঙ্গ-সুনিপুণ, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন এবং

বিদ্রূপাত্মক ভাষা প্রয়োগে অসমান্য দক্ষ ছিলেন বীরবল। ঐতিহাসিক বদায়ুনী তাঁ'র প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। বদায়ুনী মনে করতেন যে বীরবলের প্রভাবেই আকবর মুসলমান ধর্মে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। কার্যোপলক্ষে বীরবল কিছুকাল জয়পুরে ছিলেন, সেই সময় 'ব্রহ্ম কবি' এই ছদ্মনামে স্বরচিত কবিতা প্রকাশ করেন। ছদ্মনামের আড়ালে প্রকৃত কবির পরিচয় বদায়ুনী জানতে পেরে তাঁ'কে 'ব্রহ্মাদাস' নামে অভিহিত করেছেন।

২২। *বালনাথ*

আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখনও 'বালনাথ টিলা' ভারতীয় যোগী সম্প্রদায়ের অন্যতম পবিত্র তীর্থ ছিল। প্লুটার্কের বর্ণনা উদ্ধৃত ক'রে কানিংহাম লিখেছেন, পুরু যখন আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেন তখন একটি হাতী ক্ষিপ্ত হয়ে বালনাথ পাহাড়ে উঠে যায়। কিম্বদন্তী এই যে এই পাহাড়েই যোগী গোরক্ষনাথ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং রামচন্দ্র তাঁ'কে আশীর্বাদ করেন। গোরক্ষ জাতি গোষ্ঠীভুক্ত বালনাথ ছিলেন গোরক্ষনাথের মন্ত্রশিষ্য। এখানে বালনাথের মূর্তিই সূর্যবিগ্রহ রূপে উপাসিত হোত। বালনাথ টিলার যোগী সম্প্রদায় 'কান ফাটা যোগী' নামে আখ্যাত। আকবর যোগীদের সমাদর করতেন। নওরোজ উৎসবে যোগীরা নিয়মিত যোগদান করতো। আকবরও একাধিকবার যোগীদের ডেরায় গিয়েছেন, তাঁ'দের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করেছেন, নিঃশর্ত জায়গীর দান করেছেন। আকবরের আগেও আ'র এক মুসলমান বাদশাহ্ যোগীদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁ'র নাম মহম্মদ বিন্ তুঘ্লক। (কানিংহাম প্রণীত এন্সিয়েন্ট জিওগ্রাফি অব্ ইণ্ডিয়া, ওমান প্রণীত মিষ্টিক্স্, আসেটিক্স্ অ্যাণ্ড্ সেইন্ট্স্ অব্ ইণ্ডিয়া; আকবর নামা ; এবং গোস্বামী ও গ্রেওয়াল প্রণীত দি মুঘল্স্ অ্যাণ্ড দি যোগিজ্ অব্ যখবর গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।)

২৩। *রাজা ভগবান দাস*

মালব এবং মধ্যভারতের রাজন্যবর্গকে একের পর এক পর্যুদস্ত করার

পর আকবর রাজপুতনা জয়ে মনোনিবেশ করলেন। কা'রো বিরুদ্ধে যুদ্ধ, কা'রো সঙ্গে সখ্যতা, এই দুমুখী প্রয়াসেই আকবর সফল হয়েছিলেন। সুচতুর, সাহসী, রণনিপুন ও প্রতিপত্তিশালী বহু বিশিষ্ট রাজপুতকেই আকবর সখ্যতায় আবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। এইরূপ একজন প্রতিপত্তিশালী রাজপুত জায়গীরদার ছিলেন অম্বরের (জয়পুর) রাজা বিহারী মল। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছায় আকবরের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং নিজ কন্যাকে আকবরের সংঙ্গ বিবাহ দেন। বিহারী মল এবং তাঁ'র পুত্র ভগবান দাসকে সম্রাট নিজ দরবারে ডেকে নেন। পিতা ও পুত্র উভয়েই পাঁচ হাজারী মনসবদার ছিলেন। বীরবলের পর ভগবান দাসই প্রাসাদের প্রশাসনিক ব্যাপারে সর্বময় কর্তা (Lord Chamberlaine) হ'ন; প্রাসাদের সর্বত্র —হারেমেও —তাঁ'র প্রবেশাধিকার ছিল, যা' অন্য কোনও মুসলমান ওমরাহেরও ছিল না। সম্রাট তাঁ'কে 'আমীর উল্-উমারা' উপাধীতে ভূষিত করেন। ভগবানদাসের গৃহীত পুত্র (adopted son) হচ্ছেন ইতিহাস বিখ্যাত রাজা মানসিংহ। রাজা ভগবান দাস ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল হ'ন। ভগবান দাসের কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয় শাহ্‌জাদা সেলিমের (পরবর্তীকালে বাদ্‌শাহ্‌ জাহাঙ্গীর)। ইনি কিন্তু 'দীন-ই ইলাহী' মতবাদে উৎসাহী ছিলেন না। প্রকাশ্যেই তাঁ'র বিরোধীতা করেছিলেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মীর্জা হাকিমের মৃত্যু হলে আকবর ভগবান দাসকে কাবুলের রাজ্যপাল পদে বৃত করেন। কাশ্মীর, সোয়াট এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তারের কৃতিত্ব তাঁ'রই। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ভগবান দাসের মৃত্যু হয়।

২৪। *গোরখত্রী*

বাবুরনামায় এবং Murray প্রণীত 'Handbook of the Punjab' গ্রন্থে গোরখত্রী নামক একটি স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। পেশোয়ারের নিকটে এই অঞ্চলে এককালে অনেক বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার ছিল। একটি স্তূপ নির্মিত হয়েছিল কণিষ্কের সময়। মুসলমান আক্রমণে স্তূপ ও বিহার গুলি ধ্বংস হয়, দু একটির ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির

প্রচার কেন্দ্ররূপে গোরখত্রী প্রসিদ্ধি লাভ করে। জম্মু থেকে আগত শস্য ব্যবসায়ীরা গোরখত্রীর প্রভূত উন্নয়ন করেছিল। পাঠানদের স্থানীয় ভাষায় 'গোরখত্রী' বলতে 'শস্য ব্যবসায়ীর গৃহ' বোঝায়।

টলেমির বর্ণনায় জানতে পারি যে স্বোয়াট এবং পঞ্জকোরা নদী দুইটি একত্র যেখানে কাবুল নদীতে মিশেছে, সেই অঞ্চলে 'গোরিয়া' বা 'গোরিয়া' জনগোষ্ঠী বাস করতো। এরা মধ্য এশিয়ার খোরাসান থেকে আগত না হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান তা' জানা যায় নি। কাশ্মীরে এদের প্রথম নিবাস ছিল। বহুবার এরা বাস্তু পরিবর্তন করেছে। বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বরবাদ, সুফীদের মতো পরমত সহিষ্ণুতা, মধ্য এশিয়ার যাযাবর গোষ্ঠীদের মতো বাসস্থানের পরিবর্তন, লুণ্ঠন, মানুষ চুরী' প্রভৃতি এদের জাতিগত বৈশিষ্ট। গ্রীকরা এদের বলতো Grekoi. J. A. S. B. Vol. XL, 1871 দ্রষ্টব্য।

২৫। স্পেনে রাজদূত প্রেরণ

আকবরের সমকালীন স্পেন সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় ফিলিপ। তুর্কীদের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয় রাজন্যবর্গ এবং আকবর একযোগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন, এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার প্রথম পর্যায়ে স্পেনে রাজদূত প্রেরণের এক পরিকল্পনা হয়। সৈয়দ মুজাফ্ফর নামক এক খানদানী ওম্রাহকে সম্রাট নির্বাচিত ক'রে স্পেন সম্রাটের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি চিঠি তাঁ'র হাতে দেন। এই চিঠির ইংরেজী অনুবাদ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারীতে ছাপা হয়েছিল। চিঠির বক্তব্যে এবং ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গীতে কূটনীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। আকবরের আত্ম-শ্লাঘাই এই চিঠির উপজীব্য। 'পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যেই' চিঠিটি লেখা হয়, প্রারম্ভে এই বয়ান থাকলেও আকবরের দিগ্বিজয়, অসামান্য ক্ষমতা ঐশ্বর্য ও প্রতাপের কাহিনী ও গরিমা প্রকাশই চিঠির সর্বাঙ্গ পূর্ণ ক'রে আছে। সৈয়দ মুজাফ্ফরের সঙ্গীরূপে আবদুল্লা খাঁ এবং পাদ্রী মোন্সারেট্কে নির্বাচিত করা হয়।

সম্রাটের চিঠিতে মুজাফ্ফরকে বিশ্বস্ত, প্রাজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব'লে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বস্ত প্রাজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সম্রাটের সদিচ্ছায় আস্থা পোষণ করতে পারেন নি। পাদ্রী মোন্সারেটের হাতে একটি শীল করা খাম সুরাটের শাসনকর্তাকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন। সৈয়দ সাহেব আশঙ্কা করেছিলেন ঐ খামে সম্রাট তাঁ'কে 'দেখামাত্র কোতল করার হুকুমই দিয়েছেন। তাই যদি না হয়, তবে বৃদ্ধ বয়সে কালাপানি পার হতেই বা আদেশ দেবেন কেন, এবং রাজধানী থেকেই বা অন্তর্হীণ করবেন কেন? ইহ জগৎ থেকেই সরিয়ে দেওয়ার মৎলব নয়তো? শাহ্ মনসুরের ষড়যন্ত্রে কানাঘুষায় সৈয়দ সাহেবের নামও হয়তো বাদ্শাহের কানে উঠে থাকতে পারে। রাজধানী থেকে বেরিয়ে সুরাট যাওয়ার পথে তিনি চিঠিটি খুলে দেখার জন্য মোন্সারেটকে বহু অনুনয় করেছিলেন, মেরে ফেলার ভয়ও দেখিয়েছিলেন; তা'তে কোনও কাজ হয় নি। গোয়ায় পৌঁছবার আগেই নির্বাচিত বিচক্ষণ রাজদূত পলায়ন ক'রে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবদুল্লা খাঁ গোয়া পর্যন্ত গিয়েছিলেন। ইয়োরোপগামী জাহাজের জন্য কয়েক মাস ব্যর্থ অপেক্ষা ক'রে ফতেপুর সিক্রি ফিরি যান। রাজদূত কিংবা রাজকীয় চিঠি কোনটাই স্পেন পৌঁছয়নি।

২৬। নওরোজ

নববর্ষের প্রথম ছয়দিন ব্যাপী আমোদ উৎসব একটি সুপ্রাচীন ইরানীয় সামাজিক প্রথা। জরথুস্ত্রের অনুগামীরা ভারতে এই উৎসবের প্রচলন করে। আকবর নওরোজ উৎসব গ্রহণ ক'রে এক অভিনব অনুষ্ঠানে পরিণত করেন। অল্ বিরুনী নওরোজের নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন:—

"সম্রাট নওরোজ উৎসবের উদ্বোধন ক'রে ঘোষণা করলেন যে তিনি উৎসবে সমাগত সবাইকে উপহার দেবেন। উৎসবের দ্বিতীয়দিনে আমীর ওম্‌রাহ্ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরুষ ও মহিলারা এলেন। তৃতীয় দিনে এলেন মোল্লা মৌলবী এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিত ও

বিশিষ্ট মনসবদারগণ। চতুর্থ দিনে সম্রাটের পরিবার বর্গ; আত্মীয় স্বজন, প্রাসাদের কর্মচারীরা ও তা'দের পরিবারস্থ লোকজন। পঞ্চম দিনে সম্রাটের এবং আমীর ওমরাহ প্রভৃতি অভিজাত পরিবার সমূহের পুত্রকন্যারা। ষষ্ঠ দিনে সমাগত হলেন সম্রাটের একান্ত বন্ধুবান্ধব এবং বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা, এঁরা সম্রাটের সঙ্গে নিভৃতে সমবেত হলেন। একবার নওরোজ উৎসব একমাস ধ'রে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।"

অল্ বিরুনীর বর্ণনা আকবরের সময়ের। বার্নিয়ারও নওরোজের বিশদ এবং মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়ছেন। নওরোজ উৎসবের পর সমাজের উঁচু মহলে বিয়ের ধুম প'ড়ে যেত, কঠোর সংরক্ষণশীল পরিবেশের মধ্যে নওরোজের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে তরুণ তরুণীদের মধ্যে মেলামেশা ও পারস্পরিক অনুরাগ সৃষ্টির সুযোগ ঘটতো। বার্নিয়ারের বর্ণনা জাহাঙ্গীর ও আওরঙ্গজেবের সময়ের।

২৭। দীন্-ই-ইলাহী

আকবরের পিতা হুমায়ুন ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত, মা হামিদাবানু ছিলেন সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এক পারসিক অভিজাত পরিবারের কন্যা। আকবরের জন্ম হয় রাজপুত হিন্দু জায়গীরদার রাণা বীরশালের গৃহে। বাল্যকালে তাঁ'র গৃহ শিক্ষক ছিল উদারচেতা গৃহ শিক্ষক আব্দুল লতিফ যাঁকে বলা হোত 'গোঁড়া সিয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদার' এবং সুন্নীদের মধ্যে 'কঠোর নিয়মানুবর্তিতার উদাহরণ'। আকবরের কৈশোর এবং যৌবন কাল অতিবাহিত হয়েছে বৈরাম খাঁর প্রভাব-পরিমণ্ডলে, যাঁ'র ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল সর্বপ্রকার সন্দেহের ঊর্ধে এবং ধর্মীয় দিক দিয়ে যিনি ছিলেন উদারচেতা। চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং উদার ধর্মীয় মনোভাব আকবর পেয়েছিলেন তাঁ'র বাল্য কৈশোর ও যৌবন কালীন পরিবেশ থেকে। বদায়ুনীর মতো কঠোর সমালোচকও আকবরের চরিত্রে দুর্বলতা দেখতে পান নি। বদায়ুনী লিখেছেন, সম্রাট প্রত্যহ পাঁচ ওক্ত নামাজ

পড়তেন বটে, তবে ইস্লাম-বিশ্বাসের মূল পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে তাঁ'র অনীহা ছিল। কলিমা (আল্লাহ্ই এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর, রোজা বা রমজানের উপবাস পালন, জাকাত বা দান খয়রাতের মানস, হজ্ এবং দৈনিক পাঁচবার নামাজ উচ্চারণ, —ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অবশ্য পালনীয় এই পাঁচ কর্তব্যের মধ্যে আকবর একমাত্র দৈনিক নামাজ ছাড়া আর কোনও কর্তব্যই পালন করতেন না; নামাজের সংখ্যাও উত্তোরোত্তর ক'মে আস্ছিল। মোল্লা আবদুল্লা সুলতানপুরী এবং আবদুন্ নবী আকবরের 'কাফের প্রীতি' এবং ধর্মে অনীহার বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক চক্রান্ত সম্ভাবিত ক'রে তুলেছিল; তা আকবরের পক্ষে এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের দিক দিয়েও বিশেষ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। তথাপি আকবর নিজ অনুসৃত পথ ও মত থেকে একটুও বিচলিত হন নি।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর আবুল ফজলের পিতা শেখ মুবারক এবং আবুল ফজলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফৈজীর সংস্পর্শে আসেন। এঁরা দু'জনেই ছিলেন পণ্ডিত, উদার চেতা ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির। এঁদের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই আকবরের আধ্যাত্ম চিন্তা তীব্রতর হয়ে ওঠে। শেখ মুবারক এবং ফৈজী ছিলেন মাহ্দী মতাবলম্বী; শিয়া সম্প্রদায়ের একটি শাখা মাহ্দী বা অনাগত ঈশ্বর প্রেরিত নবী সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। আকবরও যে এঁদের ধর্ম বিশ্বাসে কিছুটা প্রভাবিত হ'ন নি, বলা যায় না। শিয়া সম্প্রদায় সুন্নিদের মতো কট্টর পৌত্তলিকতা-বিরোধী নয়। মুঘল রাজবংশ ছিল শিয়া মতাবলম্বী। অল্ গজলীর (মৃত্যু ১১১১ খৃষ্টাব্দ) লিখিত কোরাণের ভাষ্য ও ইস্লামের নব ব্যাখ্যা এবং সুফী মতবাদের প্রবক্তা জালালুদ্দীন রুমীর (১২০৭—১২৭৩) মরমী দৃষ্টিভঙ্গীর সংবাদও আকবর সম্ভবতঃ মুবারক ও ফৈজীর কাছেই পেয়েছিলেন। বিভিন্ন ধর্মমতের সারমর্ম অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাসাদের একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে নানাবিধ ধর্মগ্রন্থের এক লাইব্রেরী আকবর গ'ড়ে তোলেন। ঐ কক্ষে বসেই নিয়মিতভাবে হিন্দু, জৈন, পার্শী, ইস্লাম ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী পণ্ডিত ও সাধু সজ্জনদের শাস্ত্রালোচনা এবং ধর্ম ব্যাখ্যা শুনতেন। এই কক্ষের নাম দেওয়া হয় 'ইবাদৎখানা'। আকবরের ধর্মজিজ্ঞাসা ও ইবাদৎখানার

কঠোর বিরূপ সমালোচনা করেছেন আবদুল কাদের অল্ বদায়ুনী। আকবরের ধর্মজিজ্ঞাসার আন্তরিকতায় বদায়ুনী সন্দেহ প্রকাশ করেন নি; তাঁ'র সমালোচনার প্রতিপাদ্য ছিল: ইস্লামের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার ও উপেক্ষা ক'রে সম্রাটের পক্ষে অন্যান্য ধর্মমত সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করার অযৌক্তিকতা। বদায়ুনী এবং মোন্সারেট, দুজনেই লিখেছেন যে মুসলমান ধর্মাচার পালনে আকবরের অনীহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। প্রাসাদের ছাদে একটি উপাসনাগৃহ নিজের প্ল্যানিং অনুযায়ী ও তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করিয়ে সম্রাট সেখানে সূর্যোদয়ের অনেক আগে থেকেই অনেক সময় ধ'রে একাকী থাকতেন।

সূর্যের দিকে মুখ ক'রে নিঃশব্দে উপাসনা করতেন। পোপের অনুকরণে নিজেকে মুসলমানদের সর্বপ্রধান ধর্মনেতারূপে দরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তৎসম্পর্কে ফতোয়া জারী করাও হয়েছিল। উপাধী দেওয়া হয়েছিল—'ইমাম ই-আদিল'। দুনিয়ার সর্বপ্রধান ধর্মনেতারূপে স্বীকৃতি পেয়েও কিন্তু আকবর নিজেকে মহম্মদের পদাধিকারী বলে জাহির করেন নি। বিভিন্ন সময়ে এবং একই সময়েই ভিন্ন ভিন্ন মুস্লিম রাজ্যের বাদ্শাহরা নিজেদের 'খলিফা' এবং মহম্মদের পদাধিকারী রূপে জাহির করেছেন এবং তা' নিয়ে বিবাদ এবং সংঘর্ষও হয়েছেও প্রচুর। ধর্মরক্ষা বা ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য জেহাদ ঘোষণা করা আকবরের অভিপ্রেত ছিল না; নিজের বিশ্বাস তিনি অন্যের উপর চাপাতে যান নি। জরথুস্ত্রের উপদেশ থেকে তিনি সূর্যপ্রশস্তি গ্রহণ করেছিলেন, হিন্দু, যোগী ও জৈনদের থেকে তিনি পেয়েছিলেন একক উপাসনা ও ধ্যান, সুফীদের থেকে পেয়েছিলেন কান্তিচেতনা। রক্তে ছিল তাঁ'র সৌন্দর্যানুভূতি। পর মত সহিষ্ণুতা, একক ধ্যান এবং সূর্যোপাসনাকে তিনি ঈশ্বর-তত্ত্ব নির্ণয়ের সোপান স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন।

আকবরের উদ্ভাবিত 'দীন-ই-ইলাহী' সম্পর্কে ভিনসেন্ট্ স্মীথ্ কটাক্ষ করেছেন। টয়েন্বিও একে শখের ধর্ম (fancy religion) বলেছেন। পাঠান সুলতান-আলাউদ্দিন খিল্জিও এক নতুন ধর্মমত প্রচারে উৎসাহী হয়েছিলেন। খলিফা অল্ হাকিম (খৃঃ ৯৯৬—১০২০) নিজেকে ঈশ্বরের

দশম অবতার ব'লে কীর্ত্তিত করেছিলেন। আকবরের সঙ্গে এদের তুলনা চলে না।

সম্রাট আকবরের দীন-ই-ইলাহী ছিল তাঁ'র ব্যক্তিগত বিশ্বাস; অন্যের উপর তা' চাপিয়ে দিতে যাননি, কিংবা একে রাজকীয় ধর্মমত বলেও কোন ফতোয়া দেননি। কাবুল বিজয়ের পর তিনি সর্বসমক্ষে স্বীয় নতুন বিশ্বাসের কথা প্রথম ঘোষণা করেন; দু একজন ওম্‌রাহ্‌ ছাড়া কেউই যে এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল তা'র প্রামাণ নেই। সকল ধর্মই যে মানুষের চরম আকুতি এবং তা'র নিরসনের প্রয়াস, আকবর এই কথা জেনেছিলেন। সকল ধর্মমত থেকে নিজের মনের উপযোগী একটি সাধন প্রণালী তিনি বের করেছিলেন। ইস্‌লাম তাঁ'র আধ্যাত্ম-চেতনাকে ব্যাপ্তিলাভ করতে সহায়ক হয় নি, সম্রাটের পক্ষে ধর্মান্তরিত হওয়াও অসম্ভব ছিল। কিন্তু তাঁ'র আধ্যাত্ম-চেতনা ও ঈশ্বরানুভূতি যে অবিমিশ্র ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আকবরের মৃত্যুর চার শতাব্দী পরে এক বাঙালী কবির রচনায় আকবরের মনের আকুতি আশ্চর্য হয়ে ফুটে উঠেছিল :—"বনে জনে জড়িয়ে আছি, হায়/তবু জানো, মন তোমারে চায়।"

২৮। *নারী ধর্ষণের শাস্তি*

আকবরের প্রধান মুৎসুদ্দী ছিলেন রুমী খাঁ। বিবাহিত, এবং স্ত্রী ও সন্তান বর্তমান ছিল। একটি ব্রাহ্মণ যুবতীকে ধর্ষণ করার অভিযোগে আকবর তাঁ'র প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। গলায় ফাঁস দিয়ে দড়ির দুই প্রান্ত দু'দিক থেকে টেনে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে হত্যা করা ছিল এই দণ্ডের পদ্ধতি। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি রুমী খাঁর হয়ে সম্রাটের মার্জনা ভিক্ষা করেছিল, প্রচুর অর্থদণ্ডের বিনিময়ে তাঁ'র মুক্তির জন্য অনুরোধও করা হয়েছিল। আকবর কোনও অনুরোধই রাখেন নি। সর্বসমক্ষে রুমী খাঁকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়।

অস্বাভাবিক যৌন অপরাধের শাস্তি ছিল চামড়ায় তৈরী চাবুক দিয়ে

অপরাধীকে নির্মমভাবে প্রহার করা। চরিত্রগত অপরাধের বিচারে আকবর সামান্যতম দুর্বলতাও কোনদিন দেখান নি। আকবরের সময় ক্ষমতাসীন মুসলমান অভিজাত ও কর্মচারীদেরও চারিত্রিক ঐতিহ্য বজায় ছিল ; তিন পুরুষ পরে আওরঙ্গজেবের মতো জবরদস্ত সম্রাটের আমলে তা'র অবসান ঘটে। একথা লিখেছেন যদুনাথ সরকার।

২৯। *এমোডি*

প্রাচীন গ্রীক লেখকরা ককেসাস্ পর্বতমালার পূর্বদিকে প্রসারিত অংশের নাম দিয়েছিল 'ইমায়ুস্'। সংস্কৃত ভাষায় 'হিমবাহ' ছিল হিমালয়ের নাম। ইমায়ুস্ ও এমোডি এই দুই নামেই প্রাচীন গ্রীসে হিমালয়ের পরিচিতি ছিল। মোন্‌সারেট লিখেছেন, এমোডির পূর্বপ্রান্তে নেপাল ও ভুটান। বার্ণিয়ারের ম্যাপে দেখা যায় নেপাল 'মাইনর টিবেট' ও টিবেটের পরে এমোডির উত্তরে 'টাটারিয়া' বা তাতারদের দেশ। ককেসাস্ পর্বতমালার দক্ষিণ পূর্বে ইরাণ ও আফগানিস্থানের পর্বতমালাকে বলা হোত 'পারোপনিসাস'—পরবর্তী কালের হিন্দুকুশ। গ্রীক 'পারোপ-নিসাস্' এসেছে সংস্কৃত 'পর্বত নিষধ' থেকে ; আফগানিস্থানের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত এই পর্বতের নামোল্লেখ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'পর্বতবিশেষঃ। স তু ইলাবৃতস্য দক্ষিণে হরিবর্ষস্য সীমাপর্বতঃ।' ইলাবৃত সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'তস্য সীমা উত্তরে নীলপর্বতঃ দক্ষিণে নিষধঃ পশ্চিমে মাল্যবান পূর্বে গন্ধমাদনপর্বতঃ।'

মেগাস্থিনিস্-এর বর্ণনার উল্লেখ ক'রে ম্যাক্ ক্রিণ্ড্‌ল্ লিখেছেন, 'নেপাল ও ভুটান ছাড়িয়ে এমোডি বা এমোডুস পর্বত পূর্ব সমুদ্রতীর পর্যন্ত প্রসারিত।' সংস্কৃত সাহিত্যে হিমালয়কে হিমবাহ হিমবন্ত প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'অস্য দীর্ঘে দশ সহস্র যোজনানি প্রস্থে দ্বিসহস্র যোজনানি। দক্ষিণে ইলাবৃতং নিষধো হেমকুটো হিমালয়ঃ।'